হে অতীত কথা কও

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্‌-সি.
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট্‌
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক :
শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
৬, চালতা বাগান লেন
কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়, রথদ্বিতীয়া, ১৩৬৬

দাম—চারি টাকা

ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখতুম—নাটক লিখব, অভিনয় করব। বড় হয়ে চাকরি করতে এলুম দিল্লীতে। পরিচয় হ'ল অনেক বিচিত্র দেশ ও বিচিত্রতর নরনারীর সঙ্গে। নাটকের নেশা তবু কাটল না। কলকাতায় ফিরে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে যোগ দিলুম, নিজের সমস্ত সত্ত্বাকে মিলিয়ে দিলুম মঞ্চের সঙ্গে। দীর্ঘ পনের বছর ধরে যে প্রতিষ্ঠানকে একান্তই আমার ভেবেছি—একদিন একটু সময়ের মধ্যে কেমন করে তার সঙ্গে সমস্ত হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে হাতিবাগানের রাস্তায় বেরিয়ে এলুম—বর্তমান গ্রন্থে সেই কাহিনী বিবৃত হয়েছে। 'রূপমঞ্চ'-সম্পাদক বন্ধুবর কালীশ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহাতিশয্যেই এই স্মৃতি-কথা লিপিবদ্ধ করেছি। এবং ধারাবাহিক রূপে লেখাটি ইতঃপূর্বে রূপমঞ্চে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় প্রয়োজনবোধে রচনাটির কিছু অংশ পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে বাধ্য হয়েছি।

মহেন্দ্র গুপ্ত

—বাবুজি ! ঠ্যর্ যাইয়ে !

তরুণী মেয়েছেলের গলার সেই পরিচিত আওয়াজ ! থম্‌কে দাঁড়াই সিঁড়ির ওপর। ওপরে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এবার অনুমতি পাই ওই বন্ধ দরজা অতিক্রম করে আমার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভিতরে ঢোকবার ! এইবার পাশের ফ্ল্যাটে খিল্‌খিল্ হাসির আওয়াজ ওঠে। কী হাসির ধূম।···আচ্ছা মেয়েছেলে যাহোক। ছ'মাস এই ফ্ল্যাটে রয়েছি, একটি দিনও মুখ দেখিনি। পাছে ওদের দরজার পাশ দিয়ে সিঁড়িতে ওঠা নামা করবার সময় একপলক মুখ দেখে ফেলি তাই বেরুবার সময়, ভেতরে আসবার সময় ওই হুকুম্‌দারী—"বাবুজি ! ঠ্যর্ যাইয়ে।" নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজা সশব্দে বন্ধ করে তবে আমায় যাতায়াতের হুকুম দেয়। অথচ মজা এই, কি রাত্রে কি দুপুরে, যখনই ঘরে থাকি, শুনি ওই খিল্‌খিল্ হাসির আওয়াজ, গান, দেওয়ালের ওধারে চাপাগলার ফিস্‌ফিস্ কথা বলা—সব শুনি।

কুতুব রোড। পুরোনো দিল্লি আর নতুন দিল্লির সংযোগ ঘটিয়েছে এই কুতুব রোড। নতুন দিল্লির মানমন্দির "যন্তোর-মন্তোর", পাহাড় গঞ্জ, নিউদিল্লি স্টেশন, রামনগর কলোনী, তারপর কুতুব রোডের অনেকটা ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে বহুকালের পুরোণো একটা ভাঙ্গা মস্‌জিদ। রাস্তার বাঁদিকে অতি প্রাচীন কালের সারি সারি কবর। ভাঙ্গা মস্‌জিদ ও কবরের মাঝখানে দিল্লির এই নতুন ফ্ল্যাট বাড়ীতে উঠেছি অলিয়ানস্ উণ্ড স্টাটগার্টার—জার্মান জীবন বীমা কোম্পানীতে

চাকরী নিয়ে এসে। দিনের বেলা টাঙ্গা চলে, ট্রলীবাস চলে, রাত্রে পথ হয়ে যায় একেবারে নিঝুম। এই পরিত্যক্ত স্থানটি সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী শুনেছি। সবগুলি বিশ্বাস করি আর না করি মোটকথা রাত্রে এখানে লোক চলাচল বড় একটা দেখা যায় না। নীচে আস্‌লাম খাঁর হোটেল। চাপাটি, গোস্ত, শিককাবাব সবই খুব সস্তায় বিকোয়। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর টাঙ্গাওয়ালা, কুলী-মজুর ওখানে খেতে আসে। নেশার ঘোরে কেউ কেউ ইতর অকথ্য ভাষায় চীৎকার করে, মাঝে মাঝে একটু আধটু মারপিটও হয়। রাত দশটা বাজতে না বাজতে আস্‌লাম খাঁ সব খদ্দেরকে বিদেয় করে দোকান বন্ধ করে দেয়। বৃদ্ধ পেশোয়ারী আস্‌লাম খাঁ। বয়স ষাটের কাছাকাছি, কুৎসিত ঘা নাকের ডগার খানিকটা খসিয়ে নিয়েছে। সামনের দুটো হলদে পানা বড় বড় দাঁত মুখখানাকে আরও বীভৎস করে তুলেছে। নেশাখোর জোয়ান টাঙ্গাওয়ালাদের যখন রাত দশটায় ঘাড় ধরে হোটেল থেকে বার করে দেয় বুড়ো আস্‌লাম খাঁ, সাধ্য হয় না তাদের এতটুকু প্রতিবাদ করবার। দরজায় চাবি দিয়ে আস্‌লাম খাঁ ওপরে উঠে আসে। তার ভারী পায়ের আওয়াজ শুনেই পাশের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে যায়। খাটিয়ায় শুয়ে শুনি, ক্লান্ত আস্‌লাম খাঁকে আরাম দেবার জন্য দেওয়ালের ওধারটা সচকিত হয়ে উঠেছে। একটু পরে চীনে মাটির ডিসের আওয়াজ, চুড়ির ঠুন্‌ঠুন্, খানাপিনার শব্দ, আর থেকে থেকে সেই খিল্‌খিল্ হাসি।

ও ফ্ল্যাটে একটি বর্ষীয়সী ঝি আছে। দু'একদিন তাকে দেখেছি। আস্‌লাম খাঁর হোটেলের খরিদ্দারদের চাহিদা মত জিনিসপত্তর দিয়ে আসে। আবার কখনও কখনও হোটেল থেকে কিছু মালপত্তর বাড়ীতেও নিয়ে আসে। কিন্তু তার জন্য এত হুঁসিয়ারি নয়, অত ধুম করে দরজা বন্ধ করারও দরকার হয় না আমায় দেখে। আস্‌লাম খাঁ আর সেই বুড়ী ঝি ছাড়া কে সেই তৃতীয়ার ক্ষীণ শশিকলা মেঘের আড়ালে এই ছ'মাস ধরে মুখ লুকিয়ে আছে? হাসে,

গান গায়, অথচ দেখা দেয় না! বড় কৌতূহল জাগে। কিন্তু উপায় কি?

১৯৩৬-এর জুন মাস। দিল্লিতে চাকরী নিয়ে এসেছি। এখানে আসবার পর উত্তর ভারতের অনেক জায়গা ঘুরেছি, কখনো অফিসের কাজে, কখনও বা নিছক অকাজে, মনের খেয়ালে। আসবার আগে আমার লেখা পৌরাণিক নাটক "গয়াতীর্থ" মিনার্ভা থিয়েটারের পরিচালক শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ মশাইকে দিয়ে এসেছিলুম, বইখানি তিনি অভিনয় করবার জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। আমার রচিত নাটক এই প্রথম প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে চলেছে। অজ্ঞাত অপরিসীম আনন্দ ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে দিন গুণছি। নির্ধারিত দিনে নাটকখানি প্রকাশ্যে মুক্তি লাভ করল। দু'তিন দিনের মধ্যেই কালীপ্রসাদবাবু এবং স্বর্গত নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশাই-এর টেলিগ্রাম পেলুম নাটকখানি অভাবনীয় জনসমাদর পেয়েছে। নাট্যকার-রূপে প্রথম সাফল্যেই আমি মনে মনে স্থির করে ফেল্‌লুম বেশীদিন চাকরী করব না। কলকাতায় ফিরে গিয়ে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করব! যে কদিন এ অঞ্চলে আছি—সে কদিন বরং কিছু দেশ ভ্রমণ করে নিই। আগ্রা যাবার টিকেট কাটলুম। কাল সকালে রওনা হব। রাত্রে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লুম।

রাত তখন কতো বলতে পারি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। কে আমার দরজার কড়া নাড়ছে। এতরাত্রে কে কড়া নাড়চে! ভুল শুনলুম কি! আওয়াজ—আর সেই সঙ্গে মেয়েলি গলায় কে ডাকে—

—বাবুজি! বাবুজি!

গলার স্বরে যেন মিনতি উপচে পড়ছে! তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলুম। কালো আংরাখায় ঢাকা এক নারী মূর্তি। বাড়ীর পেছনের নিমগাছের ডালের ফাঁক দিয়ে যেটুকু চাঁদের আলো

ঝরে পড়েছে—তাতেই মনে হল এ যেন মানবী নয়, খাপে ঢাকা ইস্পাতের তলোয়ার! এক পলক চোখের পানে তাকিয়ে মনে হল আমার চোখের দৃষ্টি বুঝি ঐ বিদ্যুৎঝলকে ঠিকরে পড়ে যাচ্ছে। দৃষ্টি সরিয়ে নিলুম। সে কাকুতি করে বলল, মেহেরবাণী করে তাদের ফ্ল্যাটে একটিবার আসতে। নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলুম। ঘরে ঢুকে দেখি, আস্‌লাম খাঁ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলুম, বাড়ীতে আর কেউ নেই? সে জানাল, না। ঝি সেই বিকেল বেলা শব্‌জীমণ্ডী চলে গেছে—তার কোন্ আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। সকালে ফিরবে। তাকে ভরসা দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম চিকিৎসকের খোঁজে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুনীলের কথা। সুনীল ব্যানার্জী। একই সঙ্গে ছেলেবেলায় স্কুলে পড়েছি। ম্যাট্রিক পাস করবার পর আর দেখা সাক্ষাৎ নেই। এবার দিল্লিতে এসে দেখা পেলুম সুনীলের। হকিম আজমল খাঁ সাহেব য়ুনানী চিকিৎসার কলেজ খুলেছেন এখানে। সুনীল সেই কলেজ থেকে পাস করে হকিমি চিকিৎসা করছে। দিল্লিতে পাহাড়গঞ্জে তার ডিস্‌পেনসারী। বেশ গুছিয়ে নিয়েছে ও তল্লাটে। সুনীলের সঙ্গে দেখা করে সব বলতে সে ওই গভীর রাত্রে একটা দোকান খুলিয়ে কিছু বরফ জোগাড় করে দরকারী ওষুধ-পত্তর নিয়ে আমার সঙ্গে রওনা হল। মাথায় খানিকটা বরফ চাপাতে আধঘণ্টা পরে আস্‌লাম খাঁ চোখ চাইল। রক্তবর্ণ চক্ষু। আমাদের পানে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে অতি দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল। সুনীল তাকে এক ধমক দিল। আস্‌লাম খাঁ বিড়বিড় করে বকতে লাগল। সুনীল তাকে একটা ওষুধ খাইয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। তারপর আস্‌লাম খাঁর কপালে হাত দিয়ে বলল—ভয় নেই। জ্বর নেমে গেছে। ঘুমের ওষুধ দিয়েছি। এবার ঘুমিয়ে পড়বে। যদি দরকার বুঝিস্ কাল সকালে বরং আমায় খবর দিস্।

আমি প্রতিবাদ করে বললুম—

—না, না, আমি খবর দিতে পারব না। তুই অতি অবিশ্যি কাল সকালে আর একবার দেখে যাস্। আমি ভোরের ট্রেণে আগ্রায় চলে যাচ্ছি।

—আচ্ছা, কাল নিজেই আসব। সুনীল উঠে দাঁড়াল। আমি তাকে খানিকটা দূর এগিয়ে দেব বলে রাস্তায় নামলুম। সুনীল স্তব্ধ, নির্বাক। এ স্তব্ধতা বড় অস্বাভাবিক বোধ হল। একটু পরে আমিই জিজ্ঞাসা করলুম—

—জ্ঞান হবার পর ঐ লোকটা কী বলছিল। যার জন্য তুই ওকে অমন ধমক দিলি?

—কী আবার বলবে! পাস্তু ভাষায় মেয়েটাকে অতি অশ্লীল গালাগাল দিচ্ছিল।

একটু থেমে সুনীল আমায় জিজ্ঞাসা করল—

—কে রে? ঐ মেয়েছেলেটা ওই বুড়োর কে হয়?

—জানিনা। ছোট্ট জবাব দিলুম আমি।

সুনীলকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরে দেখি মেয়েটি আস্‌লাম খাঁর শিওরে বসে বরফ দিচ্ছে মাথায়। আস্‌লাম খাঁ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম জ্বর অনেক নেমে গেছে। টেম্‌পারেচার প্রায় স্বাভাবিক। আর বরফ দিতে হবে না বলে চুপ করে বসে থাক্‌লুম। খবরের কাগজ এঁটে জোড়াতালি দেওয়া লণ্ঠনের চিম্‌নী। তা থেকে আলোর চেয়ে বেশী ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সেই ঈষৎ অন্ধকারে বসে আছি আমি। সামনে নিদ্রাচ্ছন্ন এক বিকট দর্শন পেশোয়ারী। তার মাথার কাছে অনিন্দ্যসুন্দরী এক তরুণী। অনেকক্ষণ নীরব থেকে তরুণী জিজ্ঞাসা করল—

—বাবুজি, তুমি কাল আগ্রা যাবে?

—হ্যাঁ। তাজমহল দেখতে যাবো।

আর একটুকাল চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞাসা করল—

—কাশ্মীর দেখেছো?

আমি বললুম ঃ

—না। তবে, যাবার ইচ্ছে আছে।

উত্তর এলো ঃ

—যেয়ো কাশ্মীর দেখতে। আর সেখানে গিয়ে কায়েদ্‌রার খোঁজ নিও।

বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম ঃ

—কায়েদ্‌রা! সে কে?

—আমার ছোট ভাই। কাশ্মীরে বোট-হাউজ আছে তার। কাশ্মীরে গিয়ে তুমি তার খোঁজ কোরো। আমার সঙ্গে পরিচয় আছে বোলো। সে তোমায় খুব খাতির করবে। এক নিঃশ্বাসে এই কথাগুলি বলে ফেলেই সে যেন চমকে উঠল। তারপর কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আমি খানিকটা চুপ করে থেকে এক সময় জিজ্ঞাসা করলুম, আস্‌লাম খাঁ তোমার কে? অবিশ্যি বলতে যদি কোনো বাধা না থাকে—

—কিছুমাত্র বাধা নেই। ও আমার স্বামী।

স্বামী! এই প্রস্ফুটযৌবনা রূপকথার পরীর মত সুন্দরী মেয়েটির স্বামী—ওই কুৎসিত দর্শন, দুষ্ট ক্ষত রোগগ্রস্ত জানোয়ারটা! পরিহাস নয় তো! মেয়েটির মুখের পানে তাকালুম। মুখখানা মেঘ-গম্ভীর আকাশের মত স্থির অচঞ্চল। এতটুকু রহস্যের বিদ্যুৎ বিকাশ নেই সেখানে। না, পরিহাস নয়।

—বাবুজি, তুমি বাংলা মুলুকের লোক?

প্রশ্ন শুনে চমক ভাঙ্গল। জবাব দিলুম ঃ

—হ্যাঁ! কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?

—কসুর মাফ কোরো বাবুজি! আমতা আমতা করে বলল মেয়েটি ঃ

—আমার স্বামী বাংলা মুলুকের আদমীদের পছন্দ করে না। আমিও তাদের এড়িয়ে চলতে চাই। তাই নিতান্ত বিপদে না পড়লে কখনো তোমাকে ডাকতুম না।

অবাক হয়ে তাকাই তার পানে। সে চোখ নামিয়ে নেয়। বলে ঃ

—বাংলা মুলুকের লোকের শিরীণ বুলি, মিঠে বাৎ। কিন্তু মুখের চেয়েও বেশী কথা কয় তাদের চোখ।…তারপর আমার পানে তাকিয়ে বলে ঃ

—তোমাদের চোখ জাদু জানে।

বলতে বলতে তার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। একটি সকরুণ বিষণ্ণতায় দৃষ্টিকে বড় করুণ, বড় বেদনা পরিম্লান মনে হয়। কেরোসিনের প্রদীপটা হঠাৎ দপ্‌দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল, বাঁহাতে আস্তে আস্তে আলোটাকে কমিয়ে দিয়ে সে আরম্ভ করে তার জীবন কথা।

জিন্নৎ কাশ্মিরী মেয়ে। তার ভাই কায়েদ্‌রা আর ছোট বোন জুবেদাকে নিয়ে ঝেলাম নদীতে নৌকার ওপর ছিল তাদের ছোট্ট সংসার। সেই নৌকার পাশেই তাদের লীজ নেওয়া বোট হাউজ, আর মুশাফিরদের বেড়াবার জন্য সুসজ্জিত শিকারা। পাঞ্জাব, বোম্বাই, কত মুলুকের মুশাফির কাশ্মীর বেড়াতে আসে। তাদের বোট্ হাউজে ঘর ভাড়া নেয়। জিন্নৎ নিজের হাতে তাদের জন্য কাশ্মিরী খানা পাকিয়ে দেয়। বোট হাউজের রুম পরিষ্কার করে দেয়, মুশাফিরদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। মুলুকে ফিরে যাবার সময় তারা বিল্ মিটিয়ে দেয়। কেউ কেউ দশ, পনের টাকা খুশী হয়ে বখশিস্ দিয়ে যায়। ভাই, বোন তিনটি প্রাণীর বেশ আনন্দেই দিন গুজরাণ হচ্ছিল। হঠাৎ সুখের সংসারে কালোমেঘের ছায়াপাত হ'ল। এক বাঙ্গালী বাবু এসে তাদের বোট হাউজে রুম ভাড়া নিল। লোকটা বুঝি জাদু জানে। জিন্নতের জীবনে ঝড় উঠল এই বাঙ্গালীবাবুর সাহচর্যে। কায়েদ্‌রা হয়তো ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। একদিন জিন্নৎকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বলল ঃ

—অতটা মিশবি নে ঐ বাঙ্গালী বাবুর সংগে। ও আদামীটা ভালো নয়। এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে ঃ

—ও আমায় সেদিন মদ খেয়ে বলছিল, বোট হাউজে আওরৎ মেলে না?

—আমি বললুম—এককালে মিলত, তখন বহুৎ ঝামেলা হোতো। এখন কাশ্মিরী পুলিশ কড়া পাহারা দিচ্ছে। ও হুকুম করবেন না বাবুজি। ওসব এখানে হবে না। একটু থেমে কায়েদ্‌রা বলে ঃ

—ওর থেকে তফাতে থাকবি। খুব হুঁসিয়ার। কিন্তু কায়েদ্‌রার খবরদারীতে কোনো ফল হোলোনা। বাঙ্গালী বাবুর কথায়, চোখের চাউনীতে জিন্নতের মনে উঠল মেঘ, উঠল ঝড়, জাগল বিচিত্র কামনার সাতরঙা রামধনু। নির্জন ডাল হ্রদের বুকে শিকারা করে সে বাবুজিকে বেড়াতে নিয়ে যায়। পদ্মকুঁড়ি তুলে বাবুজিকে উপহার দিতে গিয়ে উষ্ণ নিঃশ্বাস এসে লাগে কাশ্মিরী তরুণীর আতপ্ত কপোলে। গোধূলি রাঙা কাশ্মিরী পাহাড়ের চূড়ায় নেমে আসে বাংলার শ্যামলীমার মত আনম্র সন্ধ্যা। আবেশে চোখের পাতা মুদে আসে। আকাশ পৃথিবী সব লেপে মুছে একাকার হয়ে যায়। জিন্নৎ কাশ্মীর ছেড়ে পালাল সেই বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে। একটিবার মনে পড়ল কায়েদ্‌রার কথা, ছোট বোন জুবেদার কথা। কিন্তু সে শুধু একটি মুহূর্ত। রক্তে তার জ্বালা ধরিয়েছে প্রথম কামনার তীব্র সুরা; সেই নেশায় কায়েদ্‌রা, জুবেদা, জন্মভূমি কাশ্মীর সব যেন ছায়াছবির মত মিলিয়ে গেল।

প্রায় আট মাস তাদের জীবন কেটেছে মধু বাসন্তী রাত্রের মদির আবেশে। বোম্বে, সিমলা, আবু পাহাড় ঘুরে এসে চার মাস তারা স্থির হয়ে বাসা বেঁধেছিল লক্ষ্ণৌ-এ কাইজার বাগের কাছে একটি ছোট্ট বাংলোতে। সেই সময় পরিচয় হয় পেশোয়ারী আস্‌লাম খাঁর সঙ্গে। আস্‌লাম খাঁ তাদের রোজ টাঙ্গায় করে বেড়াতে নিয়ে যেতো। ফুট ফরমাস খাটতো। একদিন সকাল বেলা তারা

বেড়াতে বেরুবে—ঠিক এই সময় একটি টেলিগ্রাম এলো! টেলিগ্রাম পড়ে বাঙ্গালী বাবুর মুখের সমস্ত রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। আস্‌লাম খাঁর হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলল—আজকের দিনটা জিন্নৎকে তার বাড়ীতে রাখতে। কারা সব "মেহমান্" আসবে। জিন্নৎ আস্‌লাম খাঁর বাড়ীতে চলে গেল। রাত হয়ে এল। বাঙ্গালী বাবুর কোনো খবর নাই। আস্‌লাম খাঁ চুপিচুপি গিয়ে জেনে এল, বাংলোতে এক খুবসুরৎ বাঙ্গালী আওরৎ এসেছে। শুধু তাই নয়। আস্‌লাম খাঁ খোঁজ খবর নিয়ে পাকা খবর জেনেছে, ঐ আওরৎ বাঙ্গালী বাবুর সাদী করা জেনানা। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে জিন্নৎ! না না—এ কখনো সম্ভব হতে পারে না। বাবুজি নিজের মুখে বলেছে, সে এখনো সাদী করেনি, জিন্নৎকে নিয়েই সুরু হবে তার প্রথম দাম্পত্য জীবন। কতো আশা—ভবিষ্যতের কতো সুখ স্বপ্ন! না, না, আস্‌লাম খাঁ মিথ্যে ভয় দেখিয়েছে তাকে! বুড়োর হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি বুদ্ধি! তাই অমন হিংস্র জানোয়ারের মত তাকিয়ে থাকে তার পানে।

মেয়েছেলের মন নাকি বড় কৌতূহলী! কথাটা অবিশ্বাস করলেও জিন্নৎ চুপ করে বসে থাকতে পারল না। হাজির হোলো কাইজার বাগের বাংলোয়। শোবার ঘরের দক্ষিণে একফালি মরশুমি ফুলের আর গোলাপের বাগান ছিল। পা টিপে টিপে অলক্ষ্যে সেই বাগানে ঢুকে পড়ল। খোলা জানালা দিয়ে ভিতরে তাকাল। একটি তরুণী মেয়ে, মাথার ঘোমটা খুলে পড়েছে—খাটিয়ার পাশে মেঝেতে লুটিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। বাঙ্গালীবাবু তাকে কত কী সব বোঝাবার চেষ্টা কচ্ছে, কিন্তু মেয়েটির কান্নার আর বিরাম নেই। জিন্নতের মাথার ভেতরটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল, চোখ ঝাপসা হয়ে এল। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পা যেন টলে পড়ে—বাগানের এক পাশে একটা ভাঙ্গা বেদীর মত

ছিল—টলতে টলতে সেখানে গিয়ে বসে পড়ল। দুহাতে মাথার দুপাশের শিরা জোর করে টিপে ধরল।

খানিক বাদে চোখ তুলে দেখে—বাবুটি কখন তারই পাশে এসে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে। মুলুক থেকে তার 'বহু' এসে হঠাৎ হাজির হয়েছে—তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মুলুকে পৌঁছে দিয়েই বাবুটি আবার ফিরে আসবে এখানে। বড় জোর দু'হপ্তার মধ্যে। তারপর আফ্রিকা না কোন দূর দেশে বাবুটির কারবার আছে; জিন্নৎকে নিয়ে সেখানে চলে যাবে "বহুর" নাগালের বাইরে। বাবুটি জিন্নৎকে অনেক সান্ত্বনা দেয়—জিন্নৎ কথা বলে না। এক সময় এক তাড়া নোট বাবুটি জিন্নতের কোলের ওপর রেখে দিতে জিন্নৎ চোখ তুলে তাকাল। ঠিক আগের মত তেমনি জাদু ভরা চোখে মিনতি জানিয়ে সে জিন্নতের মুখখানি দুহাতে তুলে নিজের মুখের কাছে এগিয়ে আনবার চেষ্টা করল। জিন্নৎ ছিটকে বেরিয়ে এল। নোটের গোছা ছড়িয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। ঝোড়ো হাওয়ার মত বেরিয়ে এলো কাইজার বাগের বাংলো ছেড়ে চিরদিনের মত।

আত্মকাহিনীর এইটুকু বলে খানিকটা হাঁপিয়ে পড়ল। ওড়না দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম :

—বাবুটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি ?

—না, তার একদিন পরেই আস্‌লাম খাঁর সঙ্গে আমি দিল্লি চলে আসি, এই হোটেল খুলি।

অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে রইলাম। তারপর এক সময় জিজ্ঞাসা করলাম :

—তাকে দেখতে সাধ হয় না তোমার ?

জিন্নৎ যেন চমকে উঠল, এক পলক আমার পানে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল, উদাস দৃষ্টি মেলে দিল বাইরে আকাশের পানে। অনেকটা আত্মগত ভাবেই বলল :

—বেশী লোভ করা ভালো নয় বাবুজি!—একটু বিরতির পর আবার বলল ঃ

—বহুটি সেদিন খুব কেঁদেছিল। অত কাঁদতে আমি কাউকে দেখিনি। দিল্ ভাঙ্গা রক্ত যেন চোখের জল হয়ে উপছে পড়ছিল! উঃ সে কি কান্না!

আস্‌লাম খাঁ একটু নড়ে ওঠে। মেয়েটি চুপ করে যায়। তার মাথায় হাত বোলায়। না, ঘুম ভাঙ্গেনি—দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

—আচ্ছা বাবুজি, কেয়া ফুল জানো? মেয়েটির চোখে এবার কৌতুক ভরা দৃষ্টি। আমি বললুম, জানি; ওতো বাংলা মুলুকের ফুল!

হাসতে হাসতে বলে ঃ

—সে আমায় কেয়া বলে ডাকত। কেয়া বনে নাকি সাপ থাকে!

দুটি উচ্চ গিরিচূড়ার মাঝখানের সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় সঞ্চরমান কাল সাপের মত মাথার বেণীটি বুকের ওপর দুলছে; সেই বেণী নিয়ে খেলা করতে করতে জিজ্ঞাসা করল ঃ

—হাঁ বাবুজি, আমায় কেয়া বলত কেন? আমার মনে কি সাপ আছে?

—না, কেয়ার গন্ধে সাপ এসেছিল। ছোবল মেরে সরে গেছে। জবাবটা হয়তো তার মনঃপুত হল না। শুধু একবার মাথা নাড়ল, ভুরু দুটি কুঁচকে গেল।

—তুমি কাশ্মীর যেয়ো বাবু! কায়েদ্‌রার বোট-হাউজে যেয়ো। আমার কথা সুধায় যদি, বোলো, আমি ভাল আছি, খুব ভালো আছি।

চোখের কোলে সেই ঈষৎ অন্ধকারেও এইবার যেন এক ফোঁটা জলের চিহ্ন দেখলুম। ব্যথিত কণ্ঠে বললুম ঃ

—তুমি তোমার মুলুকে ফিরে যাবে? যদি টাকার দরকার হয়—তীব্র প্রতিবাদের সুর বেজে উঠল জিন্নতের কণ্ঠে ঃ

—না, না, মুলুক যাব না। কায়েদ্‌রার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছি—

জুবেদার এখনো সাদী হয়নি। সবাই আমাকে দেখে ছিঃ ছিঃ বলবে।···আমি সত্যিই ভাল আছি। আস্‌লাম খাঁ খুব ভালো লোক, আমায় খেতে দেয়। আদর করে। খুব ভালো আদমী।

নির্যাতিত, বঞ্চিত নারী হৃদয়ের সবটুকু মমতা উজাড় করে ঢেলে দেয় সেই রোগক্লিষ্ট কদর্য মানুষটির সেবায়। ঝুঁকে পড়ে তার সেই ক্ষতদুষ্ট মুখখানার ওপর। ওড়না দিয়ে নাকের পাশের রক্ত পুঁজ মুছে দেয়। সাহস হয় না আমার আর একটি কথা বলতে।

ভাঙ্গা মস্‌জিদ থেকে আজানের ধ্বনি ওঠে। টাঙ্গাওয়ালা এসে হাঁক দেয় স্টেশনে যাবার জন্যে। নিঃশব্দে বেরিয়ে আসি আস্‌লাম খাঁর ফ্ল্যাট ছেড়ে। যাত্রা করবার সময় দরজার ধারে দাঁড়িয়ে একটিবার ফিরে তাকাই। জিন্নৎ তেমনি বসে আছে আস্‌লাম খাঁর বুকের কাছে। আমি যে চলে যাচ্ছি—সে তা টেরও পায়নি। অবাক হয়ে গেলুম! কেন—কার জন্য, কিসের এ ধ্যান! আস্তে আস্তে নীচে নেমে এসে টাঙ্গায় উঠলুম। টাঙ্গা এগিয়ে চলল স্টেশনের দিকে। পেছনে তাকিয়ে মনে হল গোটা ফ্ল্যাট বাড়ীটা যেন ওই রহস্যময়ী নারীর মত ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আলো আঁধারের মাঝখানে মিলিয়ে যাচ্ছে।

॥ দুই ॥

আগ্রায় আমার সঙ্গে এসেছিলেন রামনগর কলোনীর এক বন্ধু; আসল নামটা নাই বললুম, তাঁকে বরং প্রভাতবাবু বলব। এক অফিসে কাজ করি, বেশ শাদাশিধে মানুষটি। কুতুব রোডে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকলেও আমার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল ওঁর বাড়ীতেই। প্রভাতবাবুর স্ত্রী দুবেলা নিজে রান্না করে পরম যত্নে খাওয়াতেন। গৃহ সুখে অভ্যস্ত নির্বিরোধী, সরল চিত্ত গৃহস্বামীকে মহিলাটি আমার জিম্মা করে দিয়ে বললেন ঃ

—অনেক দিন দিল্লিতে আছি। তবু উনি কখনও বাইরে কোথাও বেড়াতে যাননি। যখন যাবেন বলে বায়না ধরেছেন, নিয়ে যান। তবে ওঁর তাল সামলাতে আপনাকে হিমসিম খেতে না হয়!

মৃদু হেসে জানালুম, কিছু ভাবতে হবে না ওঁর জন্য, আমি আছি। তখন বুঝিনি, পরে বেশ টের পেয়েছিলুম মহিলাটি আমায় যে সতর্ক করেছিলেন তা অকারণ নয়।

গাড়ীতে উঠেই গাড়ীর সীটের ধুলো থেকে আরম্ভ করে পথের চা জলখাবারে রোগের বীজাণু, যাত্রীদের জায়গা দখল করা সম্বন্ধে অভিযোগ, কুলীদের জুলুমবাজী করে অন্যায়রূপে বেশী পয়সা দাবী করার অভিযোগ ইত্যাদি স্তূপাকার প্রতিকারহীন অভিযোগ সহ সহযাত্রী আমার সঙ্গে আগ্রায় পৌঁছুলেন। একটি হোটেলে মালপত্তর রেখে আগ্রা ফোর্ট দেখতে বেরিয়ে পড়লুম। গাইড চারদিক ঘুরে দেখাচ্ছে, কক্ষের পর কক্ষে নিয়ে যাচ্ছে, প্রতিটি ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কাহিনী শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে তার সঙ্গে এগিয়ে চলেছি।

বাদশাহ আকবরের স্থাপিত প্রাসাদ দুর্গ, বাদশাহ সাজাহানের আমলে এই দুর্গের পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন। সুদৃশ্য দেওয়ান-ই-আম, যেখানে বাদশাহ প্রকাশ্য দরবারে বসে সারা হিন্দুস্থানের প্রজামণ্ডলীকে দর্শন দিতেন, বিচার করতেন, অভাব অভিযোগ শুনতেন। তারপর মতি মসজিদ, নাগিনা মসজিদ, ইতিহাস প্রসিদ্ধ মীনাবাজার। কত রূপকথা, কত কাব্যকথা রচিত হয়েছে এই মীনাবাজারের খুস্‌রোজ আর নওরোজ মেলাকে কেন্দ্র করে! হিন্দুস্থান, ইরাণ, তুরাণ, দুনিয়ার নানা মুলুকের সেরা সুন্দরীদের হাস্যে, কৌতুকে, কঙ্কণ ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে উঠত একদা এই মীনাবাজার। রূপের জৌলুষে মুগ্ধ শাজাদা বাদশারা সুন্দরীদের দোকানের রূপা কিনে নিতেন সোনার দাম দিয়ে। পণ্য এখানে ছিল গৌণ; পণ্যবাহিকারই সৌন্দর্যের জয় জয়কার। তরুণ সেলিম এই মীনাবাজারে এসে একদিন কন্দর্প শরে জর্জরিত

হয়েছিলেন মেহেরউন্নিসাকে দেখে। যার ফলে সম্রাট হয়ে মসনদে বসে শের আফগানের রক্ত মথিত করে ছিনিয়ে এনেছিলেন একদিন রূপ-শতদল জগজ্জ্যোতি নূরজাহানকে। মীনাবাজারের পর মচ্ছিভবন বা বেগমদের মৎস্য শীকারের স্থান, তার পেছনে দেওয়ান্-ই-খাস্ যেখানে বিশিষ্ট ওমরাহ আর রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে বাদশাহের গোপন মন্ত্রণা সভা বসত। গাইড একটির পর একটির বর্ণনা দিয়ে নিয়ে গেল "পঁচিশির ছকের" কাছে। সুন্দরী তরুণীরা এখানে বাদশাহের খেলার ঘুঁটি হয়ে ছক্ আলো করে বসে থাকতেন। বাদশাহ তাদের ছকের ওপর চালনা করে খেলার সখ মেটাতেন। সম্মনবুরুজের পশ্চিম দিকে শীস্‌মহল, দেওয়ালের চারদিকে স্ফটিকের আয়না। বেগমরা এখানে স্নান করতেন। কুন্দশুভ্র নগ্নতনুর প্রতিবিম্ব পড়ত ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে। দুনিয়ার বাদশাকে জয় করতে হলে বিজয়িনী কেমন করে গ্রীবা বাঁকিয়ে দাঁড়াবেন, হরিণ নয়নার কোন দৃষ্টিভঙ্গি বাদশাহের বুকে শাণিত তীরের মত বিদ্ধ হবে, নিম্নোষ্ঠ ঈষৎ দংশন ছলে মুক্তাপাঁতির মত দন্ত রুচির আভায় প্রিয়তমকে স্পর্শ কাতর করে তুলবেন—নানা বিচিত্র ভঙ্গীমায় তরুণীরা তারই অনুশীলন করতেন এই শীস্‌মহলে। আঙ্গুরীবাগ সংলগ্ন খাসমহলে এলুম। এইখানেই বন্দী শাজাহান যমুনার তীরে তাজমহলের পানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। গাইড প্রাচীরের গায়ে একটি পাথর দেখিয়ে বলল ঃ

—দেখুন বাবুসাব, এই পাথরের ভেতর দূরের তাজমহলের পরিস্কার ছায়া পড়েছে। এমনি আরও অনেক পাথর বসানো ছিল এইখানের প্রাচীরে, স্তম্ভে। ইংরেজ আমলে তার সবই খুলে নিয়েছে। পাথরের টুকরোর ভিতর লক্ষ্য করে দেখলুম, সত্যি তো! তাজমহলের পরিপূর্ণ প্রতিবিম্ব! প্রভাতবাবুকেও দেখবার জন্য অনুরোধ করে, পেছন ফিরে দেখি, প্রভাতবাবু নেই। কী আশ্চর্য! কোথায় গেলেন ভদ্রলোক! অতিক্রম করে আসা পথে আবার ফিরে চললুম। ঐ যে ওখানে দেওয়ালে ভর দিয়ে বসে আছেন।

—কী হল ?

—কী আবার হবে !…প্রভাতবাবু উত্তেজনায় হাঁপিয়ে উঠলেন। একটু থেমে বললেন ঃ

—আচ্ছা, লোক আপনি মশাই ! আমায় একা ফেলে রেখে ঐ লোকটার সঙ্গে দিব্যি খোস্ গল্প করতে করতে চলে গেলেন। আমার এদিকে হার্ট ট্রাবেল !

লজ্জিত হয়ে বললুম ঃ

…সত্যিই অন্যায় করেছি। এবার হোটেলে ফিরে যাবেন ?

…হাঁ, তাই চলুন। উঠে দাঁড়ালেন, তারপর কী ভেবে যেন বললেন ঃ

—আচ্ছা, চলুন ; এসেছি যখন তাজমহল দেখাটাই বা বাকি থাকে কেন। ওটা শেষ করে যাই।

—বেশ, তাই চলুন।

টাঙ্গায় উঠে তাজমহলে পৌঁছুলাম। তাজমহল দেখে খুসীতে প্রভাতবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন ঃ

—বাঃ, চমৎকার ! এমন সুন্দর বলেই পৃথিবীর নানা দেশের লোক তাজমহল দেখতে ছুটে আসে। স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার জন্য শাজাহান বাদশার এ এক অপূর্ব কীর্তি। শাজাহান বাদশা ওয়াজ রিয়েলি এ পোয়েট্। আপনার কি মনে হয় ?

তাজমহল সম্বন্ধে অতি মূল্যবান অভিমত জানিয়ে সৌন্দর্য বোধের গর্বে আত্ম-সচেতন প্রভাতবাবু আমার মুখের পানে তাকালেন। আমি বিনীত হাস্যে জবাব দিলুম ঃ

—আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শাজাহানকে সম্রাট বলেই ভেবেছি চিরদিন, কবি রূপে কখনো কল্পনা করিনি। আজ বুঝলুম, তিনি সত্যিই কবি ছিলেন।

প্রভাতবাবু আমার কাঁধে মুরুব্বি চালে হাত রেখে একটু চাপ দিয়ে আমায় কনগ্রাচুলেট করলেন। উৎসাহের সঙ্গে বললুম, চলুন না, আগে মিনারের ওপর উঠে যমুনার চারদিকটা দেখে নিই,

তারপর তাজমহলের গর্ভ-প্রকোষ্ঠে নেমে মমতাজের সমাধিতে ধূপ দীপ জ্বেলে দিয়ে আসব।

—আমি পারব না মশাই, আমার দেখা হয়ে গেছে। ইচ্ছে হয়, আপনি যান! আমি এখানে বিশ্রাম করি। বলেই সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর প্রভাতবাবু সটান শুয়ে পড়লেন। কি আর করি, অগত্যা একাই এগিয়ে চললুম। পেছন থেকে শুনলুম:

—দেখবেন মশাই, একটু তাড়াতাড়ি ফিরবেন, বিদেশ-বিভূঁয়ে আমায় একা ফেলে কেটে পড়বেন না যেন!

সন্ধ্যা হয়ে আসে। শুক্ল পক্ষের রাত! চাঁদের আলোয় তাজমহলের রূপ!···না, দেখবার উপায় নেই। প্রভাতবাবুর চেঁচামেচিতে তাড়াতাড়িই ফিরতে হল।

হোটেলে ফিরে এসে প্রভাতবাবু জানালেন যে ভোরেই মথুরা, বৃন্দাবন রওনা হতে হবে। দেখাশুনো সেরে যত শীঘ্র ঘরে ফেরা যায় ততই ভাল। এসব জার্নির ধকল্ কী সবার সয়? এমনভাবে কথাগুলি বললেন যেন সব দোষ আমার, আমিই তাঁকে জোর করে ধরে এনে বিপদগ্রস্ত করেছি। প্রতিবাদ করার চেয়ে চুপ করে শুনে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। চুপ করেই রইলুম। প্রোগ্রাম মাফিক পরদিন ভোরে মথুরা যাওয়া গেল না। প্রভাতবাবুর শরীরটা নাকি বেজুৎ। সেদিন আগ্রায় থেকে যেতে হল। তার পরের দিনও। প্রভাতবাবু কাচ্চাবাচ্চাদের জন্য সেদিন রকমারী জিনিস-পত্তর সওদা করে কাটালেন। আমি কাটালুম ঐতিহাসিক যুগের পুরোনো কীর্তিকলাপ দেখে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে রওনা হলুম মথুরা।

গভীর রাত্রে মথুরা পৌঁছুলাম। স্টেশন থেকে ঐ রাতে সহরে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। রাত করে কোথায় উঠব? সকাল হলে দেখে শুনে সুবিধামত কোথাও ওঠা যাবে। প্রভাতবাবুকে বললুম:

—এদিকে বড় ছিঁচ্‌কে চোরের উপদ্রব। স্যুটকেশ মাথার

নিচে রেখে শুয়ে পড়ুন। আর এক কথা, পাণ্ডারা এখানে ভয়ঙ্কর উপদ্রব করে শুনেছি। আমি ঘুম থেকে ওঠবার আগে কোনো পাণ্ডার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন না। আমি উঠে যা হয় করব। প্রভাতবাবু হেসে বললেন ঃ

—মাথা খারাপ হয়েছে মশাই? আমি কেন কথা কইতে যাবো? সঙ্গে নিয়ে এসেছেন যখন, যা ব্যবস্থা করতে হয়, যা ঝামেলা পোহাতে হয় আপনি পোহাবেন। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছি।

প্রভাতবাবু আমার পাশেই শুয়ে পড়লেন। একটু তন্দ্রার মত এসেছে, হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার মাথার নিচের স্যুটকেশ ধরে টানছে! চোর নাকি! লাফিয়ে উঠে বসলুম। দেখি প্রভাতবাবুর মালপত্তর কুলীর মাথায় উঠে গেছে। মথুরার পাণ্ডার নির্দেশে আর একটি কুলী এবার আমার মালপত্তর নিয়ে টানাটানি সুরু করেছে। নিরীহ সুবোধ বালকের মত প্রভাতবাবু পাণ্ডার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। বামাল আসামী গ্রেপ্তার করে পুলিশ যেমন গার্ড দিয়ে নিয়ে যায় নিঃশব্দে পাণ্ডার পিছনে আমরা দুটি প্রাণী সন্তর্পণে এগিয়ে চললুম। ব্যাপারটা যেন ভোজবাজির মত মনে হল। আমায় চুপ করে থাক্‌তে দেখে প্রভাতবাবু বললেন ঃ

—আপনি আমার ওপর রেগে গেছেন! কী করব? পাণ্ডাটি এসে আমায় ডেকে তুলল। বললে, থাকা খাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা করে দেবে নিজের বাড়িতে। এতটুকু অসুবিধে হবে না। যাকে বলে হোম্‌-কমফর্ট! বুঝলেন মশাই?

বুঝলুম বই কি? আমি একা নই, একটু বাদে প্রভাতবাবুও হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলেন—পাণ্ডার চমৎকার ব্যবস্থার বহর। কাঠের পাটাতন দেওয়া দোতলা ঘর, মই-এর মত একটি নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে তার দোতলায় উঠলুম, স্তূপাকার ধুলো জমে আছে চারিদিকে! কাঁচা নর্দমার দুর্গন্ধে আর সেই সঙ্গে প্রাতঃকালীন

ক্রিয়াকলের দুর্গন্ধে পেটের নাড়ী শুদ্ধ মোচড় দিয়ে ওঠে, তীব্র বমনোদ্রেক হয়। ভাঙ্গা খাটিয়ায় সন্তর্পণে বসবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি মৌমাছি পূর্ণ মৌচাকের মত এটি একটি ছারপোকা-চাক্। বসবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মধু সংগ্রহের জ্বালায় পিতৃ স্মরণ করে লাফিয়ে উঠলুম। পাণ্ডাপ্রবর এবার আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা করতে চলে যাচ্ছিলেন, প্রভাতবাবু তাঁকে ডেকে বললেন :

—এ কী রকম থাকবার যায়গা ? এর চেয়ে ভাল ঘর নেই ? পাণ্ডাটি এতক্ষণ ভিজে বেড়ালের মত চুপ করে ছিল, আপন গহ্বরে পেয়ে এবার সিংহ মূর্তি ধারণ করল :

—আবার কি ভাল ঘর হবে ? মথুরারাজের প্রাসাদ খুলে দিতে হবে নাকি বাবুদের জন্য ?

তার মূর্তি দেখে প্রভাতবাবু দস্তুর মত নার্ভাস হয়ে পড়লেন। লোকটা যাতে না বোঝে তাই আমাকে ইংরেজীতে বললেন :

—মহা বদমাশ লোকের খপ্পরে পড়েছি মশাই। পাণ্ডা নয়, এ বেটা গুণ্ডা। শেষে মারধর করে মালপত্তর কেড়ে না রাখে! খাওয়া দাওয়া মাথায় থাক। চলুন, ট্যাক্টফুলি এর খপ্পর থেকে কোনো রকমে কেটে পড়ি।

পাণ্ডাটি খানিকক্ষণ প্রভাতবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে থেকে বক্তব্য বিষয় কিছুটা আন্দাজ করে নিল। তারপর বিকৃত কণ্ঠে বলল :

—ইংরেজী বাৎ ছাড় মশাই। উর্দুতে বলো না, কি বলতে চাও ?

এর সঙ্গে ঝামেলা করে লাভ নেই। হাঁকডাকে ইতঃমধ্যে পাঁচ সাতটি গয়লা শ্রেণীর যণ্ডাগুণ্ডা লোক এসে বাড়ীর সামনে জমায়েৎ হয়েছে। পাণ্ডাটিকে বললুম :

—আমাদের জন্য খাওয়া দাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে না। মন্দিরের প্রসাদ গ্রহণ করব। দুপুরের পরই বৃন্দাবন চলে যাব। যা দেখাবার এই বেলা দেখিয়ে দাও।

মালপত্তর সেইখানে রেখে পাণ্ডার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। দ্বারকানাথ মন্দির, মথুরানাথ মন্দির, দেবকী মন্দির প্রভৃতি দেখলুম। তারপর—উঁচু নিচু ঢিবি, ছোট বড় বিগ্রহ, নতুন বেদী পুরোনো বেদী, স্নানের ঘাট, ঘাটের সন্ন্যাসী, পাণ্ডা যেখানে যেমন হুকুম করল যথাসাধ্য জরিমানা দিয়ে পাণ্ডার বিল মিটিয়ে জিনিসপত্তর নিয়ে মথুরা ত্যাগ করলুম। যাবার সময় মনে মনে বললুম :

—অপরাধ নিও না মথুরানাথ, প্রণামী দিলুম না, আক্কেল সেলামী দিয়ে গেলুম।

বৃন্দাবনে আসবার পথে প্রভাতবাবু আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন, আর পাণ্ডার আশ্রয় নেবেন না। নিজেরা ঘুরে যেটুকু পুণ্য সঞ্চয় করা যায় সেই যথেষ্ট মনে করবেন তিনি। কিন্তু বৃন্দাবনেও বিধি বিরূপ হলেন। কেন, তাই বলছি এবার।

দিল্লিতে ধূতি পাঞ্জাবীর চেয়ে স্যুটেরই বেশী প্রচলন। ও বস্তুর মর্যাদাও সেখানে ঢের বেশী। ধূতি পাঞ্জাবী পরে রাস্তায় চলবার সময় দেখেছি টাঙ্গাওয়ালা অভদ্র ভাবে চীৎকার কচ্ছে :

—এই লণ্ডে, হঠ-যা।

আবার স্যুট পরে পথ চললেই টাঙ্গাওয়ালা নরম গলায় বিনীত ভদ্র অনুরোধ জানায় তাকে একটু পথ ছেড়ে দিতে। তাই বলছিলুম স্যুটের কদর ওখানে ঢের বেশী। প্রভাতবাবু একখানি ধূতি মাত্র সঙ্গে করে বেরিয়েছেন। আর সবই স্যুট্। বৃন্দাবনে এসে তিনি স্যুট পরলেন। আমি প্রতিবাদ করে বললুম :

—ধূতি পরলে হ'ত না ?

তিনি জবাব দিলেন :

—দরকার কি ? আমি আর মন্দির টন্দির যাবো না। এখানে তো পাণ্ডা রূপ উপগ্রহ জোটাই নি! খেয়াল মাফিক ঘুরব। আপনি ধূতি পরেছেন, ইচ্ছে হলে আপনি মন্দিরে ঢুকবেন।

তাই হ'ল। আমি মন্দিরে যাই, বিগ্রহ দর্শন করি, প্রভাতবাবু

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ফোঁকেন। কিন্তু মুস্কিল হল এক যায়গায় এসে। এক ভদ্রলোক সামনে একটি মন্দির দেখিয়ে বললেন যে ওখানে নাকি সোনার তালগাছ আছে। শুনে প্রভাতবাবু কৌতূহলী হলেন তালগাছটি দেখবার জন্য। বৃন্দাবনের বংশী বট তাঁকে টানলো না, কেলী-নিকুঞ্জ তাঁকে ভোলাতে পারল না, কালীয়দহের কালোজলে, যমুনা সৈকতের তরঙ্গ ভঙ্গে তিনি হয়তো সেই মথুরাবাসী যমদূতরূপী পাণ্ডার ছায়া সঞ্চার দেখবার আশঙ্কায় দূরে সরে রইলেন, কিন্তু সোনার তালগাছ মোহমুদ্গর রূপে তার মোহ ভঙ্গ করল। তিনি আমার সঙ্গে মন্দির প্রাঙ্গণে ঢোকবার জন্য জুতোর ফিতে খুল্‌তে ব্যস্ত হলেন। অদূরে কযেকটি লোক, মনে হল—ও অঞ্চলের কোনো কলেজের ছাত্র হবে···সামনে এগিযে এল। তার ভেতর একজন প্রভাতবাবুকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

—যিনি বৃন্দাবন পরিক্রমা করেছেন, এই পুণ্য তীর্থকে চিহ্নিত করে গেছেন সেই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের দেশের লোক আপনারা। চেহারা দেখে অন্ততঃ সেই রকম অনুমান হয়। শ্রীধামে আসতে হলে সাহেবি পোশাক পরে আসতে নেই, একথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে আমরাই লজ্জায় মরে যাই।

প্রভাতবাবুর বেশ ফর্সা রঙ। রাগে অপমানে ভদ্দর লোকের মুখ একেবারে লাল টুকটুকে হয়ে গেল। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলুম। প্রভাতবাবু আদ্দেক খোলা জুতোর ফিতে আবার টেনে বেঁধে একটি কথা না বলে গটগট করে চলে গেলেন। ভদ্দর লোককে এ অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে আমারও মন্দিরে ঢোকা উচিত নয়। তাঁর পেছু নিলুম। পরিত্রাহি ছুটছেন উনি। দৌড়ে যাচ্ছেন বললেই চলে। পথের মোড়ে গিয়ে কোন রকমে পাকড়াও করলুম।

—প্রভাতবাবু, শুনুন।

—থাক, যথেষ্ট হয়েছে।···উত্তেজনায় ওঁর গলার স্বর কাঁপছে—এ রকম অপমান জীবনে কখনও হইনি।

আমি আম্‌তা আম্‌তা করে বললুম ঃ

—আমার ওপর চটছেন কেন?

ভদ্দর লোক খেঁকিয়ে উঠলেন :

—চটব না? লোকগুলো আমায় অপমান করল, আর আপনি প্রতিবাদ করা দূরে থাক্, মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন! লক্ষ্য করিনি আমি?

ভদ্দর লোকের ভাবভঙ্গী দেখে আবার হাসি পেল। না, আর হাসলে মাথায় হয়তো এক ঘা বসিয়ে দেবেন। চুপ করে তাঁকে অনুসরণ করলুম। খানিক বাদে তিনি বললেন :

—আমি আজই দিল্লি যাবো।

—সেকি! আমি ভেবেছিলুম আরও কিছুদিন···আমার কথার মাঝখানে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রভাতবাবু :

—আপনার যেখানে খুসী যান্। আমাকে শুধু দিল্লির গাড়ীতে চাপিয়ে দিন। আশা করি ভদ্রতার খাতিরেও এই দয়াটুকু করবেন।

আস্তে আস্তে বললুম :

—তা না হয়, আমিই গাড়ীতে চাপিয়ে দিলুম। কিন্তু একা একা যেতে পারবেন কি?

প্রভাতবাবুর আত্ম-পৌরুষে বুঝি আঘাত লাগল। অসম্ভব জোর দিয়ে বললেন :

—নিশ্চয়ই পারব। আমি জোয়ান মরদ ব্যাটাছেলে। মনে করবেন না, শুধু আপনার ভরসায় এত দূরে এসেছি। কুলী দিয়ে মালপত্তর তুলে আমায় টিকেট কেটে গাড়ীতে চাপিয়ে দিন। দেখুন আমি যেতে পারি কিনা।

পরের দিন প্রভাতবাবুকে লট্ বহর শুদ্ধ দিল্লির গাড়ীতে তুলে দিয়ে এবং নামবার সময় সমস্ত জিনিসপত্তর গুছিয়ে সঙ্গে নেবার অনুরোধ জানিয়ে আমি চেপে বসলুম লক্ষ্ণৌ গামী ট্রেনে।

রাত্রের ট্রেন। শুক্ল পক্ষের রাত। কামরার বাতিটা নিভিয়ে দিতেই একমুঠো যুঁইফুলের মত নরম জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ল আমার

চোখে মুখে। মনে পড়ল তাজমহলের কথা। সেদিন প্রভাতবাবু হোটেলে শুয়েছিলেন, একাই বেরিয়েছিলুম তাজমহল দেখতে। সন্ধ্যার কালো যবনিকা সরে যেতেই আকাশ বীণার সহস্র তন্ত্রী যেন এক সঙ্গে বেজে উঠল। চাঁদের রশ্মি বেয়ে সেই সুর-স্রোত "কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল" তাজমহলকে স্পর্শ করল, সুর-ধারায় স্নান করিয়ে দিল। সহসা মনে হল, জীবনে কী যেন পাইনি! কোন পরম কামনার ধনকে হারিয়ে রামগিরির বিরহী যক্ষের মত কল্পনার অলকাপুরী পানে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি! মনের আতপ্ত আবেগ আকাশের সহস্র তন্ত্রীতে ঝংকৃত হয়ে ওঠে। সেই উত্তাপে শ্বেত পাথরের তাজমহল একটু একটু করে মোমের মত গলে যায়। সুরের গলিত প্রবাহে মিশে যায়। নীল যমুনা জল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আকাশের নীল, যমুনার নীল এক হয়ে ভুবন ব্যাপী এক অলৌকিক নীল জ্যোতির সৃষ্টি করে। শাজাহান, মমতাজ, মোঘল-মহিমার তিলমাত্র ছায়া কোথাও খুঁজে পাইনা। দেশ কাল যুগের পরিধি অতিক্রম করে যাই। দেখতে দেখতে সেই নীলের প্লাবনে সহসা জেগে ওঠে মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত জ্যোতিসত্ত্বা এক নীল নবঘন মূর্তি। ব্রজ মণ্ডলের কত লীলা বৈচিত্র্য একে একে ভেসে ওঠে। দু'চোখ আপনা হতে বুজে আসে। লক্ষ্মৌ গামী ট্রেনে বসে সেই রাত্রেই আলো জেলে লিখতে সুরু করলুম...

কৈশোরে সে ব্রজপুরে গোধন চারণ
শ্রীদাম সুদাম সখা বলরাম সনে
স্মরণ করো তো সখি!
হৃদয় পুলকে ভোর, নয়নে স্বপন,
কদম্ব তমাল তলে শ্রীবংশী বাদন!
ধেনু বৎস ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ, আনন্দে অধীর,
মৌন মুগ্ধ মুখে চায়, চোখে অশ্রুনীর।

যমুনা উজান বহে, কলকল নাদ,
তরঙ্গে রোমাঞ্চ তার। পূর্ণমসী চাঁদ
আকাশে জাগিয়া ওঠে, দুলে ওঠে
তারার স্পন্দন।

প্রিয়সখী দ্রৌপদী দামোদরের মুখে তাঁর বাল্য লীলা বর্ণনা শুনে আকুল কণ্ঠে বলেন "আরো বলো প্রিয় সখা, আরো বলো!" দামোদর শুরু করেন ঃ

শুনিয়াছ প্রিয়সখি—
সৈকতের নীপবনে বাঁধিয়া ঝুলনা
দুলিতাম রঙ্গভরে। চরণ পরশে
পুষ্পিত হইত লতা, শ্যাম শষ্পদল,
বেণু-স্বনে ঝুরিত মল্লার।
আকাশে ভাসিত মেঘ; নদী, বনপথে
সজল কাজল ছায়া ধীরে ফেলে যেত।
শঙ্কাকুল বক্ষখানি নীলাঞ্চলে ঢাকা,
নীরব চরণ মুক্ত রতন-মঞ্জির
অভিসারে আসে মোর প্রিয়া!
যুগলে ঘিরিয়া হরিণ হরিণী নাচে,
নাচে শিখীদল, কলাপের বর্ণছটা
মেঘ রন্ধ্র চ্যুত আলোক চুম্বনে কভু
করে ঝলমল।

দিল্লি প্রবাস জীবনের পুরোনো কাগজ পত্রের মাঝখানে অনেক পরবর্তী কালে সেদিনকার এই রচনাটুকু খুঁজে পাই। পংক্তি কটি তুলে দিই ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে রচিত "সারথি শ্রীকৃষ্ণ" নাটকে।

লক্ষ্ণৌ। সিটি অফ গার্ডেন্স্। গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর। কিংবদন্তী বলে ঃ রামানুজ লক্ষ্মণের নামানুসারে লক্ষ্ণৌ নামের উৎপত্তি! দিন সাতেক ছিলুম সেখানে। নবাবী আমলের প্রাসাদ দেখলুম। ছত্র মঞ্জীল প্রাসাদ, দিল্‌খুস প্রাসাদ, মোতিমহল

প্রভৃতি। ঘুরে ঘুরে দেখলুম ইংরেজ রেসিডেন্সী। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম শহীদ, যাদের মুক্তিযজ্ঞের প্রয়াসকে বিদেশী ঐতিহাসিক নাম দিয়েছে 'সিপাহী বিদ্রোহ', তাদের অগ্নিক্ষরা সংগ্রামের সাক্ষী হয়ে রয়েছে বন্দুক আর কামানের গোলকে বিধ্বস্ত, বিবর্ণ ব্রিটিশ রেসিডেন্সী। দিল্লির লালকেল্লা দেখেছি, কানপুর, মীরাট দেখেছি, এবার লক্ষ্ণৌ-এর মুক্তি সংগ্রামের যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলুম নোট বই-এ টুকে নিলুম···ভাবীকালে কোন দিন যদি ভারতের প্রথম মুক্তি সংগ্রামের নাট্য আলেখ্য রচনা করতে পারি এই আশায়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যে কামনা করেছিলুম ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে সেই কামনাকে রূপায়িত করেছিলুম "শতবর্ষ আগে" নাটকের মাধ্যমে।

লক্ষ্ণৌ-এর পথ চলতে হঠাৎ একদিন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালুম কাইজার বাগের সামনে। ছোট্ট বাংলো বাড়ি, তারই সংলগ্ন বাগানে গোলাপ ফুটেছে। অসংখ্য রক্ত গোলাপ! একী সুনিবিড় রক্তরাগ! আশ্চর্য অদ্ভুত লাগল! পৃথিবীর কত অত্যাচারীর ইতিহাস, অত্যাচারিতের ইতিহাস, সমগ্র জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস সন তারিখ শুদ্ধ লিপিবদ্ধ থাকে শিলালিপিতে, পাহাড়ে খোদিত চিত্রে, হাতে লেখা পুঁথিতে, ছাপার হরফে। কিন্তু প্রিয়তমের কাছে পাওয়া পরম বঞ্চনায় নিঃশব্দে ক্ষত-বিক্ষত হল যে নারী হৃদয়···তার ইতিহাস? বুঝি সে রক্ত ঝরার ইতিহাস লেখে শুধু ঐ রক্ত গোলাপ! কেন জানিনা, বারবার মনে হল—জিন্নৎ ঐ বাংলোতেই সুখের স্বর্গ রচনা করেছিল, ঐ বাংলোতেই তার স্বপ্নের সমাধি। অপরিসীম বেদনায় বুকের ভেতরটা দুলে উঠল। পরদিনই লক্ষ্ণৌ ছাড়লুম। সোজা দিল্লি।

কুতুব রোডে আমার বাড়ীর নিচের হোটেল-ঘর তালা বন্ধ। তবে কি আস্‌লাম খাঁর অসুখ এত দিনেও ভাল হয়নি! সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলুম, মনে ভাবলুম আজও কি কেউ বলবে—"বাবুজি,

ঠ্যর যাইয়ে!"…না! পায়ের সাড়া পেয়েও কেউ বলল না তো কিছু! তাহলে সে রাত্রের পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়েছে জিন্নৎ! খুসি মনে তাদের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এলুম। একি! দরজা বাইরে থেকে তালা বন্ধ! গেল কোথায় তবে? চিন্তান্বিত মনে আমার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে মালপত্তর তুলে নিলুম। টাঙ্গাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আবার নিচে নেমে ওপাশের বিড়ি সিগারেটের দোকানীর কাছে আস্‌লাম খাঁর খবর জিজ্ঞাসা করলুম। সে জবাব দিল, এক হপ্তা আগে আসলাম খাঁ দোকান পাট বিক্রী করে দিয়ে তার বিবিকে নিয়ে কোয়েটা না কান্দাহার কোথায় চলে গেছে—তার পাত্তা কেউ জানে না।

—কেউ জানে না? শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম। সে মাথা নেড়ে জবাব দিল—না! চুপ করে দোকানীর মুখের পানে তাকালুম। তারপর আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে এলুম। আগ্রা যাবার দিন পেছন ফিরে দেখেছিলুম বাড়িটা ছায়া-ছবির মত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তখন কিন্তু এ সন্দেহের বাষ্পমাত্রও মনে জাগেনি যে, বাড়িতে ফিরে এসে দেখব সেই এক রাত্রের পরিচিতা রহস্যময়ী নারী মূর্তিটি চির দিনের মত আমার জীবন পরিক্রমার পথ হতে সত্যি সত্যিই এমন করে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কেন সে চলে গেল? আস্‌লাম খাঁ জ্বরের ঘোরে কেন সে রাত্রে তাকে কটুক্তি করেছিল? …আমায় ঘরে ডেকে এনেছে বলেই কি? তার এই আকস্মিক চলে যাবার জন্য নিজেকে যেন মনে মনে অপরাধী জ্ঞান হ'ল! এমন হবে আগে বুঝতে পারলে আস্‌লাম খাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া না করে, ওর মনের ভুল ভাঙ্গিয়ে না দিয়ে আমি কিছুতেই আগ্রায় যেতুম না। জিন্নতের জীবন কথা কিছুই তো ভাল করে জানা হল না! যেটুকু সে বলেছে, তার চেয়ে হয়তো আরও অনেক না-বলা রয়ে গেছে! সে পরম বেদনার আলেখ্য আমার তুলিতে আঁকতে পারলুম না। সে কাহিনী আঁকা থাকল শুধু রক্ত গোলাপের লাল আখরে।

অফিস থেকে ফিরে এসে এ বাড়িতে একা একা থাকতে আর ভাল লাগেনা। ঐ খালি ফ্ল্যাটটার পানে তাকাতে মনটা কী যেন একটা ব্যথায় ভরে ওঠে। না, এ বাড়ি ছেড়ে দেব। শুধু বাড়ি কেন। দিল্লির চাকরী ছেড়েই চলে যাবো। বাংলা দেশ ছেড়ে এই হাজার মাইল দূরে এসে জার্মান কোম্পানীর জীবন বীমার হিসেব কষে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করতে পারব না। মানসিক অবস্থার কথা খুলে লিখলুম কলকাতায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশাইকে। কেন যে আর কাউকে না লিখে তাঁকেই জানালুম···আমার অন্তরের সঙ্গে কতখানি যোগ ছিল তাঁর, আর কি করেই বা সে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল—সে প্রসঙ্গের যথা সময়ে অবতারণা করব। লাহিড়ী মশাই আমার চিঠির জবাবে লিখলেন "আমি জানি, দিল্লিতে চাকরী করা তোমার পোষাবে না। কলকাতায় চলে এসো। আমাদের দু'ভাই-এর মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা ঠাকুর এক ভাবে করে দেবেন।" সেই দিনই চাকরীতে ইস্তাফা দেব জানিয়ে কোম্পানীকে এক মাসের নোটিশ দিলুম।

এই এক মাসে একখানি নাটক লিখলুম "সোনার বাংলা।" চন্দন কুমকুমের প্রেম-কাহিনী এই নাটকের উপজীব্য। স্মৃতি-ভ্রংশ হয়ে চন্দন এসে উপস্থিত হয় নর্তকী অনুরাধার আশ্রয়ে। সেবায় যত্নে আর সেই সঙ্গে অন্তরের অনুরাগ দিয়ে অনুরাধা রাত্রিদিন ঘিরে থাকে চন্দনকে। কুমকুম্ দিকে দিকে চন্দনকে খুঁজে কেঁদে ফেরে—"আমার নীড় হারানো পাখী, ওরে আয়, ওরে আয়।" অনুরাধার গৃহে এক ঝড়ের রাতে সে ফিরে পেল তার হারানো রতন। চন্দনের ফিরে এল লুপ্ত-স্মৃতি। আর নর্তকী অনুরাধা? নিঃশব্দে চোখের জল লুকিয়ে চন্দনকে কুমকুমের হাতে তুলে দিল, আজীবন দগ্ধ হল বিরহের হোমাগ্নি শিখায়। নাটকখানি রচনা করবার সময় একটুও বুঝতে পারিনি, অনুরাধা চরিত্রের অন্তরালে অতি সন্তর্পণে, বুঝি আমার নিজেরই অজ্ঞাতে, একটুখানি স্থান করে নিয়েছে অভাগিনী জিন্নৎ।

সেদিন অফিস থেকে ফেরবার একটু পরেই দেখি শান্তারাম আর মহলকার আমার ফ্ল্যাটে হাজির হয়েছে। শান্তারাম পাঞ্জাবী, মহলকার মারাঠী। একই ডিপার্টমেণ্টে কাজ করি আমরা। দুজনে আমায় পাকড়াও করে নিয়ে গেল নিউ দিল্লির কনোট্-প্লেস্-এ। কনোট্-প্লেস্-এর প্রকাণ্ড পার্কটি গ্রীষ্মকালে বড় আরামপ্রদ জায়গা। যত রাজ্যের ছেলে বুড়ো কাচ্চা-বাচ্চা তরুণ-তরুণীর ভীড় হয় কনোট্ প্লেস্-এর পার্কে। রাত বারটা একটা পর্যন্ত অনেকে গল্পগুজব করেন, শুয়ে থাকেন এখানকার ঘাসের ওপর।

শান্তারাম আর মহলকার আমায় পাশে বসিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, ডক্টর জোমারের সঙ্গে আজ আমার কি কথা হয়েছে! ডক্টর হ্যানস্ জোমার। জার্মাণ পি-এইচ-ডি, আলিয়ান্স্ উণ্ড ষ্টাটগার্টার কোম্পানীর ভারতবর্ষ সিংহল ও বার্মার জেনারেল ম্যানেজার। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক। শান্তারাম আর মহলকারকে বললুম ঃ

—ডক্টর জোমার আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আমি চাকরীতে ইস্তাফা দিতে চাইছি। আমি তাঁকে আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বললুম। বাংলার রঙ্গমঞ্চ, বাংলার নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে তিনি আমায় অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। রঙ্গমঞ্চের সেবার পরিকল্পনা আমার সার্থক হোক এই শুভেচ্ছা জানালেন।

দু'জনে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। তারপর শান্তারাম এক সময় জিজ্ঞাসা করল ঃ

—ক্রুসেল সাহেবের সঙ্গে কোন কথা হয়েছে ?

হেল্‌মট ক্রুসেল। আমার ডিপার্টমেণ্টের ইন্‌চার্জ। বুল্‌ডগের মত মুখ, বাঘের মত হাতের থাবা, যেন একটি লৌহ দানব। আমি বললুম ঃ

—ক্রুসেল্ খেঁকিয়ে উঠল। আমায় বোকামী করতে নিষেধ করল। রেসিগ্নেশন্ লেটার্ উইথ্‌ ড্র করতে উপদেশ দিল।

শান্তারাম সায় দিয়ে বলল ঃ

—আমাকেও ব্রুসেল্ তাই বলেছে। তোমাকে ভাল করে বোঝাতে বলেছে, চাকরী যাতে না ছাড়।

তারপর শান্তারাম, মহলকার দু'জনেই নানারকম যুক্তির অবতারণা করতে লাগল। তাদের একান্ত ইচ্ছা আমি তাদের সহকর্মী রূপে থেকে যাই। কিন্তু তারা তো আমার মনের কথা বুঝবে না। বুঝতে চাইবে না, বুঝতে পারবেও না। অগত্যা ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। পার্কে আশে পাশে বহু মহিলা এসেছেন। পাঞ্জাবী; মারাঠি; গুজরাটি; সিন্ধি; ভারতের নানাপ্রদেশের লোক। সেক্রেটারীয়েটের অফিসার কেরাণীদের আত্মীয়া। লাল নীল বেগুনী হলদে এত বিচিত্র রঙ-বেরঙের পরিচ্ছদ···চোখ যেন ঝল্‌সে যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ

—শান্তারাম, মহলকার, তোমরা কেউ বলতে পার এখানে মেয়েরা এত রঙীন পোশাক পছন্দ করেন কেন?

আমার প্রশ্ন শুনে ওরা অবাক হয়ে গেল। মহলকার বললে ঃ

—বাঃ রে—মেয়েরা সৌন্দর্যের প্রতীক! তারা রঙ-বেরঙ-এর সুন্দর সাজে সাজবে না?

শান্তারাম এক পলক ঐদিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল ঃ

—হাউ নাইস্! যেন ঝাঁকে ঝাঁকে রঙীন প্রজাপতি।

আমি বললুম ঃ

—আমাদের বাংলা মুলুকে মেয়েরা কিন্তু এত উগ্র রং পছন্দ করেনা। তারা শাদা বা হাল্কা রঙ-এর শাড়ীই বেশী ব্যবহার করে।

ওরা অবাক হয়ে তাকাল আমার পানে। আমি বললুম ঃ

—বাংলা আর এ মুলুকে মেয়েদের পোশাকের রঙ-এর এই তারতম্যের একটা হেতু আছে আমার মনে হয়।

রোদে পোড়া পাথর আর বালির দেশ এটা। ঘাসের সবুজ ফ্যাকাশে হয়ে যায় এ মুলুকে। মানুষের মন আদিম কাল থেকে বর্ণ-বিলাসী। তাই এ মুলুকের মেয়েরা রঙ-এর অভাব মেটান··· ওড়না, পাঞ্জাবী, পেশোয়াজের চমকদার রঙে। বাংলা মুলুকে পথে

ঘাটে নদীতে আকাশে চারদিকে রঙের ছড়াছড়ি। তাই আমাদের মেয়েরা আটপৌরে সাদা বা হাল্কা রঙের শাড়ীই পছন্দ করে।

জবাবটা ওদের পছন্দ হল কিনা জানিনা। যাই হোক, অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে উঠে পড়লুম। ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু খেয়ে নিতে হবে।

শান্তারাম নিয়ে গেল এক পাঞ্জাবী হোটেলে। দরজায় ঢুকতেই হোটেলওয়ালা হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, আঙ্গুল দিয়ে দেখাল আমার মুখের জ্বলন্ত সীগারেট! শান্তারাম কানে কানে বলল:

—এরা বড্ড কন্‌জারভেটিভ। সীগারেট ফেলে দাও বাইরে।

তাই করলুম। টেবিলে বসে শান্তারাম গোস্ত্‌ চাপাটির অর্ডার দিল। আমি শান্তারামকে বললুম:

—শান্তারাম, তোমাদের অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দির দেখে এসেছি। সরোবরের মধ্যে সেই মন্দিরে ঢোকবার আগে জুতো খুলে রাখলুম, সীগারেট দেশলাই বাইরে ফেলে দিলুম। নাঙা মাথায় মন্দিরে ঢোকা নিষিদ্ধ, তাই মাথায় রুমাল জড়িয়ে নিলুম। সরোবরের ভিতর মন্দির সংলগ্ন যে পাথরের ব্রীজ আছে তার ওপর দিয়ে এগুবার সময় পাশের জলপূর্ণ চৌবাচ্চাগুলি থেকে অনেকবার হাঁটু অবধি পা ধুয়ে নিতে হল। মন্দিরে ঢুকতে হলে সেখানকার বিধি নিষেধ মানতে হয় এবং নিশ্চয়ই তার একটা মানেও আছে। কিন্তু আজকের এ ব্যাপারটা কি রকম হল? হোটেলে সীগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ কেন?

শান্তারাম জবাব দিলে:

—এরা গোঁড়া শিখ। ধূমপান নিষেধ করে গেছেন আমাদের গুরুজী।

—তা যদি হয় তবে ওটা কি হচ্ছে? পাশের টেবিলে ইসারা করে দেখালুম। সেখানে দুটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আহার্যের সঙ্গে সেই টেবিলেই স্কচ্‌ হুইস্কি খাচ্ছিলেন।

শান্তারাম লজ্জিত হয়ে পড়ল। বয় এসে আমাদের খাবার সার্ভ করে গেল। খেতে খেতে বললে শান্তারাম:

—মদ খাবার বিষয়ে গুরুজী কোন নির্দেশ দিয়ে যাননি।

কী আশ্চর্য! গুরুজী ধূমপান নিষেধ করে গেছেন আর মদের কথা উল্লেখ করেন নি! কারণ জিজ্ঞাসা করলুম শান্তারামকে। সে বললে ঃ

—ঠিক জানিনা! তবে আমার অনুমান কি জান? শিখজাতি তখন নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। গুরুজী তাদের সৎপথে চলতে উপদেশ দিয়েছেন। ধূমপান এক রকম নেশা, তাই ও থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। গুরুজী যে নবোদিত জাতিকে ধূমপান করতে নিষেধ করেছিলেন, হয়তো তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে সেই জাতি একদিন মদ্যপান করবে। তাই মদের নাম উল্লেখ করেন নি।

মহলকার মাথা নেড়ে বলল ঃ

—না, শান্তারাম তোমার যুক্তি ভাল লাগল না। আমার কিন্তু অন্য কারণ মনে হয়।

দুজনেই জিজ্ঞাসু চোখে তাকালুম মহলকারের দিকে। মহলকার বলল ঃ

—এখনকার দিনে ধূমপান করা মানে সীগারেট খাওয়া। প্যাকেট থেকে বার করলুম আর ধরালুম। পাঁচ সেকেণ্ডের ব্যাপার। কিন্তু তখনকার দিনে ধূমপানের আয়োজন করতেই প্রচুর সময় লাগত। আলবোলা আন, নল লাগাও, কল্কেতে তামাক সাজ, কল্কের আগুনে ফুঁ দাও, তারপর বেশ কিছুক্ষণ টানবার পর তবে ধূম উদগীরণ। ও সব আয়েস নবাব বাদশাদেরই শোভা পেত। নব-জাগ্রত শিখকে তখন মুঘল শক্তির সঙ্গে লড়াই করবার জন্য রাত দিন প্রস্তুত থাকতে হত। তখন যদি শিখ সৈন্যের মধ্যে তামাকের প্রচলন থাকত, তামাক সাজতে সাজতে মুঘলের সৈন্য সমুদ্রে তাদের ভেসে যেতে হত। তাই তোমাদের গুরুজী তামাক খাওয়া নিষেধ করেছিলেন।

একটু থেমে গলার আওয়াজে একটু কৌতুক হাস্য মিশিয়ে মহলকার আবার বলল ঃ

—মদ খাওয়াতে তো কোনো ঝামেলা নেই। যুদ্ধের সময় পানীয় জলের মত সঙ্গে রেখে দাও। গলায় ঢাল, উদ্দাম উত্তেজনা নিয়ে শত্রুর মধ্যে খঞ্জর হাতে ঝাঁপিয়ে পড়। মানুষের রক্তে স্নান করতে হলে রক্তিম সুরা বরং রক্তপাতের উন্মাদনাই এনে দেয়। যোদ্ধা জাতের পক্ষে ও জিনিসটা এক রকম অপরিহার্য।

মারাঠি তরুণ মহলকারের যুক্তির তারিফ করলুম আমি। চণ্ডীর শ্লোক মনে পড়ল…মধুপান মত্ত দনুজমর্দিনী চণ্ডিকার সেই রক্তিম ঘূর্ণিত লোচনের কথা।

অনেক রাত্রে বন্ধু দুটিকে বিদায় দিয়ে একা একা বাড়ি ফিরে এলুম।

॥ তিন ॥

দেখতে দেখতে দিল্লি প্রবাস জীবনের শেষ কটি দিন ফুরিয়ে এল। এইবার ফিরে যাব কলকাতায়। যাবার আগে একবার কাশ্মীর ঘুরে যাব। কী জানি, হয়তো এমুলুকে জীবনে আর নাও আসতে পারি। আর তাছাড়া, কাশ্মীরের বড় আকর্ষণ কায়েদরা! মনে পড়ল, জিন্নতের সেই করুণ মিনতি।

অফিসের বন্ধু-বান্ধবের কাছে বিদায় নিয়ে, মালপত্তর সব রামনগরে প্রভাতবাবুর বাড়িতে তুললুম। ফ্ল্যাট ছেড়ে দিলুম। কাশ্মির থেকে ফেরবার পথে আর একবার দিল্লি হয়ে যাবো, তখন মালপত্তর নিয়ে যাবো।

ট্রেনে এলুম রাওয়ালপিণ্ডি। তখন অবিভক্ত ভারতবর্ষ। রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে মোটরে "ঝিলাম ভ্যালি রোড" ধরে কাশ্মীর যাওয়া সহজ ছিল। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ১৯৬ মাইল, পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে চমৎকার রাস্তা। রাত্রে আশ্রয় নিলুম এক পার্বত্য ডাকবাংলোয়। পরদিন সকালে

আবার যাত্রা সুরু করে দুপুর বেলা শ্রীনগর পৌঁছুলাম। উঠলুম শ্রীনগর খালসা হোটেলে। শ্রীনগর শহরকে মালার মত বেষ্টন করে আছে ঝিলাম নদী। ঝিলামের বুকে অসংখ্য হাউজ-বোট। ঝিলাম পারাপারের সাতটি পুল (১) আমিরা কদল (২) হাব্বা কদল (৩) ফতে কদল (৪) জৈনা কদল (৫) আলি কদল (৬) নওয়া কদল ও (৭) সাফা কদল। অনেকে বলেন, শ্রীনগর সুইজার ল্যাণ্ডের চেয়েও প্রাকৃতিক শোভায় মনোরম। সুইজারল্যাণ্ড দেখিনি ; তবে চারদিকে সুউচ্চ পর্বত বেষ্টিত এই নদী, হ্রদ নির্ঝর শোভিত অপরূপ পুষ্পিত উপত্যকার ভূস্বর্গ খ্যাতি একটুও অত্যুক্তি নয়। পথের দু'পাশে পপলার ও চেনার গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দীর্ঘ ছায়া পড়ে ঝিলামের বুকে, ডাল আর উলুর হ্রদের স্ফটিক স্বচ্ছ জলে। ফলন্ত আপেল নাশপাতির বন আর জাফরান ক্ষেত থেকে হাওয়ায় ভেসে আসে একটা মিষ্টি মদির গন্ধ। কেমন নেশা লেগে যায়। পাহাড়ের চূড়ায় সন্ধ্যার সোনা ছড়িয়ে সূর্য ডুবে যায় পশ্চিমে ফার ও দেওদারের ঘন জঙ্গলের আড়ালে। শঙ্করাচার্য পাহাড়ের আড়ালে উঁকি দেয় রূপোলী চাঁদ। যেন স্বর্গ গঙ্গার ধারা নামে শঙ্করাচার্য পাহাড়ের শিবলিঙ্গকে স্নান করাতে। দুধের মত রূপালী আলো ছড়িয়ে পড়ে পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবক নম্রা হিমালয় নন্দিনীর কপোলে গ্রীবায় সর্বাঙ্গে। ভূস্বর্গ যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ক'দিন ধরে কায়েদরার খোঁজ কচ্ছি। দু'তিনজন বোট-হাউজ-এর মালিককে জিজ্ঞাসা করলুম। তারা বলতে পারল না। ঝিলাম, চেনার নালা আর ডাল হ্রদের তীরে তীরে অসংখ্য বোট-হাউজ—কে খবর রাখে অখ্যাত অজ্ঞাত কায়েদরার ? নদীর ধারে বেড়াবার সময় বোট-হাউজ গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে পথ চলি। জিন্নতের ভাই সে ; মুখের খানিকটা আদল্ নিশ্চয়ই আসবে। দেখলে চিন্‌তে পারব নাকি ? সেদিন বিকেল বেলা ঝিলামের তীরে বেড়াবার সময় দুনম্বর পুলের কাছাকাছি এসে থম্‌কে দাঁড়ালুম। বোট-হাউজের খোলা জানালায় বসে এক বাঙালী তরুণী। মাথা

নিচু করে কি একখানা বই পড়ছে। মুখখানা ভাল করে দেখতে পেলুম না। জানালার কাছে আড়াআড়ি বসেছে। প্রোফাইল মূর্তি। তবু বারবার মনে হল এ মুখ যেন কোথায় দেখেছি। বেশীক্ষণ এভাবে তাকিয়ে থাকা উচিত নয়, অন্যমনস্ক ভাবে সরে পড়লুম। না, মনে পড়ছে না কোথায় দেখেছি।

পরদিন বিকেল বেলা আবার সেই বোট-হাউসের কাছে গেলুম। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করলুম—মেয়েটির দেখা নেই। হঠাৎ গাঢ় লাল রঙের শাড়ীর আচল জানালার ধারে উড়তে লাগল। কৃষ্ণচূড়ার মত লাল শাড়ী। বোট-হাউসের ভেতর দিকে তাকালুম, মেয়েটি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে। কালো ফিতের একটি প্রান্ত দাঁতে চেপে ধরেছে। ঘাড়ের পেছন দিকে দুটি পল্লবিত বাহু বিদ্যুত লতার মত খেলা কচ্ছে মেঘ কালো কেশজালে। প্রসাধন শেষ করে আচমকা সে আমার পানে তাকাল! বুঝি বিরক্তিতে ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। জানালা থেকে সরে যেতেই আমার কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল। ছিঃ ছিঃ—কী অন্যায় করেছি! অপরিচিতা তরুণীর পানে কি রকম অভদ্রের মত তাকিয়ে ছিলুম। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়লুম সেখান থেকে।

কিন্তু যত চেষ্টা করি—মেয়েটির চিন্তা যেন ততই আমার মনকে পেয়ে বসে! কোথায় দেখেছি ওকে! কবে দেখেছি! কে ও! সেই এক পলক চোখে চোখ পড়েছিল—মনে হল ও চাউনি যেন আমার বড় চেনা। ভেবে কোনো কূল কিনারা করে উঠতে পারিনা। রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ হলে দোতালার ঘরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি। ঝিলামের দিককার জানালা খুলে দিই। বোট-হাউসগুলির বৈদ্যুতিক আলোর মালা ঝিলামের অতি মৃদু তরঙ্গের ওপর দুলে দুলে খেলা করে। এক দৃষ্টে তাকিয়ে মনে হয় ঝিলামের বুকে যেন আগুন লেগেছে। কৃষ্ণচূড়া রঙের শাড়ীর আগুন।

তৃতীয় দিনও ঐ পথ ধরে চললুম। বোট-হাউসটির দিকে না তাকলেই হল। পথ তো কারুর একার নয়। পথে চলতে

আপত্তি কি! নির্দিষ্ট স্থানটি অতিক্রম করবার সময় একবার আড় চোখে দেখে নিলুম—আজ সে নিজেই আগে থেকে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে! কী আশ্চর্য! শাস্ত্র বলেছে, ওদের হদিস্ দেবতারাই পান না, আমরা তো মানুষ। শাস্ত্রকারকে মনে মনে বাহবা দিয়ে আর কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গেলুম পথ ধরে। কিন্তু স্পষ্ট মনে হল এক জোড়া কালো চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি পেছন দিক থেকে বরাবর আমায় অনুসরণ কচ্ছে।

চতুর্থ দিনে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। বোট-হাউসটির সামনে এসে দাঁড়াতেই একটি বলিষ্ঠ সবল বাহু আমার কাঁধ স্পর্শ করল। চমকে ফিরে তাকালুম। এক প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোক। বয়স পঞ্চাশোর্ধ হবে, মাথাব দু'পাশের চুল শাদা হয়ে গেছে, কিন্তু যৌবনের অটুট স্বাস্থ্য এখনো দেহকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেনি। বোধ হয় কিছু সওদা করতে বেরিয়েছিলেন। ইশারায় কুলীকে মালপত্তর নিয়ে বোট-হাউসে চলে যেতে আদেশ দিয়ে আমার দিকে ফিরলেন। আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। সবিনয়ে নামটি বললুম।

—তোমার দেশ কোথায়? মানে জন্মস্থান—ছেলেবেলায় যেখানে কাটিয়েছ?

ভদ্রলোকের চোখে সন্ধানী দৃষ্টি। খানিকটা আমতা আমতা করে বললুম:

—আজ্ঞে, দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর। তবে—

ভদ্রলোক আমার কথায় বাধা দিয়ে বললেন:

—আর তবের দরকার নেই। আমিও এককালে পুলিশের লোক ছিলুম। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। ঠিক চিনে ফেলেছি—তুমিই সেই গুণ্ডা।

গুণ্ডা! সর্বনাশ! বলে কী? ঐ বোট-হাউসের তরুণীর মুখে আমার গতিবিধির খবর নিয়ে ভদ্দর লোক আমায় একটি গুণ্ডা বলে সাব্যস্ত করেছেন! অ্যারেস্ট করবার ভঙ্গিমায় আমার হাতের কব্জী ধরে টেনে বোট-হাউসের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন:

—এসো আমার সঙ্গে।

জীবনে এমন বিপন্ন কখনো হইনি! একটি তরুণীর প্রতি কুদৃষ্টি দিয়েছি এই অভিযোগে শেষে গ্রেপ্তার হতে হল! ছিঃ ছিঃ, এর চেয়ে দাঙ্গাবাজী করে ধরা পড়াও যে ঢের গৌরবের! ভদ্রলোককে বোঝাতে চাইলুম যে আমার মনে কোনো কুমতলব ছিল না। কথা বলতে গেলুম, গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, জিভটা ছোট হয়ে কুঁচকে গলার মধ্যে ঢুকে যেতে চাইছে।

তিনি আমায় বোট-হাউসে নিয়ে গিয়ে নিজে একটি সোফায় বসে আর একটি সোফা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ইশারায় বসতে বললেন। যন্ত্র-চালিতের মত আজ্ঞা পালন করলুম। এইবার ভেতরের দরজার দিকে লক্ষ্য করে উদ্দেশ্যে হাঁক দিলেন :

—খুকি, এদিকে এসো। গুণ্ডাকে ধরেছি!

ইচ্ছে হল ভদ্রলোককে বলি, যদি আপনার দু'চার ঘা দেবার বাসনা থাকে তাই দিয়ে এই বেলা বরং ছেড়ে দিন,—মেয়েছেলের সামনে আর নাকাল করবেন না। মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়ালুম, সঙ্গে সঙ্গে পর্দার ওপাশে নরম পায়ের আওয়াজ। অভিযোগকারিণী এসে গেছেন! পরম নৈরাশ্যে সোফার ওপর আবার বসে পড়লুম, লজ্জায় মাথাটা একেবারে নুয়ে পড়ল। না দেখেও বুঝলুম—অভিযোগকারিণী আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—ছাখো, ঠিক লোককে গ্রেপ্তার করেছি কিনা? সেই গুণ্ডাই তো?

মৃদুকণ্ঠে জবাব এল : শুধু গুণ্ডা বলছ কেন বাবা? উনি সাধুও বটেন!

—সাধু?

—হাঁ, ফরিদপুরের গুণ্ডা। কিন্তু চট্টগ্রামের সাধু! ভদ্রলোক এইবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। আমিও চমকে উঠে তরুণীর মুখের পানে তাকালুম। কী আশ্চর্য! শমি! শর্মিষ্ঠা! এতকাল পরে!

আসল নামটি প্রকাশ করে আমার কিছুমাত্র লাভ নেই, উল্টে বরং তার হয়তো অনেকখানি ক্ষতি করে ফেলবো। না জেনে অজ্ঞাতসারে অনেক ক্ষতিই তার করেছি, জেনে শুনে এটুকু আর নাই বা করলুম। শমি বলেই পরিচয় দেব। শর্মিষ্ঠা, রায়বাহাদুর সেনের একমাত্র কন্যা শর্মিষ্ঠা সেন।

ফরিদপুরে খুব ছেলেবেলায় জেলখানার এক গার্ডের হাতে ধরা পড়েছিলুম গুণ্ডামীর অভিযোগে। শমিকে সেই প্রথম দেখি, পাঁচ বছরের ফুটফুটে মেয়েটি। শুনলুম জেলার সাহেবের মেয়ে। তারপর শমির সঙ্গে আবার দেখা হয় চট্টগ্রামে, আমি তখন ঘর পালানো কিশোর সন্ন্যাসী। ঝুলি কাঁধে ভিক্ষেয় বেরিয়েছি, আর দু'কাঁধে দুই বিনুনী দুলিয়ে শমি বেরিয়েছে খাতা বই হাতে খাস্তগীর গার্লস স্কুলের পথে। সে কথা আর একদিন বলব।

আজ এখনকার কথাই বলি।

সেদিনের সেই ফ্রকপরা ডবল-বেণী দোলান ইস্কুলের ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে তৃতীয়বার দেখা কাশ্মীরে বোট-হাউসে এই অপরূপ পরিস্থিতিতে। ওকে না চিনতে পারা কি আমার অপরাধ?

রায়বাহাদুর হাসতে হাসতে বললেন:

—খুকু তোমায় ঠিক চিনতে পেরেছিল। অবিশ্যি প্রথম একটু খটকা লেগেছিল। দ্বিতীয় দিন আর ভুল হয়নি। আমায় বললে··· বাবা, ও আর কেউ নয়। নিশ্চয় ছেলেবেলার সেই গুণ্ডা। তুমি একটু খবর করো না। কতকাল পরে! দেখতে ইচ্ছে করে। রায়বাহাদুর শমির পানে তাকালেন, আমার চোখও তাঁর দৃষ্টিকে অনুসরণ করল। শমির গালে লাল আভা। বড় বড় চুনির দুলের লাল রঙ লেগেছে গালে! না, হীরের দুল জোড়া চুনির মত লাল মনে হচ্ছে গালের রক্তিমায়! ঠিক বুঝতে পারলুম না। হাল্কা পায়ে শমি সে ঘর থেকে সরে গেল। আমিও তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলুম। রায়বাহাদুর বলতে লাগলেন তাঁর জীবনের কাহিনী। জেলার-এর পদ থেকে শেষ পর্যন্ত পুলিশ বিভাগের একজন হর্তা-

কর্তার আসন পেয়েছিলেন। তিন বছর আগে শমির মা দেহ-রক্ষা করেন এলাহাবাদে। রায়বাহাদুর তার পরেই চাকরীতে অবসর নিলেন। এলাহাবাদে বাড়ী করেছেন। সেইখানেই থাকেন।

শমি এসে আমাদের ভেতরের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। ডিসে করে আখরোট্, বাদাম, কিছু ফল সাজিয়ে দিয়েছে। নিজের হাতে চা তৈরী করতে লাগল আমাদের জন্য। ঘরটি আগাগোড়া সুন্দর ভাবে সাজানো। শুধু এঘর নয়, সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী লোকের যা কিছু প্রয়োজন. মায় বই শুদ্ধ লাইব্রেরী. ম্যাগাজিন, রেডিও—সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণে সজ্জিত থাকে কাশ্মীরের বোট-হাউসগুলি। এক কথায় বলতে গেলে বোট-হাউসকে বলা যায় জলের ওপর ভাসমান আধুনিক রুচি অনুযায়ী সাজানো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোট বাড়ী।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন :

—তোমার কথা তো কিছুই জিজ্ঞাসা করা হল না! কি কচ্ছ আজকাল ? এতকালের সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সামনে চাকরী ছেড়ে দিয়েছি কথাটা বলতে বাধল, বিশেষ করে যে উদ্দেশ্যে চাকরী ছেড়েছি, তা তাঁকে বুঝিয়ে বললেও বুঝতে পারবেন না। বরং নানারকম হিতোপদেশ দিয়ে এই স্মরণীয় গোধূলি লগ্নটিকে পরম গদ্যময় করে তুলবেন। তাই দিল্লির ওই অফিসে কাজ করছি বললুম। রায়বাহাদুর খুশী হলেন।

—চাকরী করতে করতে যখন একটু একঘেয়ে লাগবে, বেরিয়ে পড়বে দেশ ভ্রমণে। কত যে দেখবার যায়গা আছে দিল্লির আশে পাশে তার ইয়ত্তা নেই।

একটু থেমে আবার বললেন :

—আমরা এই দেড়মাস কাশ্মীরে আছি। খুব ভাল হত যদি আগে আসতে। বেশ এক সঙ্গে পরম আনন্দে কাটত।

আমার চায়ে চিনি মিশিয়ে শমি এইবার পাশের চেয়ারে বসল। আমি রায়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলুম :

—আছেন তো আরও কিছুদিন ?

—না, এই হপ্তাতেই চলে যাবো ওয়ালটেয়ার। খুকুর মাসীমা চিঠি দিয়েছেন সেখানে যেতে। আর তাছাড়া খুকুর কলেজ খুলে গেল।' কামাই হচ্ছে।

—কি পড়ছে এখন ?

—চুপ করে কেন খুকু, বল ?

শমি লজ্জিত হয়ে অপ্রতিভের মত জবাব দিল :

—ফোর্থ ইয়ার আর্টস্!

—এলাহাবাদে ?

ছোট্ট জবাব এল : হুঁ।

নিঃশব্দে চা খেতে লাগলুম। চা খাওয়া শেষ হলে হঠাৎ রায়বাহাদুর উৎসাহের সঙ্গে একটু চেঁচিয়ে বললেন :

—দি আইডিয়া! খুকু, ওকে আমাদের সঙ্গে কাল প্যাহাল-গাম দেখতে নিয়ে গেলে কেমন হয় রে ?

শমির জবাবের অপেক্ষা না করেই আমার দিকে ফিরে বললেন :

—কি বল, যাবে আমাদের সঙ্গে ?

শমিও চোখ তুলে তাকাল আমার মুখের পানে। এতক্ষণের মধ্যে সে এই প্রথম আমার দিকে সোজা তাকাল। সে দৃষ্টিকে উপেক্ষা করতে পারলুম না। বললুম : যাবো।

প্যাহালগাম। শ্রীনগর হতে ৬০ মাইল দূরের রাস্তা। ৭২০০ ফিট উঁচুতে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলা নিকেতন প্যাহালগাম। সকালবেলা মোটরে রওনা হলুম। এ পর্যন্ত চমৎকার মোটর রোড আছে। তুষারতীর্থ অমরনাথের যাত্রীদের আসতে হয় এই পথে। প্যাহালগামের পর আর মোটর চলে না। কেউ বরফের ওপর হাটবার উপযুক্ত ঘাসের জুতো পরে পায়ে হেঁটে যান, কেউ যোগাড় করেন শিক্ষিত পনী, ডাণ্ডী, ঝাম্পান প্রভৃতি। শ্রীনগর ছেড়ে এসে অনন্তনাগে আমরা বেশ কিছুটা সময় ছিলুম। এখানে

অনেকগুলি উৎস। তার মধ্যে একটি গন্ধক মিশ্রিত জলে পরিপূর্ণ, আর একটির জল অত্যন্ত সুস্বাদু। বহুলোকের বিশ্বাস যে এই সুস্বাদু জলের উৎসটি ঝিলাম নদীর মূল-প্রস্রবণ। বাজারে নানারকম কাশ্মীরী শিল্পদ্রব্যের সমাবেশ। আখরোট কাঠের ওপর চমৎকার সূক্ষ্ম কাজের নমুনা দেখে শমির দু'চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিছু সওদা করলুম আমরা। রায়বাহাদুর তাড়া দিলেন—দেরী হয়ে যাচ্ছে। মোটরে উঠলুম তাড়াতাড়ি। মার্তন জলধারার কাছে আবার থামতে হল। এখানে স্নান করে তীর্থ যাত্রীর দল শ্রাদ্ধাদি করেন। পাণ্ডার দল ঘিরে ধরল আমাদের। কিছু না করি, অন্তত: খাতায় নাম ক'টি লিখে দিয়ে যাবার ব্যাকুল অনুরোধ। বহু বাঙালী বাবুর নাম ঠিকানা আছে তাদের কাছে। বাধ্য হয়ে নাম লিখতে হল, আর দিতে হল কিছু দক্ষিণা। ওখান থেকে দেড় মাইল উঁচুতে মার্তণ্ড মন্দির বা সূর্য মন্দির। চুরাশিটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য নির্মিত খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের এই পবিত্র মন্দির জীর্ণ অবস্থায়। মন্দিরে যাবার সময় হল না। দূর থেকে সূর্য প্রণাম শেষ করে সোজা রওনা হলুম গন্তব্য স্থান প্যাহালগাম। পৌঁছুতে প্রায় বেলা গড়িয়ে এল। এখানে খালসা হোটেলের একটি ব্রাঞ্চ আছে। সেই হোটেলেই আমরা দু'খানি ঘর পেলুম। একটি রায়বাহাদুর আর শমির জন্য, আর একটি আমার নিজের জন্য।

প্যাহালগামে আসবার পথেই বেশ শীত কচ্ছিল। পৌঁছে কন্‌কনে শীতে কাঁপতে লাগলুম। শ্রীনগরে রাত্রে শুধু একখানি কম্বল চাপা দিয়ে দিব্যি ঘুম হত; এখানে রাত নামল যেন বরফের চাপ সঙ্গে করে। গরম জামা কাপড় পরে তিনখানা ভারী কম্বল গায়ে চাপিয়েছি, তবু মনে হয় কে যেন হাড়ের ভেতরটা ঠাণ্ডা করাত দিয়ে চিরে দিচ্ছে। সারারাত ঘুম হল না শীতে, আর সেই সঙ্গে কানের কাছে যেন হাজার দানবের গর্জন। কোলাহি হিম প্রবাহের ধারা আর শেষনাগের ধারা প্যাহালগামে এসে এক সঙ্গে মিলেছে। সেই

উন্মাদ প্রবাহের গর্জনে ঘুমন্ত পাহাড়পুরী গম্ গম্ করে কেঁপে ওঠে। পাহাড়ের ঘুম টুটে যায়।

সকালে উঠতে একটু বেলা হল। হাত মুখ ধুয়ে ওঘরে গিয়ে দেখি রায়বাহাদুর তখনও শুয়ে আছেন। শরীরটা সুস্থ নেই। ঠাণ্ডা লেগে গলা খুস্‌খুস্ কচ্ছে। আমায় বললেন হাসতে হাসতে ঃ

—দেখ, স্বাস্থ্যের বড়াই করি আর যাই করি, এতখানি বয়স তো হোলো! মহাকাল ভেতরে ভেতরে তার কাজ ঠিকই করে যাচ্ছেন। এখন আর আগের মত সব কিছু সহ্য করতে পারি না।

চিন্তিত হয়ে পড়লুম।—শরীরটা কি খুবই খারাপ লাগছে?

রায়বাহাদুর হেসে উড়িয়ে দিলেন আমার কথা।

—না, না, কিছু না, সামান্য সর্দি কাসি একটু। খুকু অল্পতে নার্ভাস হয়। তাই এখানকার হাসপাতালের ডাক্তারকে ডাকতে গেছে।

আমি লজ্জিত হয়ে পড়লুম। এত খবর কিছুই রাখিনি!

—শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই উঠতে দেরী হয়ে গেল। আমায় যদি একবার ডেকে তুলতেন—

রায়বাহাদুর আমায় কুণ্ঠিত হতে দেখে আবার হেসে উঠলেন ঃ

—ইয়ং ম্যান, আই অ্যাম কোয়াইট ফিট্। এতক্ষণ উঠে বেড়াতে যেতুম। খুকুর খবরদারীতেই শুয়ে আছি। ওর মা চলে যাবার পর ও আমার শরীর একটু বেজুত দেখলেই মুশড়ে পড়ে। ভয় পায়, আমিও বুঝি ওকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাই।

শূন্য উদাস দৃষ্টি রায়বাহাদুরের। চোখের কোলে একটু জলের রেখা। শমি ডাক্তার নিয়ে এল। রায়বাহাদুর তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ডাক্তারকে সম্বর্ধনা করলেন। ডাক্তারটি একজন বৃদ্ধ পাঞ্জাবী, ওখানকার হাসপাতালে বেশ কিছুদিন আছেন। ভালো করে পরীক্ষা করে তিনিও বললেন—কিছু না, ঠাণ্ডা লেগে সামান্য সর্দি কাশি। প্রেসক্রিপশন একটা করে দিয়ে গেলেন। আমি হস্‌পিটাল থেকে ওষুধ নিয়ে এলুম।

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর রায়বাহাদুর ইজিচেয়ারের ওপর খান দুই কম্বল চাপা দিয়ে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। শমি তাঁর পায়ে গরম মোজা পরিয়ে দিল, গলার মাফলারটা বেশ ভাল করে জড়িয়ে দিয়ে একখানা চেয়ার টেনে পাশে বসছিল, রায়বাহাদুর বাধা দিলেন ঃ

—কি করছ খুকু ? বললুম না—আমার জন্য ঘরের কোণে বসে থাকতে হবে না। যাও, বেড়িয়ে এস তোমরা।

শমি আদুরে মেয়ের মত রায়বাহাদুরের মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুলের ভেতর আঙ্গুল চালিয়ে খেলা করতে করতে বলল ঃ

—বেড়াতে ইচ্ছে কচ্ছে না বাবা !

রায়বাহাদুর মাথাটা সরিয়ে নিলেন ঃ

—বেড়াতে ইচ্ছে কচ্ছে না ! না, আমায় একা রেখে যেতে ইচ্ছে কচ্ছে না ?

শমি চুপ করে থাকল। রায়বাহাদুর এবার খানিকটা আদেশের সুরেই বললেন ঃ

—শোনো, আমি বুঝেছি, আমার শরীরের জন্য তোমার মন খারাপ হয়েছে। কাল সকালেই আমরা ফিরে যাচ্ছি। আজকের দিনটা যা দেখবার দেখে নাও। ওঠো—

শমি এবার আর প্রতিবাদ করতে পারলো না। ঘরে ঢুকে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

দুজনে পাশাপাশি চলেছি। কারু মুখে কথা নেই। শমি আজ যেন কেমন অন্যমনস্ক ! রায়বাহাদুরের শরীরের জন্য কী ? তিনি তো ভালই আছেন ! তবে ?

খানিকটা দূরে এগিয়ে চোখে পড়ল পাইন ও ফার গাছে বেষ্টিত একটি চমৎকার উপত্যকা। জিজ্ঞাসা করলুম ঃ যাবে ওখানে ?

শমি রাজী হল। এইবার উঁচু নিচু পথ চলেছি। ওর চুল হাওয়ায় উড়ে এসে লাগছে আমার গায়ে। কখনো পাচ্ছি ওর উষ্ণ নিঃশ্বাসের সুরভি।...পাহাড়ের কোলে সবুজ ঘাসে ঢাকা চমৎকার

উপত্যকা। কারা সব দু'চারটে তাঁবু ফেলেছেন এখানে। পাইন গাছের গা ঘেসে মখমলের মত নরম ঘাসের ওপর বসলুম পাশাপাশি।...ওধারে বয়ে যাচ্ছে শেষনাগ আর কোলাহি হিমপ্রবাহের মিলিত ধারা। দুটি জীবন ধারা যেন কত বাধা বন্ধ অতিক্রম করে এক সঙ্গে মিলেছে। দুর্মদ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে অনির্দেশ্যের পানে। সেই দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম দু'জনে। সহসা শমির কথায় আমার চমক ভাঙল :

—আচ্ছা, বলুন তো, কবিগুরুর কোন কাব্য আপনার বেশী ভাল লাগে!

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? একটু ভেবে নিয়ে বললুম :

—সামনে আমাদের তুষারমৌলী হিমালয়। এই পাহাড়ের পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। এই ধ্যান-গম্ভীর রূপ অনুভূতিতে আনবার চেষ্টা করি—কথায় বোঝাতে পারি না। কবিগুরু সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য।

শমি প্রতিবাদ করে বলল :

—ও হচ্ছে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া। ভগবানও তো অনন্ত, অনাদি স্বরূপ। কিন্তু তা বলে কি আমরা তাঁকে নিয়ে আলোচনা করি না?...তিনি কখন খৃষ্ট, কখন মহম্মদ, কখন বুদ্ধ। কখনও বা তিনি অসুরনাশিনী চণ্ডিকা, কখনো বা বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ, আবার কখনও বা রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ শ্রীচৈতন্য। ভগবানের কোন্ মূর্তিটি আপনার ভালো লাগে আপনি তা বলবেন না বুঝি?

বুঝলুম কঠিন হাতে পড়েছি। একে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। জবাব দিলুম :

—আমার ব্যক্তিগত পছন্দের কথা যদি বল, তাহলে আমার ভালো লাগে বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথকে।

শমির মুখে বিস্ময়!

—বর্ষার কবি কে?

আমি বললুম : সুজলা, সুফলা, শ্যামা আমাদের বাংলা দেশ। বর্ষার

রূপটিই বাংলার আসল রূপ। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বৈষ্ণব কবি বর্ষাভিসারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথ হলেন বঙ্গ সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক। বর্ষার রমঝম্ ধারায় তাঁর পূর্ণ প্রকাশ।

শমি মাথা নেড়ে বলল ঃ

—আমার মত কিন্তু তা নয়। আমার সব চেয়ে ভালো লাগে বলাকা!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ কেন?

শমি বললে ঃ

—বলাকায় রয়েছে গতি, রয়েছে লোক লোকান্তরে চলবার আনন্দ।

"পর্বত চাহিল হোতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরু শ্রেণী চাহে, পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দ রেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।"

এই গতি বেগ, এই চলবার আনন্দ, দূরে—অনেক দূরে—"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনো খানে"...এ আনন্দের কী তুলনা আছে!

নদী ছুটে চলেছে প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে। শমি সেই দিকে তাকাল।

আমি বললুম ঃ

—কিন্তু গতির সঙ্গে শুধু আনন্দ নয়, ভয় আছে। উৎকণ্ঠাও আছে যে!

শমি বলল ঃ

—থাকবেই তো। আনন্দের বাহন-ই তো হল আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠা। ও দুটি বাদে আনন্দ অচল। ভয় আর উৎকণ্ঠাকে বাদ দিয়ে সুখ হয়—আরাম হয়—কিন্তু আনন্দ হয় না।

ওর চাউনী দেখে মনে হল "ঝঞ্ঝা মদ রসে মত্ত" দুটি পাখা মেলে দিয়ে ও যেন হংসবলাকার মত উড়ে যেতে চায় দূর শূন্য লোকে!

সেদিন সেই পড়ন্ত বেলায় কোলাহী আর শেষনাগের মিলিত ধারার সামনে বসে এই আশঙ্কাটিই বারবার মনে জেগেছিল— শমির জীবন পথে উঠবে অনেক ঝড়। এগিয়ে যেতে হবে ওকে রক্তাক্ত ডানার ঝাপটে সেই ঝঞ্ঝার সঙ্গে আজীবন সংগ্রাম করে। কি রকম যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। বললুম ঃ

—শমি, এবার হোটেলে ফিরে চল।

শমির চমক ভাঙ্গল। উঠে দাঁড়াল ফিরে যাবার জন্য।

পরদিন প্যাহালগাম থেকে ফিরে এসে ওরা দুটো দিন শ্রীনগরে ছিল। তারপর রায়বাহাদুর শমিকে নিয়ে রওনা হলেন ওয়ালটেয়ার —শমির মাসীমার বাড়ীতে। যাবার সময় ওদের এলাহাবাদের ঠিকানা দিয়ে রায়বাহাদুর আমায় চিঠি লিখতে অনুরোধ করলেন। আমি জানালুম, লিখব। আমার ঠিকানা দিলুম না। দিল্লি থেকে বদলী হয়ে যাচ্ছি কলকাতায়। কলকাতা পৌঁছে ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দেব বললুম। যাবার সময় ম্লান হেসে শমি একটিবার আমার মুখের পানে তাকাল। তারপর গাড়ীতে উঠল। সে হাসির অর্থ কি বুঝতে পারলুম না। মোটর স্টার্ট নিচ্ছে না। দু'তিনবার চেষ্টা করবার পর ঘোর গর্জন করে খানিকটা ধোঁয়া ছাড়ল—তারপর তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল আমার চোখের আড়ালে। সেই দিকে তাকিয়ে মনে হল—

"শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
উদ্দাম উধাও,
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লওনা কিছু করোনা সঞ্চয়,
নাই শোক নাই ভয়,
পথের আনন্দ বেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।"

শর্মিষ্ঠা চলে গেলে কায়েদরার খোঁজ খবর নিতে আবার উঠে

পড়ে লাগলুম। যেমন করে হোক ওকে খুঁজে বার করতে হবে। শেষে দেখা পেলুম, চেনারনালার এক প্রান্তে একটি মাঝারি ধরনের বোট-হাউসে। ২১।২২ বছরের তরুণ যুবক—মাথায় একটু খাটো, কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ গড়ন। আমি জিন্নতের খবর নিয়ে আসছি শুনে প্রথমটা আমার মুখের পানে খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কিছুই যেন বুঝতে পারে নি। তারপর এক সময় চমকে উঠল। আমায় তার বোট-হাউসে ডেকে নিয়ে গেল। সামনের ছোট কামরাটিতে আমায় বসিয়ে রেখে ব্যস্ত ভাবে চলে গেল বোট-হাউস সংলগ্ন তাদের নিজেদের থাকবার নৌকোয়। যে কামরায় আমায় বসিয়ে রেখে গেল সেখানে আর কেউ নেই—অর্ধেকটা খোলা পর্দার আড়ালে তাকিয়ে দেখলুম পাশের কামরাটিও জনশূন্য। বোধ হয় এখন এ বোট-হাউস সম্পূর্ণ খালি আছে। আলোচনার কোনো অসুবিধা হবে না।···কায়েদরা ফিরে এল, সঙ্গে তার আঠারো উনিশ বছরের এক কাশ্মীরী তরুণী। বুঝলুম এই জুবেদা। কায়েদরা আমার পায়ের কাছে মেঝেতে বসে পড়ল। জুবেদা দাঁড়িয়ে রইল তার পেছনে বোট-হাউসের দরজার পাশটিতে। ···আমি একটু ইতঃস্তত করে আরম্ভ করলুম জিন্নতের করুণ জীবন কাহিনী। কাশ্মীর ছেড়ে যাবার পর লক্ষ্ণৌ-এর ঘটনা পর্যন্ত যেটুকু শুনেছিলুম জিন্নতের মুখে···সব যথাযথ বললুম। শুধু আস্‌লাম খাঁর সত্য পরিচয় দিতে পারলুম না। দুষ্ট ক্ষত রোগগ্রস্ত এক বর্বর জানোয়ার তার থাবার তীক্ষ্ণ নখর বিঁধিয়ে আঁকড়ে ধরেছে জিন্নতের পুষ্প পেলব দেহ—জিন্নতের পরমাত্মীয় পরম-উৎকণ্ঠিত এই দুটি শ্রোতার সামনে এই সত্য কথাটি বলতে গিয়ে মনে হল এতবড় হৃদয়হীনতার কাজ বুঝি আর কিছু নেই। বললুম, সুপুরুষ তরুণ পেশোয়ারী আস্‌লাম খাঁ, সংবেদনশীল তার অন্তর, জিন্নতকে সে সুখে রেখেছে। অতীত জীবনের আঘাত ভুলিয়ে জিন্নতকে সুখী করে তুলতে তার চেষ্টার অন্ত নেই।

আমার শ্রোতা দুটি এই মিথ্যা আশ্বাসে সান্ত্বনা পেল কিনা

জানিনা। অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে থাকল। তারপর কায়েদরা এক সময় দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে অবোলা জীবের মত অস্ফুট আওয়াজ করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ঝড় উঠেছে—সেই ঝড়ের বেগকে চেপে রাখতে গিয়ে সমস্ত দেহটা দুলে দুলে উঠছে। এ কান্না কাউকে শোনাবার জো নেই। দুই হাতে মুখ চেপে ধরে কান্নাকে থামিয়ে দিতে চায়, ওঠে একটা অস্পষ্ট গোঙানী। জুবেদার পানে চোখ তুলে তাকালুম—কপাটের আড়ালে সে মুখ লুকিয়েছে। ঝিলামের বুক থেকে হাওয়া এসে ঘাসের মত নাড়া দিচ্ছে জুবেদার রুক্ষ চুলে। সেই হাওয়ার শব্দ অথবা একটা করুণ বোবা কান্নার একটানা আওয়াজ আসছে ঐদিক থেকে।

কায়েদরা হঠাৎ এক সময় মাথা তুলে পাগলের মত চীৎকার করে উঠল—

—ঝুট্‌বাৎ! ঝুটবাৎ! বাবুজি, তুমি ঝুট্‌বাৎ বলছ। জিন্নৎ সুখে নেই—তার দিল ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে। আর যদি সে সুখে থাকে—তাহলে তার দিল্ বলে কোনো বস্তু নেই, পাত্থর, পাত্থর, বিলকুল পাত্থর।

—কভি নেহি।···বিদ্যুৎবেগে জুবেদা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠে বলল ঃ

—আমি তার ব্যহিন্, আমি তাকে চিনি না? পাত্থর নয়, ফুল। ডাল হ্রদের পদ্মের মত নরম তার দিল। সেই পদ্মের পাঁপড়ি ছিঁড়ে দিয়ে গেছে সেই লোকটা! ব্যহিন্ আমার কেঁদে কেঁদে ফিরছে, লক্ষ্ণৌ, দেহলি, কোয়েটা, কান্দাহার, দুনিয়ার তামাম্ মুলুক।

···বড় বড় জলের ফোঁটা নিঃসাড়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল জুবেদার চোখ ভাসিয়ে গালের ওপর দিয়ে।

কী জবাব দেব—খুঁজে পাই না। চুপ করে বসে রইলাম। কখন অলক্ষ্যে আমারও দুটি চোখ জলে ভরে এল। মনে হয় আসন্ন সন্ধ্যার স্বল্পালোকে আমরা এই তিনটি প্রাণী যেন সমস্ত জগত হতে

স্বতন্ত্র হয়ে একটি বেদনা পরিম্লান পরিবেশে এক হয়ে গেছি। তিনটি হৃদয়ের উৎস হতে ঝরা অশ্রুজলের মুকুরে বার বার ভেসে উঠছে এক সকরুণ শাশ্বত কালের বিরহিনী নারী মূর্তি।

পরদিন সকালবেলা কায়েদরা নিজে গিয়ে তদারক করে আমার মালপত্তর সব বোট্-হাউসে নিয়ে এল। সে আমায় কিছুতেই হোটেলে থাকতে দেবে না। বিশেষ করে তার বোট-হাউস যখন খালিই রয়েছে। প্রতিবাদ করতে পারলুম না—উঠলুম তার বোট-হাউসে। ঢুটি ভাই বোনের সেবা যত্ন আমি জীবনে ভুলব না। ঘর পরিষ্কার করা, আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, আহার্য পরিবেশন করা প্রতিটি কার্যের মধ্যে অনাড়ম্বর আন্তরিকতার স্পর্শ! জিন্নতের খবর নিয়ে এসেছি বলে আমি যেন তাদের পরমাত্মীয় হয়ে গেছি।

পাঁচদিন ছিলুম তাদের বোট-হাউস এ। চলে আসবার দিন বোট-হাউসের ভাড়া বাবদ কিছু টাকা কায়েদরাকে দিতে গেলুম। সে সবেগে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল; কিছুতেই সে টাকা নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে। বোট-হাউসের দরিদ্র মাঝি কায়েদরা! আমার জন্য সে ভাড়াটে ছেড়ে দিয়েছে। তার এতবড় লোকসান্ আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না। বললুম, টাকা তাকে নিতেই হবে। তার হাতের মুঠোয় নোট ক'খানা গুঁজে দিতে সে একটু চুপ করে কি ভাবল। তারপর বলল:

—বাবুজি, টাকা আমি নিলুম। ও টাকা আমারই হল। তবে ওটা এখন তোমার কাছে জমা থাক্।

তার কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না। জিজ্ঞাসু চোখে তাকালুম মুখের পানে। সে আস্তে আস্তে বলল:

—আমার মন বলছে বাবুজি, জিন্নতের সঙ্গে তোমার হয়তো আবার দেখা হবে। যদি কোনো দিন দেখা হয় ঐ টাকাটা তুমি আমার নাম করে তাকে দিও। আর বোলো—কোন দিন সে যদি আমাদের কাছে ফিরে আসতে চায়—ঐ টাকাটা রইল তার পথের খরচ।

টাকাটা হাত বাড়িয়ে ফেরৎ নিতে হল। জুবেদা এসে কখন নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে কায়েদরার পাশে। টাকাটা স্যুটকেশে রেখে, স্যুটকেশ থেকে বার করলুম এক জোড়া সোনার ঝুমকো।

—দেশে আমার ব্যহিন আছে, অনেকদিন দেখিনি তাকে—তার জন্য কিছু সওদা করে নিয়ে যাচ্ছি। তা থেকে এই ঝুমকো জোড়া দিয়ে যেতে চাই আমার আর এক ছোট ব্যহিনকে—যাকে অনেক দিন দেখব না, এ জীবনে আর কোনোদিন দেখব কিনা তাও জানিনা।

জুবেদা অসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে ঝুমকো জোড়া আমার হাত থেকে তুলে নিল—আমার সামনেই কানে ছুলিয়ে দিল। কানে ঝুমকো দোলে, ছুই গালে জলের ফোঁটা দোলে। ঢিলে জামার আস্তিনে চোখ মোছে কায়েদরা। শ্রীনগর ছেড়ে আমার মোটরকার এগিয়ে চলে বানিহাল গিরিপথ ধরে জম্মুর দিকে। ট্যানেলের পর ট্যানেল পার হয়ে চলেছি। কী অন্ধকার! ভয়ে ছু-চোখ বুজে আসে! চোখ বুজে দেখতে পাই ঝিক্‌মিক আলোর রেখা! ছু'কানে ঝুমকো দোলে—গালে দোলে জলের ফোঁটা।

॥ চার ॥

কলকাতায় এসে উঠেছি একটি মেস্-এ। ওরিয়েণ্টাল হোম। বউ-বাজারে ফরডাইস্ লেনের মোড়ে। আসবার সময় মালপত্তর নিতে দিল্লিতে গিয়েছিলুম। প্রভাতবাবুর স্ত্রী খানিকটা কাঁদলেন। কাঁদাই স্বাভাবিক। অনেক দিন ওঁদের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করেছি। আপদে বিপদে পরস্পরের সঙ্গী হয়েছিলুম। প্রভাতবাবু ব্লেড দিয়ে একটা সিগারেটকে কেটে ছু'টুকরো করে মিতব্যয়িতা অভ্যাস করতেন। কেউ বাড়ীতে গেলে ঐ আধটুকরো সিগারেট এগিয়ে দিয়ে অভ্যর্থনা করতেন। আসবার দিন প্রভাতবাবু আমায় পুরো

একটি সিগারেট দিয়ে বললেন, নাউ ইউ আর গোয়িং টু বি এ গ্রেট ম্যান্! এ্যাণ্ড মাইসেলফ্ এ পেটি ক্লার্ক! পুরো সিগারেটটা আমার মুখে তুলে দিয়ে দেশলাই-এর কাঠি জ্বালালেন। সেই আলোয় প্রভাতবাবুর চোখ দুটোও চক্‌চক্ কচ্ছে মনে হয়েছিল।

কলকাতায় এসে নতুন জীবনের সূচনা। কৈশোরের স্বপ্ন—নাট্যজগতের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি। ভেতরে প্রবেশ করে যে ঘূর্ণাবর্তের ভেতর প্রায় সমস্ত জীবনটাই কাটিয়ে দিলুম সে উত্থান পতনের ইতিহাস, সে সংঘর্ষের নাটকীয় কাহিনী বলতে সুরু করলে আর অন্য কিছু বলতে পারব না। তাই কর্ম জীবনের কথা সুরু করবার আগে এই বেলা বলে রাখি—সেই অতীত পল্লী-জীবনের রূপকথা, কর্ম জীবনের রূঢ় বাস্তবতার মাঝখানে যে স্বপ্ন-জীবন ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মনে হলেও এই বাস্তবতার সূচনা হয়েছিল সেই স্বপ্ন-লোকেই, আমার জীবন প্রত্যূষে, অতি শৈশবকালে।

ফরিদপুর শহর থেকে আঠারো মাইল দূরে একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম, দুলালী, সেখানেই আমার জন্ম। আমার ঠাকুরদা মশাই ছিলেন দুলালীতে স্বনামধন্য কবিরাজ ৺নিবারণ গুপ্ত। শুধু ঠাকুরদা মশাই নন্, আমাদের গোটা বংশটাই হল সংস্কৃতে দিক্‌পাল পণ্ডিত কবিরাজের বংশ। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁদের অসাধারণ জ্ঞান, যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে শুধু নাড়ী ধরে রোগ নির্ণয়, মুমূর্ষুর মৃত্যু সময় নিখুঁত ভাবে বলে দেওয়া···বহু বিলেত ফেরত ডাক্তারকেও হতবাক্ করে দিয়েছে। গল্প শুনেছি, আমার ঠাকুরদা মশাইর এক জ্ঞাতি ভাই আনন্দ কবিরাজ মশাই, ষোল বছর বয়সে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যান সুদূর নেপালে। সেখানে গিয়ে দেখেন নেপাল রাজসভায় দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিত জনের সমাগম হয়েছে। ন্যায় শাস্ত্রের একটি বিষয় নিয়ে তাঁদের ভেতর তুমুল তর্ক হচ্ছিল, সাতদিনে মীমাংসা হয়নি। তখন সেই কিশোর বালক রাজসমীপে নিবেদন করলেন—

এ তর্কের মীমাংসা তিনি এখনি করে দিতে পারেন। প্রস্তাব শুনে ফিরে তাকালেন দিক্‌পাল পণ্ডিতগণ। কে মীমাংসা করবে? এই ষোল বছরের বালক!

অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠলেন পণ্ডিত সমাজ। কিন্তু সে হাসি মিলিয়ে গেল, আনন্দচন্দ্রের জলদ গম্ভীর স্বরে। তিনি বালক বলে তাঁকে এত অবজ্ঞা! গর্জন করে উঠলেন আনন্দচন্দ্র—

"যদাহং বালকানন্দ, তদা বালিকা সরস্বতী।" স্তব্ধ নির্বাক রাজসভা! রাজার ইঙ্গিতে বালক এগিয়ে গেলেন, অর্ধদণ্ড মধ্যে সমস্ত তর্কের এমন সুন্দর মীমাংসা করে দিলেন যে ভারতের দিকপাল পণ্ডিতগণ সেদিন মুগ্ধ-বিস্ময়ে সেই কিশোর বালকের বুদ্ধিদীপ্ত ললাটের পানে তাকিয়ে সমস্বরে বলেছিলেন:

—হ্যাঁ, বালকের ওই ভাস্বর ললাটে স্বয়ং ভারতী আশ্রয় নিয়েছেন। রাজা আনন্দচন্দ্রকে সভাপণ্ডিতের মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ মর্যাদা সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি ফিরে এসেছিলেন তাঁর জন্মভূমি দুলালী গ্রামে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে দুঃখী দেশবাসীর সেবার জন্য। সে যুগে বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর ছিল না, আত্ম-প্রচারের প্রচেষ্টাও ছিল না। ঠাকুরদা মশাইরা ছিলেন গ্রাম্য কবিরাজ। আটপৌরে ধুতি, চাদর ব্যবহার করতেন। ঐ পোষাকেই নৌকোয় করে গাঁয়ে গাঁয়ে রুগী দেখে বেড়াতেন। অথচ তাঁদের প্রত্যেকেরই ছিল সংস্কৃত শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি।

আমার বাবা ৺দেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত আমাদের বংশে প্রথম ইংরেজী শিক্ষা করেন। ল' পাশ করে ফরিদপুরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। শুনেছি উকীল হবার ইচ্ছা বাবার আদৌ ছিল না। ঠাকুরদা মশাইএর একান্ত জিদেই বাবা ওকালতী সুরু করেন। আইনের ধারা মুখস্থ করে জীবন যাত্রা সুরু করলেও জীবনে কোনদিন বাঁধা ধরা পথে তিনি চলেন নি। তিনি ছিলেন ষোল-আনা স্বপ্ন-বিলাসী। আদালতে চলেছেন, পথে বালক কবি জসীমউদ্দীনের সঙ্গে দেখা। জসীম চলেছেন ইস্কুলের পরীক্ষা দিতে।

বাবা ধরে নিয়ে গেলেন জসীমউদ্দিনকে পদ্মার চরে কাশবনের পাশে। ডিঙ্গি নৌকোয় বসে জসীমউদ্দিন বাঁশের বাঁশী বাজান, বাবা তন্ময় হয়ে শোনেন। কখন বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসে—কারু খেয়াল নেই সেদিকে। দুই অসমবয়সী বন্ধুর খামখেয়ালীতে ভেসে যায় জরুরী মামলার নথিপত্র, ইস্কুলের পরীক্ষার খাতা আর প্রশ্নপত্র।

আমার বয়স যখন নয় বছর, বাবা সেই সময় মারা যান, মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে। কাজেই বাবার স্মৃতি আমার কাছে খুব অস্পস্ট। পল্লী কবি জসীমউদ্দিনের মুখে শুনেছি, বাবার জীবিতকালে জসীমউদ্দিন বেশীর ভাগ সময় থাকতেন আমাদের বাড়ীতে, বাবার উৎসাহেই তাঁর কাব্য জীবনের সূচনা। ছুটিতে দুলালী যাবার সময়ও বাবা অনেক সময় জসীমউদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কাজুলীর বিলে নৌকা ভাসত, কালো জলে সন্ধ্যার লাল রঙ ছড়িয়ে পড়ত, যেন সিঁদুর মাখা কালীমূর্তি। তাল খেজুরের ডাল কাঁপিয়ে কখন ধেয়ে আসত শন্‌শন্ করে ঝোড়ো হাওয়া, ধেয়ে আসত কালো মেঘ, উড়ন্ত কালো চুলের গোছা। কালীর সিঁদুর চাপা পড়ত, ঝল্‌সে উঠত বিদ্যুতের খাঁড়া। কাজুলীর কালো জলে ফণা দুলিয়ে নাচত লক্ষ কোটি কালনাগিনী। সেই জীবন মৃত্যু দোলায় ডিঙ্গি নৌকায় বসে রুদ্র ভৈরবের গান গাইতেন তাঁরা। সঙ্গে সুর মেলাতেন গ্রামের উৎসাহী তরুণ দল, সে দলে ছিলেন লৌহ কপাটের প্রখ্যাত সাহিত্যিক জরাসন্ধ। জসীমউদ্দিনের মত তখন তিনিও তরুণ বয়সী ছিলেন, তিনি আমার বাবার পরম প্রিয়জন। আমাদের বাড়ীর খুব কাছেই তাঁদের বাড়ী।

কাব্য প্রীতির মত আমার বাবার নাট্য প্রীতিও ছিল অসাধারণ। ফরিদপুর টাউন থিয়েটারের তিনি ছিলেন একজন কর্ণধার। তাঁর অভিনয় আমি নিজে দেখিনি, তবে তাঁর সাজাহান, সেলুকাস্ প্রভৃতি চরিত্রাভিনয়ের বহু সুখ্যাতি শুনেছি। আমার তখন থিয়েটার দেখবার বয়স হয়নি, সেই জন্যই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, আমাকে কোন দিন থিয়েটারে নিয়ে যাননি। না

দেখলেও পৈতৃক নাট্যোৎসাহ আমাকে সেই ছেলেবেলাতেই পেয়ে বসেছিল। বাড়ীর কাছেপিঠে বা দু'চার মাইলের ভেতর কোথাও যাত্রা-থিয়েটার হচ্ছে খবর পেলেই পালিয়ে চলে যেতুম। পরদিন প্রচুর প্রহার ভোগ করতুম। এক দিনের একটি ঘটনা বলছি—।

ফরিদপুরে আমাদের বাড়ী আর আমার দাদা মশাই-এর বাড়ী কাছাকাছি। দুটি বাড়ীর মাঝখানে ছিল একটি আমবন। নদীর ধারে এই দুই বাড়ীতে যাতায়াতের জন্য আমবনের পাশ দিয়ে পায়ে চলা পথ ছিল। দাদামশাই-এর বাড়ীর সংলগ্ন একটি প্রকাণ্ড লিচু গাছ ছায়া বিস্তার করত। সেই লিচু গাছের তলায় শুকনো ডাল পাতা সরিয়ে সেদিন দুপুর বেলা আমরা যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করেছিলুম। আমি রামচন্দ্র এবং আমাদের পাশের বাড়ীর অতুল রাবণ। দর্শক ছিল আমার ছোট ভাই বোন এবং পাড়ার গুটি পনের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। মহোল্লাসে অভিনয় চলেছে, বক্তব্য বিষয়গুলি অবিশ্যি নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী তৈরী করে নেওয়া। যাই হোক, অতুল এক সময় বলল:

—রাম রাবণের কাছে সাতবার হেরে যাবে।

আমি বললুম:

—কৈ, রামায়ণে তো তা লেখা নেই?

দিদিমা দাদামশাই রামায়ণ পড়তেন, রোজ শুনে শুনে রামায়ণ মহাভারত আমাদের প্রায় কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। বেশ জোর দিয়ে বললুম:

—রামায়ণ নিয়ে আসছি, দেখাও, কোথায় লেখা আছে রামচন্দ্র সাতবার রাবণের কাছে হেরে গিয়েছিলেন।

অতুল বলল:

—রামায়ণে লেখা থাক আর নাই থাক, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে রামকে সাতবার হারিয়ে দিয়ে আটবারের পর রামকে জিতিয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই। এতে রাজী থাক তো যাত্রা হবে, নইলে আমি চললুম।

অতুল তার বাঁশের ধনুক, প্যাঁকাটির শক্তিশেল, ভাঙ্গা ক্যানেস্ত্রা পিটিয়ে তৈরী করা ঢাল, তলোয়ার এবং সেই সঙ্গে অধিকাংশ দর্শককে ভাগিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে অগত্যা আমি সেই প্রস্তাবেই রাজী হলুম। যুদ্ধ আরম্ভ হল, সাত সাতবার কুইনাইন গেলবার মত অনিচ্ছার সঙ্গে আমায় ভূমিশয্যা গ্রহণ করতে হল। এইবার অষ্টম যুদ্ধ এবং রাবণ নিধন। অনার্য রাক্ষসকে গালাগাল দেবার মত বেশ ভালো ভালো গাল ভরা কথা মনে মনে রপ্ত করে নিয়েছিলুম। সেইগুলি এক একটি অ্যাটোম বোমার মত উদ্‌গীরণ কচ্ছি, আর বোঁ বোঁ করে ক্যানেস্ত্রার টিনের তলোয়ার ঘোরাচ্ছি। বীর বিক্রমে ভুরু কুঁচকে গেছে। চোখ বুজে গেছে। এইবার গালাগালির 'স্টক' শেষ হয়েছে, তলোয়ার ঘুরিয়ে হাঁপিয়ে গেছি, রাবণের বুকে এইবার চরম আঘাত হানা প্রয়োজন বোধে চোখ খুললুম। দেখি রাবণ আমার সামনে নেই, দর্শকবৃন্দও কর্পূরের মত উবে গেছে। ব্যাপারটা কী হল? ঘাড় ফেরাতে গিয়ে হঠাৎ কর্ণমূলে কিসের আকর্ষণ অনুভব করলাম! দৃষ্টি ঈষৎ উর্ধ্বে তুলে দেখি, পিতৃদেব আমার কর্ণমূল ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আদালত থেকে হঠাৎ এ রকম অসময়ে ফিরে এসে আমার নাটকের এমন অভাবনীয় চরম পরিণতি ঘটাবেন তার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলুম না। সেই অবস্থাতেই আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন ভূগোল বইএর সামনে—মেরুদণ্ড, নিরক্ষবৃত্ত ইত্যাদি মুখস্থ করতে। ভূগোল মুখস্থ করব কী? আমার গোটা মস্তকটাই ভূমণ্ডলের মত বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগল।

বাবার স্নেহ যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের কাছে শুনেছি স্নেহ বিতরণে তিনি ছিলেন উদার, অকৃপণ। আমার কিন্তু মনে আছে বেশী করে তাঁর ভয়াল মূর্তিটি। দূর থেকে তাঁর ছায়া দেখলে অন্তরাত্মা থর থর করে কেঁপে উঠত। তিনি ছিলেন প্রায় ছ'ফুট লম্বা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ পুরুষ। ঈষৎ আরক্ত দুটি চক্ষু কখনও মনে হত স্বপ্নময়, আবার কখনও

মনে হত সে চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যেন জাহাজের সার্চলাইটের মত মনের তলায় অন্ধকারে কোথায় কি লুকিয়ে আছে সবকিছু আবিষ্কার করে ফেলে। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছে বয়োবৃদ্ধদেরও অনেক সময় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াতে হত।

অতি বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে কেটেছে আমার শৈশব ও কৈশোর জীবন। সে পরিবেশে শাস্ত্রালোচনা ছিল, কাব্যানুশীলন ছিল, নাট্যচর্চা ছিল, আর ছিল নানাপ্রকার এড্‌ভেঞ্চার। বাড়ীর দক্ষিণে চৌধুরীবাবুদের আমবাগানের কাঁচামিঠে আম চুরি করে, রথতলায় বটগাছের শিকড়ে বেঁধে রাখা হাটুরে চাষীদের ডিঙি নৌকা খুলে কিশোর বন্ধুদের সঙ্গে পদ্মার চর পাড়ি দেওয়া, তারপর রাতের অন্ধকারে ফিরে সেই নৌকা কোলাহলরত উৎকণ্ঠিত চাষীদের অজান্তে রথতলার কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে পা টিপে টিপে বাড়ী ফিরে আসা—এগুলি আমার কৈশোর এড্‌ভেঞ্চারের প্রথম পর্ব। ইস্কুলে নিচের ক্লাসে ভর্তি হয়ে সেই সময় একটি ভিন্ন ধরনের এড্‌ভেঞ্চার করে ফেলেছিলুম আমি, দেশবরেণ্য অম্বিকাচরণ মজুমদার মশাইএর পৌত্র বাদল এবং আরও তিন চারিটি বন্ধু মিলে। এই এড্‌ভেঞ্চারকে উপলক্ষ্য করে আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় শর্মিষ্ঠার।

জিলা স্কুলের সঙ্গে আমাদের ঈশান ইনষ্টিটিউটের ক্রিকেট ম্যাচ উপলক্ষ্যে ইস্কুল ছুটি হয়েছে। ক'জনে আসছি খেলার মাঠে খেলা দেখতে জেলখানার পাঁচিলের পাশ দিয়ে। পাঁচিলের গায়ে ছিল একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ, পাঁচিল ডিঙিয়ে তার ঝাঁকড়া মাথা আরও অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। হঠাৎ মনে এক অদ্ভুত ভাবোদয় হল। ঐ গাছের ওপরে উঠলে রহস্যপুরী জেলখানার ভিতরটা দেখা যাবে। আমরা সব দেখতে পাব, কিন্তু ঘন ডালপালার ভেতর দিয়ে আমাদের কেউ ওদিক থেকে দেখতে পাবে না! বন্ধুদের বলতে সবাই রাজী হয়ে গেল। তখন শীতকাল, গরম কোট আলোয়ান আর খাতা বই

গাছতলায় রেখে চুপি চুপি উঠলুম সেই গাছে। আমি স....
ওপরে, তারপর বাদল, তারপর আর সব ছেলেরা। বাঃ চমৎকার দেখা যাচ্ছে তো জেলখানার ভেতরটা! মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি, ডাঃ প্রতাপ গুহ রায়, খান বাহাদুর তমিজুদ্দিন সাহেব, লাল মিঞা সাহেব প্রভৃতি ফরিদপুরের বড় বড় নেতারা আন্দোলন করে জেলে যাচ্ছেন। ছোট বড় রাজনৈতিক বন্দীদের ভীড়ে জেলখানা একেবারে পূর্ণ হয়ে গেছে। পাতার আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছি কোন পরিচিত নেতাকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা। হঠাৎ অবনী আঙুল তুলে দেখাল—"ঐতো ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি, তাঁর বাঁদিকে ঐ যে লাল মিঞা! আমাদের বুঝি দেখেছেন ওঁরা! ঐ ছাখ, লালমিঞা হাত নাড়ছেন।" তাইতো! ওঁরা তো আমাদের দেখেছেন! উল্লসিত হয়ে চীৎকার করে উঠলুম—বন্দেমাতরম্। জেলের ভেতর থেকে জবাব এল—বন্দেমাতরম্। কিশোর কণ্ঠের ধ্বনির উত্তরে এল নেতাদের প্রতিধ্বনি। আনন্দ আর ধরে না আমাদের। স্থান কাল সব ভুলে গেলুম—সবাই দ্বিগুণ উৎসাহে আবার চীৎকার করলুম—বন্দেমাতরম্। জেলের ভিতর উঠল প্রত্যুত্তর—বন্দেমাতরম্। ক্রমে জেলখানায় যেখানে যিনি রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন, আর শুধু রাজনৈতিক বন্দী কেন—ফরিদপুর জেলের সমস্ত কয়েদীর কণ্ঠ এক সঙ্গে মিলিত হয়ে বজ্রগর্জন করে উঠল—বন্দেমাতরম্। জেলখানার পাঁচিল শুদ্ধ বুঝি সে সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে থর্ থর করে কেঁপে ওঠে, বুঝি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। জেলের ভেতরে ছুটতে লাগল বন্দুকধারী সান্ত্রীর দল। মুহুর্মুহু বাজতে লাগল পাগলা ঘন্টি। এ আকস্মিক উন্মাদনার কারণ কি বুঝতে না পেরে সান্ত্রীরা ইতঃস্তত তাকাতে লাগল। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল অশ্বত্থ গাছের ওপর উত্তেজনা সৃষ্টিকারীদের প্রতি। আমাদের তারা ডাণ্ডা দেখাল। বিশুদ্ধ হিন্দীতে অনেক মুখরোচক সম্বোধন করে নেমে যেতে বলল। আমরাও গাছের ওপর থেকে তাদের হস্তাঙ্গুলীর কদলী প্রদর্শন

করলুম, তাদের মস্তককে ফুটবল কল্পনা করে মহাশূন্যে পদ সঞ্চালন দ্বারা দু'চারটে "কীক্" ও করলাম। তারা যতই ভয় দেখাক, আমরা জানি, জেলখানার ফটকের একেবারে বিপরীত কোণের গাছে আমরা আশ্রয় নিয়েছি, সুতরাং তারা ফটক দিয়ে বেরিয়ে আমাদের ধরতে আসবার বহু পূর্বেই আমরা বিজয়ী বীরের মত পশ্চাদপসরণ করতে পারব। তাই মহোল্লাসে অঙ্গদের রায়বার চলল। হঠাৎ এক সময় বাদল আমায় চাপা গলায় নেমে পড়তে বলে নিজেই নামতে লাগল। কী ব্যাপার? তাকিয়ে দেখি সঙ্গীরা সব তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে পড়েছে! সবার আগে নেমেছে অবনী। অবনীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড চেহারা এক হিন্দুস্থানী সান্ত্রী! সর্বনাশ! এখন! অবনী গাছ থেকে নেমেই তাড়াতাড়ি নিজের গরম কোটটি এবং বইখাতা বগলদাবা করে নিয়েছে। তারপর মুখভাব করুণ-রসাত্মক করে বার বার সবিনয় নিবেদন করছে যে, সে একান্ত নির্দোষ এবং আমাদের প্ররোচনাতেই সে গাছে উঠতে বাধ্য হয়েছিল। এইসব কথা বলছে, আর এক পা এক পা করে পিছনে হটছে। তারপর যখন বুঝতে পারল যে সান্ত্রী হাত বাড়ালেই তাকে ধরতে পারবে না, এইটুকু ব্যবধান উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি করতে সে সক্ষম হয়েছে, তখন অকস্মাৎ "এবাউট টার্ণ" করে অবনী চোঁচা ছুট দিল। টানা লম্বা দৌড়···একেবারে পগার পার। সান্ত্রী প্রবরের মগজে এইবার বুদ্ধির পোকা নড়ে উঠল। আমরা বাকী ক'জন গাছ থেকে নামবার আগেই তিনি তাড়াতাড়ি আমাদের কোট, আলোয়ান, খাতাবই যা কিছু গাছতলায় রেখেছিলুম সবগুলি হস্তগত করে ফেললেন। আমরা নেমে এলে তিনি আমাদের বদ্মাস্ গুণ্ডা প্রভৃতি অনেক মিষ্টি সম্বোধন করে তাঁকে অনুসরণ করতে আদেশ দিলেন। কি আর করি? জামা বই ফেলে বাড়ীতে ফিরলে পিঠের চামড়া থাকবে না। বরং দু'চারটে মিষ্টি কথা শুনতে শুনতে সান্ত্রী সাহেবের অনুগামী হওয়াই ভাল। জেলার সাহেবের বাড়ীর সামনে দিয়ে সান্ত্রী ধীর পদক্ষেপে মুরুব্বীচালে আমাদের নিয়ে আসছিল।

বারান্দায় ছুটে এল একটি পাঁচ ছয় বছরের ফুটফুটে মেয়ে। সান্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল :

—কি হয়েছে সেপাই ?

সান্ত্রী আমাদের ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল :

—এদের গেরেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছি। এরা সব গুণ্ডা।

মেয়েটি ঠোঁট ফুলিয়ে ভেংচি কেটে বলল :

—হুঁ, গুণ্ডা বুঝি অত ছোট হয়! ছেড়ে দাও এদের!

সান্ত্রী আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, সে আমাদের ছাড়বে না! জেলখানায় পুরে দেবে। পাথর ভাঙ্গাবে আমাদের দিয়ে, তেলের ঘানী টানাবে, শেষে বুকের ওপর পাথর চাপিয়ে দিয়ে শুইয়ে রাখবে! আমরা ভীষণ বদমাস্। ভীষণ গুণ্ডা।

মেয়েটি প্রবল বেগে মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতে লাগল··· কখখনো না, ঐটুকু ছেলেরা গুণ্ডা হয় না। ছেড়ে দাও এখখুনি। সান্ত্রীও তার কথা শুনবে না···সেও আমাদের নিয়ে যেতে দেবে না। অকস্মাৎ দূরে কাকে লক্ষ্য করে মেয়েটি চীৎকার করে উঠল :

—বাব্ উ-উ! বাব্—উ-উ!

জেলর সাহেব। পেছনে ফাইল পত্তর বগলে একজন সান্ত্রী। কোর্টের দিক থেকে যাচ্ছিলেন জেলখানায় নিজের অফিস ঘরের দিকে। মেয়েটির ডাক শুনে থম্‌কে দাঁড়ালেন। তারপর এগিয়ে এলেন বাড়ীর পথে। এসেই মেয়েটিকে বুকে তুলে নিলেন। মেয়েটির চোখে এর আগেই লক্ষ্য করেছিলুম জলের রেখা। এইবার জেলর সাহেবের কাঁধে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। জেলর সাহেব কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করেন মেয়েকে। মেয়ে জবাব দেয় না, শুধু কাঁদে, নিরুদ্ধ অভিমানে ফুলে ফুলে ওঠে। বিস্মিত হয়ে জেলর সাহেব একবার আমাদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সান্ত্রীকে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন। সান্ত্রী প্রকাণ্ড সেলাম ঠুকে পর্বত প্রমাণ মিথ্যা এবং উঁই ঢিবি প্রমাণ সত্য মিশিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ফিরিস্তি পেশ করল। মেয়েটি এবার মাথা তুলে

চীৎকার করে উঠল : মিছে কথা! সেপাই সব মিথ্যে করে বানিয়ে বলছে। জেলর সাহেব মেয়েকে শান্ত করবার জন্য পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। আমাদের পানে ফিরলেন :

—তোমরা এই সব দুষ্টুমী করেছ?

বাদল জবাব দিল :

—কখ্‌খনো না। ওরাই বরং উল্টে আমাদের যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়েছে। আমরা গালাগাল দিইনি। আমরা শুধু—

বাদলের কনুই-এ চিমটি কাটলুম আমি। বোকার মত তাড়াহুড়ো করে সেই অঙ্গুলি সঙ্কেতে কদলী এবং শূন্যে ফুটবল খেলার কথা বলে না দেয়। ঐ প্রক্রিয়াগুলিকে বেমালুম চেপে তার কথার জের টেনে আমিই জবাব দিলুম :

—আমরা শুধু বন্দেমাতরম্ বলেছি।

জেলর সাহেবের সন্ধানী চোখ সম্ভবতঃ আমার চিমটি কাটা রূপ গোপন কাজটি ধরে ফেলেছিল। তিনি আমার পানে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন :

—আর কখনো জেলখানার গাছে উঠবে না। আজ যা যা দুষ্টুমী করেছ, তা করবে না কখনো। মনে থাকবে?

সবাই ড্রিল করবার ভঙ্গীতে একেবারে এক সঙ্গে মাথা কাৎ করে জানালুম—তাই হবে। জেলর সাহেব আমাদের ছেড়ে দেবার হুকুম দিয়ে, মেয়েকে চুমু খেতে খেতে বাড়ীর ভেতর পৌঁছে দিতে গেলেন। আমরাও খাতা বই, জামা প্রভৃতি পেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলুম যে যার বাড়ীর দিকে।

তারপর ইস্কুলে আসবার পথে প্রায়ই দেখতে পেতুম সেই সান্ত্রীকে। ডাণ্ডা বগলে নিয়ে ভুঁড়ি দুলিয়ে গালে খউনি ঢেলে দেয় আর আমার দিকে আড় চোখে তাকায়। লোকটার ভাবভঙ্গী দেখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বালা করত। কত মিথ্যে কথা-ই না লাগিয়েছিল

আমাদের নামে জেলর সাহেবের কাছে! ভাগ্যিস্ ওই ছোট মেয়েটি ছিল! খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে যাহোক।

সেদিন ইস্কুল ছুটির পর বাড়ী যাচ্ছি। কে হাঁক দিল ঃ

—গুণ্ডা! ছোট্ট গুণ্ডা!

জেলর সাহেবের বাগানে দাঁড়িয়ে গোলগাল হাত দুখানি নেড়ে মেয়েটি আমায় ডাকছে। পথের ধারে একটি স্টেশনারী দোকান ছিল। সেখান থেকে কিছু লজেন্স্, বিস্কুট কিনে নিয়ে হাজির হলুম বাগানের পাশে। লজেন্স বিস্কুট দিতে মেয়েটি হাত বাড়িয়ে নিল, তারপর বাগানের ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে সেগুলির অসঙ্কোচ সদ্ব্যবহারে মন দিল। আমি নাম জিজ্ঞাসা করলুম। সে বললে— বাবু বলে খুকু। মা বলে শমি। বইএ নাম লিখে দিয়েছে মাস্টার মশাই শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা সেন।

আমি বললুম ঃ

—দেখ শমি, তোমাদের সেই সেপাইটা ভীষণ পাজী। তোমার বাবাকে বলে ওকে আচ্ছা করে মার খাওয়াতে পার? সে ঘাড় নেড়ে বলল ঃ হুঁ। আমি বললুম ঃ তা যদি পার তোমায় আরও বিস্কুট লজেন্স দেব। হাতের কাজ শেষ করে সে জিজ্ঞাসা করল ঃ আর নেই? আমি বললুম ঃ আজ আর নেই। কাল নিয়ে আসব। তোমার বাবাকে বলে ওই সান্ত্রীটাকে জব্দ করে দেবে তো! শমি রাজী হল আমার প্রস্তাবে।

পরদিন বাজার থেকে ভালো চকোলেট, লজেন্স নিয়ে এলুম। শমি মহা খুশী। ফোলা ফোলা গালের ভেতর টপাটপ ফেলে দেয়। মুক্তোপাঁতির মত দাঁত বার করে হাসে! আমি কাজের কথা পারলুম, সেই সান্ত্রীর কথা। শমি বললে ঃ বাবুকে বলেছি। খুব মারবে ওকে বাবু! শুনে খুব আনন্দ হল, মিথ্যে লাগানেওয়ালাদের শায়েস্তা হওয়াই দরকার। কিন্তু কই? কিছুই তো হচ্ছে না! সান্ত্রী আমার পানে এখনো রোজ আড় চোখে তাকায়। আর শমি রোজ অসঙ্কোচে লজেন্স চকোলেট খায়। রাগ করে যাওয়া বন্ধ করলুম শমির কাছে।

প্রায় এক সপ্তাহ শমিদের ওখানে যাইনি। মনটা কেমন খুঁতখুঁত করছে। কৈ, ওকেও তো বাগানের ধারে দেখতে পাই না! সেদিন বাগানের মালীর কাছে খবর করে জানলুম, শমির বাবা বদলী হয়ে চলে গেছেন কোথায়! থম্‌কে দাঁড়ালুম। বিশ্বাসঘাতিনী বালিকা! অসঙ্কোচে মুঠো মুঠো লজেন্স, চকোলেট ঘুষ নিয়ে পাজী সিপাহীর শাস্তির কোনো ব্যবস্থা না করে এমন ভাবে উধাও হয়ে গেল!

তারপর সাত বছর কেটে গেল। শমির স্মৃতি মন থেকে প্রায় মুছে গেছে। দৈবাৎ ছেলেবেলার সেই ঘটনা মনে পড়লে হাসি পায় এখন। ইস্কুলে সেকেণ্ড ক্লাশে পড়বার সময় প্রহ্লাদ চরিত্র অবলম্বনে "দানব কেশরী" নামে একখানি নাটক রচনা করে ফেলেছি। ইস্কুলের হাতেলেখা পত্রিকায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যর্থ অনুকরণে সমরসিংহ ও জলদবাসিনীর জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে দুর্গ শিখরে রোমাঞ্চকর প্রণয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করে সহপাঠিদের বিস্ময় উৎপাদনে সক্ষম হয়েছি। শুধু তাই নয়, অভিনেতা রূপেও আত্মপ্রকাশ করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছি। আমাদের প্রধান শিক্ষক কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ছিলেন অসম্ভব নাট্যামোদী। তাঁর অভিনয় শিক্ষা দানের ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। ইস্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় তাঁরই শিক্ষায় আমি মহাকবি গিরিশচন্দ্রের "বুদ্ধদেব চরিত" নাটকে বুদ্ধদেব এবং "তপোবল" নাটকে বিশ্বামিত্রের চরিত্রে রূপদান করে সেই কিশোর জীবনেই বহুজনের প্রীতিভাজন হয়েছিলুম। প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছিলেন আমার নাট্য সাধনার প্রথম পথ প্রদর্শক। তাঁর স্নেহ, তাঁর প্রীতি, তাঁর উৎসাহ বাণী, আমায় চলার পথে যে পাথেয় দান করেছিল তার পরিমাণ বলে বোঝাতে পারব না। স্মরণে জেগে আছে তাঁর পুণ্য স্মৃতি।

ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় আমার

দ্বিতীয় এড্‌ভেঞ্চার স্থুরু হল। আমার এক মামা নোয়াখালীতে উকিল ছিলেন। দাদামশাই, দিদিমাকে বলে গরমের ছুটিতে রওনা হলুম মামার কাছে দিন কতক বেরিয়ে আসব বলে। ফরিদপুর থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত স্টিমারে যেতে হয়। তারপর ট্রেণ চলে যায় চট্টগ্রাম। মাঝ পথে লাক্‌সামে ট্রেণ বদলী করে নিতে হয় নোয়াখালীর যাত্রীদের। ইস্কুলে সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাইএর কাছে পাহাড় ও সমুদ্র বেষ্টিত চট্টগ্রামের বহু বর্ণনা শুনেছি। শুনে শুনে চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে মনের ভেতর একখানি পরম রমনীয় ছবি এঁকে নিয়েছিলুম। গাড়ীতে উঠে যাত্রীদের আলাপে বুঝলুম—তাঁদের ভেতর অনেকেই চট্টগ্রামের যাত্রী। আমিও স্থির করে ফেললুম, নোয়াখালী যাব না, সোজা চলে যাব চট্টগ্রাম।

কিন্তু চট্টগ্রাম স্টেশনে নেমে এক বিপদে পড়লুম। টিকেট ছিল লাক্‌সাম পর্যন্ত। চেকার আমায় আটকে দিল। আমি ভোলাকাকার নাম বললুম। পিসিমার কাছে শুনেছিলুম আমাদের দুলালী গ্রামে পাশের বাড়ীর ভোলকাকা চট্টগ্রামে রেলে কাজ করেন। কিন্তু ভোলাকাকা বলতে, কেউ চিনতে পারল না। অন্য নাম আছে কিনা জিজ্ঞাসা করল। তা'ও বলতে পারি না। অগত্যা কি ভেবে চেকার আমায় শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিল। টিনের স্যুটকেশ হাতে নেমে পড়লুম চট্টগ্রামের শহরের পথে। দুধারে পাহাড়ের মাঝখানে আঁকা বাঁকা রাস্তা; সেই পথে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু যাবো কোথায়? কে আছে এখানে পরিচিত জন? অন্যমনস্ক ভাবে একা একা পথ ধরে এগিয়ে চলি শুধু। খানিক দূরে গিয়ে এক সাধুর দেখা পেলুম। একখণ্ড আধ ময়লা সাদা থান কাপড় বুকের কাছে আড়াআড়ি ভাবে গিয়ে দুই বাহুর নিম্ন দিয়ে ঘাড়ের পেছন দিকে বাঁধা। মুণ্ডিত মস্তকে দীর্ঘ শিখা। খঞ্জনি বাজিয়ে হরিনাম গান গেয়ে চলেছেন। দেখে বুঝলুম ইনি ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনের প্রভু জগদ্বন্ধুর সেবক। এই দূর দেশে শ্রীঅঙ্গনের সাধুকে দেখে মনে খানিকটা সাহস সঞ্চার হল। তাঁকে অনুসরণ করে চললুম। মাথার উপর মধ্য দিনের সূর্য

উঠেছে, আগুনের তাপে পাহাড় শুদ্ধ তেতে গেছে, হাওয়ায় আগুনের হল্‌কা। কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে, গলা শুকিয়ে গেছে তেষ্টায়। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে তবু চলেছি ক্লান্ত পায়ে সেই সাধুর পিছনে। এক সময় একটি গাছের ছায়ায় সাধু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমায় হাত নেড়ে ইসারা করলেন তাঁর কাছে আসতে। কাছে যেতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—কোথায় যাবে তুমি ভাই ?

—জানি না !

সাধু বিস্মিত হলেন ঃ

—জানো না ? কোথা থেকে আসছ তুমি ?

জবাব দিলুম ঃ

—ফরিদপুর থেকে। হঠাৎ চলে এসেছি।

ফরিদপুর নাম শুনেই সাধু উৎফুল্ল হলেন ঃ

—এখানেও প্রভু জগবন্ধুর আশ্রম আছে দেব পাহাড়ে। যাবে আশ্রমে ?

আমি অকূলে কূল পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলুম ঃ যাবো। সাধু আমাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন দেব পাহাড়ে। ঘন বনশ্রেণীর ভেতর দিয়ে পাহাড়ী পথ, সেই পথে দেব পাহাড়ে উঠতে লাগলুম। পায়ে চলা অতি সঙ্কীর্ণ পথ। কোথাও পাথর, কোথাও বা গৈরিক মাটি কেটে পাহাড়ের গায়ে এই দুর্গম পথের সৃষ্টি হয়েছে। ক্লান্ত দেহে অনেক কষ্টে ওপরে উঠলুম। পাহাড়ের চূড়ায় ছোট্ট মাটির ঘর, পরিষ্কার তক্‌তকে অঙ্গন, এক পাশে তুলসী-মঞ্চ। এইটিই প্রভু জগবন্ধুর আশ্রম। বারান্দায় বসে খানিকটা বিশ্রাম করলুম। সাধু এক ঘটি ঠাণ্ডা জল এনে দিলেন। সেই জল খেয়ে খড়ের চালার নিচে শুয়ে পড়লুম। সাধু জানালেন, ভোগ আরতির পর তিনি আমায় ডেকে তুলবেন প্রসাদ পাবার জন্য ; ততক্ষণ আমি ইচ্ছামত বিশ্রাম করতে পারি। দক্ষিণে সমুদ্রের দিক থেকে হাওয়া আসছে ঝড়ের মত বেগে সোঁ সোঁ শব্দ তুলে। শাল, তেঁতুল, জাম প্রভৃতি উঁচু

গাছের ব্যূহভেদ করে দোলা দিচ্ছে আশ্রমের চতুর্দিকে পুষ্পিত ইন্দ্রযব গাছের ডালে। লুটিয়ে পড়ছে আমলকী আর হরিতকীর বনে। ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়ছে শুকনো ডাল পালা। সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়লুম।

সাধু আমায় ডেকে তুললেন পড়ন্ত বেলায়। শ্বেত পাথরের থালা, বাটি ও গ্লাসে করে প্রভুর প্রতিকৃতির সামনে তুলসী পাতা দিয়ে নিবেদন করেছিলেন আতপ চালের ভাত, কিছু আলু সেদ্ধ ও কাঁচা মুগের ডাল। সেই প্রসাদ দুখানি কলার পাতায় আমাদের দু'জনের জন্য ভাগ করে নিলেন। খাওয়া শেষ হলে মুখশুদ্ধি দিলেন একখণ্ড হরিতকী।

বিকেল বেলা দেবপাহাড়ে কয়েকজন কলেজের ছাত্র বেড়াতে এসেছিলেন। কলেজ দেবপাহাড়ের খুব কাছেই। সাধু ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, তাঁরা আমায় কলেজ হস্টেলে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। পরদিনও তাঁদের সঙ্গে সাম্পানে চড়ে কর্ণফুলি নদীতে অনেকক্ষণ বেড়িয়েছি। সেদিন ফিরতে বেশ একটু রাত হল। আশ্রমে ফিরে এসে দেখি সাধু সন্ধ্যারতি সেরে চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর সদাহাস্যময় মুখখানিতে কী যেন একটি বিষাদের ছায়া। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করতে সাধু বললেন, বিকেল বেলা চিঠি এসেছে, দেশে তাঁর মায়ের অতি কঠিন ব্যাধি! জীবনের আশা নেই।

চুপ করে সাধুর কথা শুনতে লাগলুম। কর্ণফুলি নদীর ওপারে রাঙ্গামাটিতে তাঁর দেশ। সেখানে আছে ছোট ভাই, আর বুড়ীমা। তাঁদের ফেলে দশ বছর আগে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ভাইএর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। কিন্তু মায়ের সঙ্গে দশ বছর দেখা সাক্ষাৎ নেই। সেই মা আজ চলে যাচ্ছেন চির দিনের মত। যাবার আগে একটিবার তাঁকে দেখবার শেষ ইচ্ছা জেগেছে মায়ের মনে। ভাই তাঁকে চিঠিতে এই সংবাদ জানিয়েছে। একটু চুপ করে থেকে সাধু বললেন:

—কী যে করব, প্রভু আমায় কী সমস্যায় ফেললেন, তাঁর মনে যে কী ইচ্ছা কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

আমি বললুম ঃ

—এর ভেতর বোঝবার কি আছে? আপনার দেশে চলে যাওয়া উচিত।

সাধু জবাব দিলেন ঃ

—সেই জন্যই তো আরও ভাবিত হচ্ছি। আমার মনও বলছে যাওয়া উচিত। অথচ এ সময়ে আশ্রমে আর কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, যার হাতে প্রভুর সেবার ভার ছেড়ে দিয়ে যেতে পারি।

আমি সাধুকে আশ্বাস দিয়ে বললুম ঃ

—এদিককার ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। যে ক'দিন আপনি ফিরে না আসেন সে ক'দিন প্রভুর সেবা করব আমি।

চম্‌কে উঠলেন সাধু! কথাটা যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না! সংশয় জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—তুমি পারবে ভাই? পারবে প্রভুর সেবা করতে?

মৃদু হেসে জবাব দিলুম ঃ

—কেন পারব না? আমি সব লক্ষ্য করেছি! ভোগ আরতি, সন্ধ্যারতি সব দরজায় বসে দেখেছি। আপনি যেমনটি করেন আমিও প্রাণপণ চেষ্টা করব ঠিক সেই রকম যত্ন করে প্রভুর সেবা করতে। সকালবেলা নগর ভিক্ষায় বেরুব, তারপর দুপুরে···

আমার কথার মাঝখানে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন সাধু ঃ

—না, না, তোমায় নগর ভিক্ষায় বেরুতে হবে না ভাই। ঘরে যা চাল ডাল আছে, তাতে চার পাঁচ দিন প্রভুর ভোগ চলবে। আমি তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসব। তুমি আমায় নিশ্চিন্ত করলে ভাই, আমায় নিশ্চিন্ত করলে।

আমার হাতে আশ্রমের ভার দিয়ে তিনি রওনা হয়ে গেলেন কর্ণফুলি পারি দিয়ে রাঙ্গামাটির পথে।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে প্রভুর মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজনে লেগে গেলুম। নিজের হাতে রান্না করলুম আতপ চালের ভাত, আর আলু সেদ্ধ। পাথরের থালায় তাই সাজিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে বাইরে বসে নাম গান আরম্ভ করলুম। প্রভু জগদ্বন্ধুর সেবায় তন্ত্রমন্ত্র নেই, শুধু নাম, শুধু নাম কীর্তন। কীর্তন শেষে খানিকক্ষণ চোখ বুজে প্রভুকে স্মরণ করলুম, মনে মনে ভোগ নিবেদন করলুম। তারপর দরজা খুলে প্রসাদ অন্ন বাইরে নিয়ে এসে কলার পাতায় ঢেলে গ্রহণ করলুম। বিকেলে দু'চারজন যাঁরা বেড়াতে এসেছিলেন, সন্ধ্যার আগেই নীচে নেমে গেলেন। ধীরে ধীরে ঘন সন্নিবেশ গাছের মাথায় ও ডালপালায় অন্ধকার জমাট বেঁধে এল, ঝিঁঝি ডাকতে লাগল, থেকে থেকে শুকনো পাতার ভেতর সরীসৃপ চলার হিস্‌হিস্‌ শব্দ ও বন্যপাখীর ডানা ঝাপটানির আওয়াজ আসতে লাগল। বুকের ভেতরটা কেমন ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। আলো জ্বালিয়ে প্রভুর আরতি করলুম। অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলুম। তারপর ভোগ নিবেদন করে, প্রভুর প্রতিমূর্তিকে সযত্নে আচ্ছাদিত করে দরজা বন্ধ করে দিলুম। বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে লক্ষ্য করে দেখলুম কোথাও একবিন্দু আলোর রেখা দেখা যায় না। গাছপালা, পাহাড়, পথ সব লেপে মুছে একাকার হয়ে গেছে। পরম দুঃসাহসী মানুষকেও এই আকাশ পৃথিবী ছাওয়া ঘন অন্ধকারে অকস্মাৎ চমকে উঠতে হবে। দূরাগত সমুদ্র গর্জন ক্রুদ্ধ দানবের নিঃশ্বাসের মত বুকের পাঁজরার তলায় হাঁতুড়ীর ঘা দিতে থাকবে। কিন্তু আজ আমার মনে ভয় বা উৎকণ্ঠার চিহ্ন মাত্র নেই! অন্ধকার চারিদিক হতে আমায় ঘিরে ফেলেছে, সমুদ্রের মধ্যে যেন ডুবে গেছি। ডুব দিয়ে চোখ চাইবার চেষ্টা করলে চোখের ভেতর যেমন একটা আলোর অনুভূতি জাগে, মনে হল এই দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের প্রতি লোমকূপ হতে তেমনি আলোর রশ্মিগুলি আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। অলৌকিক, অশরীরি বাণী যেন আশ্বাস দিয়ে বলছেঃ ভয় নেই।

অন্ধকার যে এত আলোকময়, নিস্তব্ধতা যে এত বাঙ্ময় হয় এর আগে কখনো বুঝিনি। কোনো সঙ্গী নেই, কোনো সহায় নেই, তাই সেই অন্ধকার রাত্রে এক পরম সঙ্গীর অস্তিত্বের আভাস পেয়েছিলুম।

ঠিক পাঁচ দিনের দিন সাধুর একখানি চিঠি পেলুম। লিখেছেন, তাঁর মা তাঁকে কিছুতেই ছাড়বেন না! শীর্ণ মুঠিতে তাঁর ছিন্ন গাত্রবাসের একপ্রান্ত আঁকড়ে ধরে শুয়ে থাকেন, রোগ পাণ্ডুর গাল বেয়ে ঝরে জলের ধারা। লাক্সামে অন্য আর একটি ভক্তকে তিনি চিঠি দিয়েছেন, ভক্তটি সম্ভবতঃ আজকালের মধ্যেই দেব পাহাড়ে পৌঁছে যাবেন, প্রভুর সেবার ভার নেবেন। আর মায়ের হাত থেকে মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সাধু নিজেও চলে আসবেন দেব পাহাড়ে।

পাঁচদিন পার হয়ে গেল। কারুর দেখা নেই। এ ক'দিন ঘরে যা চাল ডাল ছিল তাই দিয়ে ভোগ দিয়েছি। কিন্তু কাল? কাল থেকে ভিক্ষায় না বেরুলে উপায় নেই। পরদিন প্রত্যুষে তাই করতে হল, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে তুলে নিলুম। পাহাড় থেকে নেমে দু'তিনটি গৃহস্থ পরিবারে ঘুরেই দু'দিনের ভোগের সংস্থান হয়ে গেল। হয়তো আমাকে বালক দেখেই তাঁরা দেবসেবায় বেশি করে চাল ডাল দিয়েছিলেন। তৃতীয় দিন ভাবলুম, পাশের গৃহস্থদের কাছে বারবার যাওয়া উচিত নয়, একটু অন্য পাড়া ঘুরে আসি।

ঝুলি কাঁধে পাহাড় থেকে নামলুম। এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে আমার সামনে দিয়েই পাহাড়ে উঠছিলেন। হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি আমায় পেছন থেকে ডাকলেন। আমি ফরিদপুর থেকে এসেছি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। নোয়াখালিতে মামার কথাও বললেন। যাকে উনি খুঁজছেন, আমি সেই লোক বুঝতে পেরে বললেন, আমায় ওঁর সঙ্গে যেতে হবে। বিশেষ জরুরী দরকার। আর কিছু ভাঙ্গলেন না তিনি। তাঁর সঙ্গে এলুম জেলখানার কোয়ার্টারে। ভদ্রলোক আমায় এক মিনিট বসতে বলে ভেতরে চলে গেলেন, একটু পরেই মধ্য বয়সী একটি মহিলা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মহিলাটিকে

এর আগে কখনও দেখিনি। তাই একটু বিস্ময় বোধ করলুম। তিনি আমার পানে একবার তাকিয়ে বললেন ঃ

—ওঃ তুমিই! তা তোমার এ দুর্মতি কেন ?

—দুর্মতি!

—লাবণ্যদি আমায় চিঠি দিয়েছেন। মুচকি হেসে বললেন উনি ঃ —আমরা যখন নোয়াখালিতে ছিলুম, তখন তোমার মামীমার সঙ্গে পরিচয় হয়। খুব যাতায়াত ছিল আমাদের দু'বাড়ীতে। লাবণ্যদি, মানে তোমার মামীমা আমাকে নিজের বোনের মত ভালবাসতেন। কাল ওঁর চিঠি পেয়েছি যে ভাগ্নেটি ওঁর ওখানে যাবার নাম করে সোজা এসে উঠেছে চট্টগ্রামে সাধুর আশ্রমে। তাই খোঁজ খবর নিতে লিখেছেন।

চট্টগ্রামে এসে বাড়ীতে চিঠি দিয়েছিলুম মাকে। মামাকেও লিখেছিলুম একখানা পোস্টকার্ড দু'তিন দিন বাদে নোয়াখালী যাব বলে। আট দশদিন হয়ে গেল, আমার কোনো পাত্তা নেই, তাই মামীমার এই হুঁসিয়ারী।

—কি ভাবছ ? লুকিয়ে বেড়াবার সঙ্কল্প করেছ কেন ?

আম্‌তা আম্‌তা করে জবাব দিলুম ঃ

—না, আমি শিগগিরই ফিরে যাব।

—হ্যাঁ, তাই যেয়ো।...একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন ঃ

—লাবণ্যদিকে তবে সেই কথাই লিখে দেব তো ?

—লিখবেন। একটু ভেবে বললুম ঃ তবে নোয়াখালি যাব না, অনেক দেরী করে ফেলেছি, ফরিদপুরেই চলে যাব লিখবেন।

—বেশ! ফরিদপুর, নোয়াখালি যেখানে ইচ্ছে যাও, তবে আশ্রমে পড়ে থাকা চলবে না তোমার। দু'যায়গাতেই সবাই কতো ভাবছেন বলো তো!

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে তিনি বললেন ঃ

—ফরিদপুর যায়গাটি ছোট শহর হলেও, বেশ। আমরাও অনেকদিন ছিলুম ফরিদপুরে।

—তাই নাকি ? কতদিন আগে ?

—তা হবে অনেক দিন। মনে মনে একটু হিসেব করে বললেন ঃ সাত বছর হবে, শমি তখন পাঁচ পেরিয়ে ছয়ে পা দিয়েছে !

—শমি !···ভদ্রমহিলার মুখের পানে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালুম। উনি একটু হেসে বললেন ঃ

—আমার মেয়ে !

—আপনি শমির মা !···আমার বিস্ময় দেখে কারণ জানতে ওঁর আগ্রহ হল।

—তুমি চেন নাকি শমিকে ?

মাথা নাড়লুম।

—চিনতুম বোধ হয়। এক সময় ফরিদপুর জেলখানার গাছে উঠে এক কেলেঙ্কারী করেছিলুম।

—জানি !···আমার পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন ঃ

—তুমিই তবে শমিকে লজেন্স চকোলেট কিনে দিতে ? তুমি সেই গুণ্ডা ? ভদ্র মহিলা সশব্দে হেসে উঠলেন। আমি লজ্জায় মাথা নিচু করলুম। ঠিক সেই সময় একটি মেয়েদের ইস্কুলের গাড়ী এসে দাঁড়াল বাড়ীর দরজায়।···সাদা ফ্রক পরা একটি মেয়ে। দু'কাঁধের পাশে ডবল বিনুনী দুলিয়ে খাতা বই নিয়ে হন্‌হন্ করে বারান্দা পার হয়ে যাচ্ছিল। মহিলাটি ডাকলেন ঃ

—শমি !

নিঃশব্দে ফিরে দাঁড়াল মেয়েটি। আমায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মহিলাটি বললেন ঃ

—চিন্‌তে পারিস একে ?

মেয়েটি আমার মুখের পানে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মহিলার দিকে তাকাল ! চাউনিতে তার সলজ্জ প্রশ্ন।

—বেইমান মেয়ে ! ফরিদপুরে এত লজেন্স, চকোলেট চেয়ে খেয়েছ ! আর কিছু মনে নেই ?

মেয়েটির চোখ আবার এসে পড়ল আমার মুখের ওপর। স্বচ্ছ জলের ওপর আলোর ঝিলিকের মত একটা উল্লাস।

—ওঃ, গুণ্ডা!

একটু হেসেই হঠাৎ ভুরু দু'টো কুঁচকে গেল। আমার কাঁধের পানে আঙুল তুলে দেখাল :

—কিন্তু কাঁধে ওটা কি?

আমি কেমন অস্বস্তি বোধ করলুম। আমার হয়ে জবাব দিলেন ওর মা :

—ভিক্ষের ঝুলি! গুণ্ডা এখন সাধু হয়েছেন যে!

—মানে?

গাড়ীর সহিস হাঁক দিল। দেরী হয়ে যাচ্ছে। ছুটে বেরিয়ে গেল শমি। গাড়ীতে উঠল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল :

—বিকেলে আসবেন কিন্তু।

ঘাড় নেড়ে জানালুম আসব। গাড়ী পথের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শমির মা আমাকে এবেলা ওদের এখানেই থেকে যেতে বললেন। আমি বললুম, তা সম্ভব নয়। সাধুজি দেশে চলে গেছেন, প্রভুর সেবার ভার আমার ওপর, সব কথা তাঁকে খুলে বললুম। তিনি অবাক হয়ে গেলেন।

আসবার সময় চাল, ডাল, তরি তরকারি, একটি বোতলে করে কিছু গাওয়া ঘি আমার আশ্রমে পৌঁছে দেবার জন্য একটি সান্ত্রীকে আমার সঙ্গে দিলেন। আমি বললুম :

—দিতেই যদি হয় তরিতরকারী তুলে রাখুন। ও আমি রান্না করতে পারব না। আলু সেদ্ধ ভাত আর গাওয়া ঘি— ঐ যথেষ্ট।

তিনি হেসে ফেললেন।

—বেশ, তাই হবে। চাল, আলু আর ঘি নিয়ে যাও। রওনা

হবার সময় বারবার বলে দিলেন বিকেল বেলা অবিশ্যি আসা চাই। স্বীকৃতি জানিয়ে রওনা হলুম। পথে আসতে আসতে ভাবলুম—মায়ের জাত এমনিই বটে। ঘর ছেড়ে পথে নেমেছি তবু মায়ের সজাগ চোখ সেই পথেও জলভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে।

বিকেলে শমিদের বাড়ীতে এসে দেখি শমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আমায় নিয়ে গিয়ে ড্রয়িং রুমে বসাল। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল:

—আজ কি ভোগ রান্না হল?

আমিও হেসে জবাব দিলুম:

—বলব কেন?

—না বললেও, বলে দিতে পারি। ভাত, আলু সেদ্দ, ঘি।

—ওঃ, ইস্কুল থেকে ফিরেই মায়ের কাছে সব শুনে নিয়েছ বুঝি?

—উঁহু! আমি গুণতে জানি যে?

আমার পানে তাকাল শমি। ভুরু দু'টি কৌতুকে নাচছে! চমৎকার দু'টি সরু ভুরু, যেন তুলি দিয়ে আঁকা! কুঁচকে গেলে আরও চমৎকার দেখায়! টেবিলের ওপর বাঁধানো এক্সারসাইজ খাতার মধ্যে একটা পেন্সিল ছিল। সেই পেন্সিলটিকে আনমনে বার করে নিল, খেলার ছলে পেন্সিলের ডগা দিয়ে নিচের ঠোঁটে বার কতক চাপ দিল; তারপর মুক্তোর পাঁতির মত দাঁতের ফাঁকে পেনসিলের ডগায় ছোট্ট একটু কামড় দিয়ে পেন্সিলটা বার করে নিল। ডগায় ছোট দাঁতের দাগ পড়েছে। সেই দাগটুকু বাঁহাতে পরীক্ষা করতে করতে জিজ্ঞাসা করল:

—কতদিন আর হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হবে?

—সাধুজি যতদিন না আসেন।

—তিনি যদি না আসেন? আমার চোখের পানে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করল শমি।

—না, না, তিনি দু'একদিনের মধ্যেই এসে যাবেন। নয়তো অন্য কোনো সাধু আসবেন, সেবার ভার নেবেন।

শমির মা এসে চা, জলখাবার দিয়ে গেলেন। হয়তো শেষের কথা ক'টি তিনি শুনেছিলেন। বললেন ঃ

—তাই এসে গেলেই বাঁচি! ওই জঙ্গল ভরতি পাহাড়, সেখানে একা এইটুকু ছেলে,—সাহস আছে তোমার বাছা, অন্য কেউ হলে ভয়েই পালাত।

পাশের কোন বাড়ীর গিন্নি এসেছেন বেড়াতে। শমির মা তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। আমি আর শমি কথা বলতে লাগলুম—চা খেতে খেতে।

এক সময় শমিকে বললুম ঃ

—জানো শমি, আমি একখানি নাটক লিখছি। কবিতা লিখেছি, গল্পও লিখেছি। সমর সিং ও জলদবাসিনীর রোমাঞ্চকর প্রেম কাহিনী শুনিয়ে দিলুম তাকে। গল্প শেষ হলে শমি বলল ঃ

—কই, এ গল্পটা তো পড়িনি কখনো?

—পড়বে কী করে?

শমি জবাব দিল ঃ

—কেন? আমাদের বাড়ীতে কতো গল্পের বই আছে।

ভাবলুম, কী মুস্কিল! এতক্ষণ কি বললুম তবে? আমার কথা কি শুনতে পায়নি? বেশ জোর দিয়ে বললুম ঃ

—আমার নিজের লেখা গল্প এটা, আর কারু লেখা নয়। শমি প্রতিবাদ করে বলল ঃ

—তাতো বুঝলুম, কিন্তু কী বই দেখে লিখেছেন, সেই বই-এর নামটা তো বলবেন?

হতাশ হয়ে মুখ ঘোরালুম। নাঃ, আমার রোমাঞ্চ উদ্বেল মানস-লোকে প্রবেশের অধিকার এ অবোধ বালিকার এখনো হয়নি। জলদবাসিনীর প্রেম কথা স্রেফ মাঠে মারা গেল। সোফার ওপর দেহ এলিয়ে বাইরে তাকালুম। সূর্য পাহাড়ের চূড়ার ওধারে ডুবুডুবু! হঠাৎ মনে পড়ল, সন্ধ্যারতি করতে হবে। এক লাফে উঠে দাঁড়ালুম।

—চলি শমি।

যাবার জন্য পা বাড়ালুম। ব্যস্ত হয়ে উঠল শমি:

—সেকি! এত তাড়াতাড়ি?

—উপায় নেই, প্রভুর সন্ধ্যারতির সময় হয়ে গেছে! বড্ড দেরী করে ফেলেছি।…মাকে বোলো তুমি।

পেছন থেকে ডাকল শমি: কাল আসবেন তো?

পথের মোড়ে নেমে বললুম—আচ্ছা।

প্রতিদিনকার মত সেদিনও সন্ধ্যারতির পর বাইরে এসে দাঁড়ালুম। মন বড় চঞ্চল। এক কিশোরী বালিকা মূর্তি বারবার মনের দিগন্তে বিচিত্র বর্ণ সমারোহ বিস্তার করে। কখনো মনে হয় বর্ষার প্রথম মেঘের মত স্নিগ্ধ কাজল মাখানো তার চোখ। আবার কখনো মনে হয় বয়ঃসন্ধির তটে দাঁড়িয়ে সেই কাজল মেঘের ওপর রঙের ঝলকানি লেগে থেকে থেকে চমকে ওঠে যেন! কখনো স্নিগ্ধ, কখনো আতপ্ত মনে হয় তার সান্নিধ্যকে! চেষ্টা করেও ভুলতে পারি না। মুছে ফেললেও সে মূর্তি একেবারে মুছে যায় না, আবার ভেসে ওঠে। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে গেলুম। আজ আর অন্ধকারের সে অখণ্ড রূপ দেখতে পাই না, কার উচ্ছ্বসিত হাসিতে অন্ধকার যেন চির খেয়ে যায়। বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে, গা ছম্‌ছম্‌ করে। অন্ধকার নির্জন পাহাড়ে একান্ত নির্ভর করে যে অদৃশ্য সঙ্গীকে পেয়েছিলুম আজ মনের দিগন্তে এক বালিকা মূর্তির ছায়া সঞ্চার হয়েছে বলেই কি সেই পার্শ্বচর নিঃশব্দ অভিমানে সরে দাঁড়িয়েছেন! মন্দিরের অঙ্গনে লুটিয়ে পড়ে বললাম:

—হে ক্ষমা সুন্দর, ক্ষমা করো আমার অপরাধ! তুমি নিজেকে প্রকাশিত করো। আমায় আশঙ্কা মুক্ত করো।

ঠিক পনের দিন দেশে কাটিয়ে সাধুজি ফিরে এলেন। তাঁর মা একটু সুস্থ হয়েছেন। লাক্‌সাম থেকে সেই ভক্তটি আসেন নি। আমি

নিজে ভিক্ষে করে প্রভুর ভোগ দিয়েছি শুনে সাধুজি আমায় বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলেন।

—প্রভু তোমার মঙ্গল করবেন ভাই। সব অকল্যাণ দূর করে দেবেন। আমার গায়ে পিঠে তিনি হাত বোলাতে লাগলেন।

যাক্, এবার আমি মুক্ত। একটা প্রকাণ্ড বোঝা নেমে গেছে, একটা বিরাট দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি। নিজেকে অনেকখানি হাল্কা বোধ করলুম। শমিদের বাড়ীতে এর মধ্যে মাত্র আর একদিন গিয়েছিলুম। আমি তার সঙ্গে অত্যন্ত সংযত ভাবে কথা বলেছি। পাছে তার চিন্তা আমার মনকে এতটুকু বিক্ষিপ্ত করে, প্রভুর সেবা, প্রভুর স্মরণ মননে পাছে এতটুকু বাধা জন্মে, তাই সংযত কেন, বোধ হয় একটু রূঢ় আচরণই করেছি তার সঙ্গে। তাই কি আমায় না দেখে শমি একটিবারও এল না এই আশ্রমে? শমির মা অবিশ্যি লোক পাঠিয়ে খবর করেছেন। কিন্তু শমির কি একটিবার আসা উচিত ছিল না? স্থির করেছি, কালই চলে যাব এখান থেকে। যাবার আগে একটিবার দেখা করে আসব ভাবছি ওদের সঙ্গে। হঠাৎ চোখ পড়ল পথের ওপর। কে পাহাড়ে উঠছে? হ্যাঁ, শমিই তো! সঙ্গে তার বুড়ো মাস্টার মশাই। বুকের ভেতরটা আনন্দে তোলপাড় করে উঠল। যে চিন্তাকে ভেবেছিলুম মুছে ফেলেছি, সে আদৌ মুছে যায় নি। অন্তরের গভীরতম প্রদেশে লুকিয়েছিল। আজ সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ওরা এসে পৌঁছুল। মৃদু হেসে অভ্যর্থনা করলুম। শমিও হাসল একটুখানি। সাধুজির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম। সাধুজি মাস্টার মশাইকে নিয়ে বসলেন মন্দিরের বারান্দায়। তাঁরা আলাপ আলোচনায় মত্ত হলেন। আমরা দু'টিতে এসে বসলুম মন্দিরের একপ্রান্তে ফুলন্ত ইন্দ্রযব বনে। ছোট ছোট শাদা ফুল ঝরে পড়ছে। বড় মিষ্টি গন্ধ। শমি মুঠোয় করে ফুল তুলতে লাগল। আমি গল্প আরম্ভ করলুম। আমার লেখার গল্প। সেদিন শমিকে যে জবাব দিইনি, আজ সেই কথা বুঝিয়ে বললুম। গল্প জাগে আমার

মনে, বই পড়ে নয়, নিজের মন থেকে রচনা করি কবিতা, গল্প, নাটক। বিস্ময়ে শমি দুই চোখ বড় বড় করে আমার পানে তাকাল, তারপর অন্যমনস্ক ভাবে দৃষ্টি মেলে দিল পশ্চিম আকাশের দিকে। দিনান্তের আলো রাঙা ফাগের মত লেগেছে তার কপালে। এলোমেলো কোঁকড়ান চুলের গোছায়।

শমি হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করল :

—সাধুজি এসে গেছেন। এইবার বাড়ী ফিরবেন তো ?

আমি জবাব দিলুম :

—হ্যাঁ, এইবার ফিরতে হবে। ভাবছি কালই যাব !

ওর মুখের পানে তাকালুম। কই, আমি চলে যাব শুনে এতটুকু বিষাদের ছায়া নেই তো মুখে ! বিজ্ঞের মত মাথা ঝাঁকিয়ে বলল :

—তাই ভালো—বাড়ীর সবাই কত ভাবছে ! কালই চলে যাবেন দেশে।

আমি জবাব দিলুম না। চুপ করে বসে রইলুম। খানিক বাদে মাস্টার মশাইএর ডাক শোনা গেল :

—শমি ! কোথায় গেলে ? শমি—

—যাই মাস্টারমশাই—। আমার দিকে ফিরে বলল : রাত হল, আমরা যাচ্ছি এবার। বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল শমি। খানিকটা গিয়ে কৌতুক ভরে ডাকল :

—গুণ্ডা !

আমি সাড়া দিলুম না। শমি আবার ডাকল :

—সাধু !

তবু চুপ করে বসে রইলুম। খানিকবাদে আস্তে আস্তে সে আমার পিঠের কাছে এসে দাঁড়াল ! কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বলল :

···গুণ্ডা নয় ! সাধু নয় !···এখন থেকে শুধু অনেক বই লেখা ! ···আমার চুলের গোড়ায় একটু নাড়া দিয়ে শমি ছুটে পালিয়ে গেল হাসতে হাসতে। সেইখানে বসে বসে দু'চোখ যেন কেমন জ্বালা

করতে লাগল। চোখ রগড়াবার জন্য কোলের ওপর থেকে হাত তুলতে গিয়ে দেখি—শমি কখন আমার মুঠো একরাশ ইন্দ্রযব ফুলে ভরে দিয়ে গেছে। শাদা ফুল, শাদা মিষ্টি গন্ধ। একরাশ ইন্দ্রযব ফুল!...পরদিনই ঘুম থেকে উঠে রওনা হলুম দেশের দিকে।

ফরিদপুর ফিরে এসে আবার থিয়েটার নিয়ে খুব মেতে উঠলুম। বুধবার ও রবিবার ফরিদপুরে হাট বসত। হাটুরেরা আগের দিন রাত্রে গাড়ী ও নৌকা বোঝাই করে বাঁশ জমায়েৎ করে রেখে যেত বাঁশের বাজারে। সেই বাঁশ দলবল মিলে রাত্রে চুরি করতুম। রাতারাতি সেগুলি কেটে ফেলে স্টেজ তৈরী করে ফেলতুম। সকালে এসে কারুর ধরবার সাধ্যি থাকত না যে এ বাঁশ কার! এইরকম চোরাই বাঁশে বাঁধা স্টেজে পাড়ার ক্লাবে আলমগীর, সীতা, দিগ্বিজয়ী, সাবিত্রী, নরনারায়ণ প্রভৃতি নাটক অভিনয় করে ফরিদপুরে আমার নট-খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরের দিন থাকত ফিস্টের ব্যবস্থা। চাল, তেল, মশলা প্রভৃতি বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়ে আমরা কোনো পোড়ো বাড়ীতে জমায়েৎ হতুম। ছাগ বংশধর সংগ্রহ হত অবিশ্যি অবৈধ উপায়ে। পরদিন সকালবেলা ছাগলের মালিক যখন নিরুদ্দিষ্ট ছাগলের সন্ধানে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতেন—আমরা তখন ছাগ মাংস পরিপুষ্ট উদরে নিরুপদ্রবে নিদ্রা যেতুম। একবার ছাগল সংগ্রহ ব্যাপারে আমাদের হতাশ হতে হয়। কারণ যে ছাগলটিকে স্বর্গধামে পাঠাবার উদ্দেশ্যে আমরা তেল, মশলা যোগাড় করে রাত্রের অন্ধকারের অপেক্ষা কচ্ছিলুম অন্য পাড়ার বিপক্ষ দল সেই ছাগলের মালিক কাশেম দর্জিকে পূর্ব হতেই হুঁসিয়ার করে দিয়েছিল। ফলে সে ছাগল কাশেম দর্জির শয়ন গৃহে সারারাত আবদ্ধ থাকল। আমরা বারবার চেষ্টা করেও তার মহামুক্তির ব্যবস্থা করতে পারলুম না। অগত্যা অন্য ছাগলের সন্ধানে সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরতে লাগলুম। ভাত নেমেছে, মশলা পেষা সম্পূর্ণ, উনুনে কয়লা জ্বলে জ্বলে ছাই হতে চলেছে। উদরাগ্নিও

প্রথমে বর্দ্ধিত, পরে ছাই চাপা কয়লার আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছে, অথচ পথের ধারে লোকের বাড়ীর আশে পাশে ছাগ বংশধরের চিহ্ন মাত্র নাই। হতাশ হয়ে ফিরছি—এই সময় বাঞ্ছারাম হঠাৎ উল্লসিত হয়ে বলল :

—কোনো চিন্তা নেই। ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ঐ দেখ!

বাঞ্ছারাম আঙ্গুল দিয়ে ফরিদপুর বারলাইব্রেরীর বারান্দার দিকে দেখিয়ে দিল। তাইত, বেলে জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছে বারান্দায় একটি ছাগ বংশধর গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। আমাদের অপেক্ষা করতে বলে বাঞ্ছারাম এগিয়ে গেল সেই দিকে। আমরা পথের ধারে তেঁতুল গাছ তলায় লালায়িত রসনায় অপেক্ষা করতে লাগলুম। পা টিপে টিপে গিয়ে বাঞ্ছারাম সেই ছাগ বংশধরকে বাহু পাশে বন্দী করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতেই সহসা নারী কণ্ঠের চীৎকার উঠল :

—কে রে মুখপোড়া!

বারান্দায় একজন ভিখিরী মেয়েছেলে শুয়েছিল। তার খোলা চুলের গোছা এলিয়ে পড়েছিল বার-লাইব্রেরীর সিঁড়ির ওপর। বাঞ্ছারাম ঈষৎ অন্ধকারের জন্যও বটে এবং উদরাগ্নির উত্তাপের জন্যও বটে পৃথিবীর সমস্ত কালো রঙের পদার্থকেই ছাগ বংশধর বলে ভ্রম করেছিল, তাই এই বিভ্রাট! সহজ জ্ঞান ফিরে আসতেই বাঞ্ছারাম ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল, আমরাও কে কার আগে ছুটতে পারি—সেই পদবলের পরীক্ষায় প্রাণপণে মেতে উঠলুম। যতদূর পর্যন্ত কানে পৌঁছুল পশ্চাত দিক থেকে বামা কণ্ঠের যে সব ভাষা আমাদের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হতে লাগল—পৃথিবীর কোনো অভিধানে তার তুলনা পাওয়া যায় না। আড্ডায় ফিরে শুধু ডাল ভাত খেয়েই সেবারকার মত ফিস্ট সম্পূর্ণ করে যে যার বাড়ী ফিরলুম!

ফরিদপুর কলেজে সরস্বতী পূজায় ষোড়শী নাটকে জীবানন্দের ভূমিকায় রূপদান করলুম। কলেজে পড়বার সময় তিন, চারবার

কলকাতায় অভিনয় দেখে এসেছি। দানীবাবু, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দ মুখার্জি, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অভিনয় প্রতিভার চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে আমার মনে অদম্য ইচ্ছা জাগলো প্রত্যক্ষ ভাবে এঁদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের।

দেশে ফিরে ওঁদের সবার নামে চিঠি লিখলুম আমার সঙ্কল্প জানিয়ে। সেই সঙ্গে অনুরোধ করলুম নাট্যকলা সম্বন্ধীয় কিছু বই-এর সন্ধান জানাবার জন্য। পত্রের জবাব আর কেউ দেন নিঃ দিয়েছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশাই। একখানি পোস্টকার্ডে লেখা কয়েকটি ছত্র আমাকে যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তার মূল্য অনেকখানি। মনে মনে স্থির করলুম—কলকাতায় যেতেই হবে—স্থায়ী ভাবে থাকতে হবে। ওখানে নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশাই-এর সাহায্যে নাট্য-জগতে প্রবেশ অধিকার অর্জন করতে পারব।

॥ পাঁচ ॥

—কাউকে বিশ্বাস করেছ কি ঠকেছ, থিয়েটার এমনি জায়গা।

—একথা বলছেন কেন?

—বলছি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে।

—কিন্তু আপনারা শিল্পী, আপনাদের শিল্পচর্চার জগৎ!

—হ্যাঁ, আমরা শিল্পী। তবে কি জান, শিল্পচর্চার জগতে অনেক কিছুই পাওয়া যায়, পাওয়া যায় না শুধু শিল্পীমন। ও বস্তুটি এখানে একান্ত দুর্লভ।

বেলগাছিয়া অনাথদেব লেনের বাগান বাড়ীতে বসে কথা হচ্ছিল নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশাই-এর সঙ্গে। পুকুর ধারে একটা করবী ফুলের গাছ। ফুল ঝরছে, শুকনো পাতা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে, সেই দিকে তাকিয়ে নির্মলেন্দুবাবু খানিকটা আপন মনেই বললেন:

—থিয়েটারে যখন কাজ করি, আশে পাশে এত গুণমুগ্ধ

গুণগ্রাহীর দল ঘুরে বেড়ায় যে তাদের সেবা-যত্নের আতিশয্যে অস্বস্তি বোধ করি। একটু সর্দি হয়েছে, কপালটা একটু কামড়াচ্ছে···অনবরত কুশল জিজ্ঞাসা। মিনিটে মিনিটে নানা রকম ওষুধ দিয়ে রিলিফ দেবার আগ্রহ! থিয়েটার ছেড়ে বাড়ীতে বসে থাক ছ'মাস, একশ পাঁচ ডিগ্রি জ্বরে গা পুড়ে যাক, একটি গুণগ্রাহীকে পাবে না কপালে একটু অডিকোলোন দিতে, বা কুশল প্রশ্ন করতে।···গত বছর নাট্য নিকেতন ছেড়ে দিয়েছিলুম। বিজয়া দশমীর দিন একটি প্রাণী এল না দেখা করতে। অনেক রাত অবধি একা একা বসেছিলুম এই করবী গাছটার তলায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নির্মলেন্দুবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর গলার স্বরটা মনে হল যেন একটু আবেগে কাঁপছেঃ

—থিয়েটারে যতদিন থাকি ততদিন আমরা সবার, কিন্তু থিয়েটার ছেড়ে দিলেই বুঝতে পারি আমাদের আপন বলতে কেউ নেই। আমরা সবার চেয়ে নিঃসঙ্গ, আমরা বড় একা।

আমার দিকে চোখ ফেরালেন। চোখে বেদনার ম্লান ছায়া।

তাই বলছিলুম, মানুষকে ভালবেসে, বিশ্বাস করে যেখানে ঠকতে হয়—সেখানে নাই বা এলে?

—তবু না এসে আমার উপায় নেই। বিশ্বাস করে না হয় ঠকব, সে ঠকাতে আনন্দ আছে।

—ওটা কাব্যের কথা।

—না, আমার জীবনের কথা।

—তোমার বয়স এখনো অল্প। জীবনটাই এখনো তোমার কাছে কাব্য।

—হ্যাঁ কাব্য। এক কাপড়ে কলকাতা শহরে এসেছি। জ্যাঠতুতো ভাইদের সঙ্গে এক বাড়ীতে নিজেরা হাত পুড়িয়ে রান্না করে খাই। দু'বেলা ছেলে পড়াই। দুপুরে করি য়ুনিভার্সিটির ক্লাশ এটেণ্ড। ফুটপাতে ঘুরি সস্তায় পুরোনো বই যোগাড় করবার ধান্ধায়। এই আমার জীবন-কাব্য।

নির্মলেন্দুবাবুর হাতে ছিল আমার লেখা উত্তরা নাটকের পাণ্ডুলিপি। সেই খাতাখানির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

—তা হলে বই লেখ কখন ?

—উত্তরা বই লিখেছি ফরিদপুরে থাকতে। থার্ড ইয়ারে পড়তুম তখন। আর নতুন লেখার কথা জিজ্ঞাসা করেন যদি তাও এরই মধ্যে সময় করে নিয়ে লিখতে হবে বৈকি !

—হুঁ। নাটক তুমি লিখবেই। তোমাকে নাট্য জগত থেকে ফেরান যাবে না, তা আমি বুঝে নিয়েছি। উত্তরা বই আমার কাছে থাক। তিনদিন বাদে এসো আবার।

উঠে পড়লুম নমস্কার করে। পথে এসে নিজের মনটাকে বেশ হাল্কা বোধ হল।

সাতচল্লিশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট, মেজদা'দের বাড়ী। বাড়ী মানে একখানা শোবার ঘর, আর একটি রান্নাঘর। ওই অংশে আমরা ক'ভাই থাকি। বড় ভাই শচীনদা সংস্কৃতে এম. এ. পাশ করে গণনাথ সেনের ওখানে কবিরাজী করেন, নিজের ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত। মেজ জিতেনদা নোট লেখেন, ছেলে পড়ান, সম্প্রতি য়ুমেন্‌স্ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক হয়েছেন। দরকার মত তিনিও এক-আধ দিন রান্না-বান্না করেন। ফাঁক মত আমিও রাঁধি। তবে বেশীর ভাগ রান্না করতে হয় দ্বিজেনদাকে। বি. এস. সি পড়ে। পড়ার চেয়ে বাজার করা, রান্না-বান্না করা, সংসারের টুকিটাকি কাজ করা এই সব দিকেই তার ঝোঁক বেশী। এবং দ্বিজেনদা এই সব করত বলেই আমরা ফুরসুৎ পেতাম নিজেদের কাজ করবার।

মেজদার বন্ধু সংসর্গ ছিল বেশ চমৎকার। অমৃত গাঙ্গুলী বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক, হিমাংশু সেন—উত্তর ভারতে কোন কলেজে এখন তিনিও ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপক, কবি কুমুদ মল্লিক মশাই-এর ছেলে জ্যোৎস্না মল্লিক, ইউনিভার্সিটির আরও বহু প্রতিভার সমাবেশ হত আমাদের সাত-

চল্লিশ নম্বরের বাড়ীতে। আমার উত্তরা বই তাঁরা শুনতেন, সমালোচনা করতেন, উৎসাহ দিতেন, গ্রীক ট্র্যাজেডি থেকে স্থরু করে ইবসেন পর্যন্ত নাট্যধারার গতি পরিবর্তনের নানা আলোচনা হত আমাদের ছোট্ট ঘরটিতে বসে। অমৃতবাবু আর হিমাংশুবাবু এ দুজন তো ছিলেন মেজদার দুবেলার সাথী। কাজেই ওঁদের সঙ্গে নাট্যালোচনার সুযোগ ঘটত আমার প্রায় প্রতিদিনই। নির্মলেন্দুবাবুর ইচ্ছামত উত্তরা বই তিন চারবার অদল বদল করবার পর মেজদা একদিন বেঁকে বসলেন:

—সব বাদ দিলে বই-এর লিরিক্যাল সৌন্দর্যও যে অনেকটা বাদ পড়ে যাবে!

—উপায় নেই। সাধারণের বোধগম্য করতে হলে লিরিক্ খানিকটা কমাতে হবে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ চায় পয়সা। পয়সা রোজগার করতে হলে সাধারণের রুচী অনুযায়ী জিনিস পরিবেশন করতে হবে।

যুক্তিটা মেজদার ভাল লাগল না। না লাগুক, আমি চাই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হতে। তার জন্য যা অদল বদল করা দরকার—তাই করলুম। শেষ পর্যন্ত বইখানি নির্মলেন্দুবাবুর পছন্দ হল, কিন্তু তিনি যেখানে কাজ করেন সেখানকার মঞ্চমালিকের পছন্দ হল না। নির্মলেন্দুবাবুর মুখের ওপর স্পষ্ট কিছু বলতেও পারেন না, ওজর দেখিয়ে বইখানি ফেলে রাখলেন তাঁরা। নির্মলবাবু আমায় ভরসা দিলেন:

—হতাশ হোয়ো না। উত্তরা বই আমি একদিন অভিনয় করবই। মনে ভাবলুম, একদিন করবেন, কিন্তু সে একদিন কবে আসবে? আমার মনের ভাব বুঝে উনি আবার বললেন:

—সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাড়াতাড়ি একখানি বই অভিনীত না হলে তোমার উৎসাহ ভঙ্গ হবে। এক কাজ কর, আর একখানা নাটক লেখ। আমি চিঠি দিচ্ছি মিনার্ভার পরিচালক কালীপ্রসাদবাবুকে, সেই চিঠি আর নাটক নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কর।

বসুমিত্রা নামে একখানি বই লিখলুম। নির্মলেন্দুবাবুর চিঠি আর সেই বই কালিপ্রসাদবাবুকে দিয়ে এলুম। কালিপ্রসাদবাবু মুগ্ধ হলেন বসুমিত্রার কাব্য সৌন্দর্যে। তিনি বললেন ঃ

—এত কাব্য আমাদের রঙ্গমঞ্চে চলবে না। আর একখানা বই লিখুন আমাদের মত করে।

আবার আর একখানা! করুণ চোখে তাকালুম কালিপ্রসাদ-বাবুর দিকে। তিনি হেসে বললেন ঃ

—ভাববেন না। আপনার লেখা পড়ে বুঝেছি আপনি মঞ্চের নাটক লিখতে পারবেন। তবে প্রত্যেক মঞ্চের নিজস্ব বৈশিষ্ট থাকে। আমাদের মঞ্চের দু'একটি অভিনয় দেখুন। তবেই বুঝবেন আমরা কি চাই।

অভিনয় দেখলুম—পরশুরাম, দস্যু, বামনাবতার। কিছু কমিক, কিছু নাচগান, কিছু মেলোড্রামা আর খানিকটা দৃশ্য পটের জাঁকজমক ও ম্যাজিক দৃশ্য। এ ক'টি বস্তু ওখানকার জন্য অপরিহার্য। ঠিক ওই ছকে ফেলে লিখলুম গয়াতীর্থ নাটক। উল্লসিত হয়ে কালিপ্রসাদ-বাবু বললেন—হাঁ, ঠিক এই জিনিসই আমি চাই। আপনার গয়াতীর্থ মিনার্ভায় অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত করলুম।

এতদিনের পরিশ্রম, এতদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা এবার সফল হতে চলেছে। আনন্দ হল আমার, মেজদার, নির্মলেন্দুবাবুর। কিন্তু বই মঞ্চস্থ হবার আগেই দিল্লিতে চাকরী জুটে গেল। কালই রওনা হব দিল্লি। যাবার সময় নির্মলেন্দুবাবু বললেন ঃ

—তুমি চলে যাচ্ছ। আমার আনন্দ হচ্ছে, দুঃখও হচ্ছে।

—কেন?

—আনন্দ হচ্ছে চাকরী নিয়ে হাজার মাইল দূরে যাচ্ছ, থিয়েটারের নাগালের বাইরে। ধীরে ধীরে তোমার থিয়েটারের নেশা কেটে যাবে, এই আনন্দ। আর দুঃখ, শিল্পজগতে শিল্পি-মন নেই কেন? তোমাদের মত তরুণ প্রতিভাকে আজ বড় দুঃখে সরিয়ে

দিতে চাই শিল্পলোক থেকে! একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—কেমন, নেশার এইবার শেষ তো?

—না, সুরু!

—সুরু! তার মানে, আবার এসে ঝাঁপ দেবে এই অনিশ্চিতের মাঝখানে?

জবাব দিলুম না। মাথা নিচু করে বসে রইলুম।

আমার অবস্থা দেখে উনি হেসে ফেললেন ঃ

—বিয়ে করে অনেকে পস্তায়। বন্ধু-বান্ধবকে বিয়ে না করতে উপদেশ দেয়। অবিবাহিতের দল ভাবে নিজেরা বিয়ে করে এইবার অন্যকে নিষেধ করা হচ্ছে। বেশ তো, পস্তাতে হয় কিনা সেটা বিয়ের পরেই ভাবা যাবে, আগে নয়। তোমার অবস্থা দেখছি অনেকটা সেই রকম।···

আমার পিঠে একটি ছোট্ট কিল বসিয়ে দিয়ে নির্মলেন্দুবাবু হা হা শব্দে হেসে উঠলেন।

আগেই বলেছি দিল্লির চাকরী ছেড়ে উঠেছি—বউবাজার, ওরিয়েণ্টাল হোমে। তখনও মিনার্ভায় আমার গয়াতীর্থ অভিনীত হচ্ছিল সগৌরবে। প্রায় ছ'মাস বাদে ওঁরা মঞ্চস্থ করলেন ৺ভোলানাথ কাব্য শাস্ত্রীর 'ধর্মদ্বন্দ্ব' বই।

থিয়েটারের একটুখানি ইতিহাস বলি এখানে। বাংলার কোনো থিয়েটারের মালিকের নিজস্ব গৃহ নেই, সব ক'টি থিয়েটার বাড়ীওয়ালাদের কাছে "লীজ" নেওয়া। ধর্মদ্বন্দ্ব বইএর পর মিনার্ভার মঞ্চমালিক অর্থাৎ কালিপ্রসাদবাবুর বড় মামা ৺উপেন্দ্র মিত্র মশাই-এর ছেলে সলিলকুমার মিত্র মিনার্ভা ছেড়ে উঠে এলেন স্টার থিয়েটারে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সলিলবাবু স্টার থিয়েটারের লেসী রূপে থিয়েটার চালাচ্ছেন। স্টার থিয়েটারে সলিলবাবুর ব্যবস্থাপনায় এবং কালিপ্রসাদবাবুর পরিচালনায় প্রথম অভিনীত

হয় আমার লেখা চক্রধারী নাটক। চক্রধারী অভিনয়ের সময় আমার সঙ্গে কালিপ্রসাদবাবুর একটু মতান্তর ঘটে। কালিপ্রসাদবাবু নিজে একটি কমিক দৃশ্য রচনা করে আমার বইএ যোগ করে দেন। স্ত্রী বশ হচ্ছে না, তাই একটি ছাগলের ওপর স্বামী বশীকরণ বিদ্যার অভ্যাস করে স্ত্রীকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করেন। এই দৃশ্য নিয়ে আমি প্রতিবাদ করলুম। কিন্তু কালিপ্রসাদবাবু আমার আপত্তি না শুনে ঐ দৃশ্য অভিনয় করালেন। ফলে আমি স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিলুম।

মিনার্ভা থিয়েটারে তখন আবার নতুন ব্যবস্থাপনায় দ্বার উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলছিল। নির্মলেন্দুবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার ঐতিহাসিক নাটক অভিযান নিয়েই সুরু হল মিনার্ভার নব-অভিযান। নির্মলেন্দুবাবুর ইচ্ছা ছিল অভিযান বইএর পরেই তিনি মিনার্ভায় আমার উত্তরা নাটক মঞ্চস্থ করবেন। কিন্তু সে আর হল না। কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পরেই নির্মলেন্দুবাবু ব্লাড প্রেসার রোগে শয্যাশায়ী হলেন। অভিযান বন্ধ করে দিতে হল। নতুন শিল্পী দল নিয়ে আমার পরিচালনায় মঞ্চস্থ হল—আমার পৌরাণিক নাটক দেবীদুর্গা। কয়েক মাস যেতে না যেতেই আমি বুঝলুম এখানকার মঞ্চমালিকদের মতের স্থিরতা নেই। এদের সঙ্গে আমার বনিবনা হবে না। সংশ্রব ত্যাগ করলুম মিনার্ভার সঙ্গে, সলিলবাবু খবর পেয়ে তখনই আমায় আবার ডেকে নিয়ে গেলেন স্টার থিয়েটারে। সেখানে অভিনীত হল দিল্লিতে লেখা সোনার বাংলা। কলকাতায় ফিরে এসে লেখা সতীতুলসী—পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ।

কালিপ্রসাদবাবু এই সময় এই থিয়েটারের চিরাচরিত প্রথা উল্টে দিয়ে সামাজিক নাটক নিয়ে মেতে ওঠেন। রণদাপ্রসাদ, বাংলার বোমা প্রভৃতি নাটক অভিনয় করে থিয়েটারকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হতে হল। সলিলবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একদিন সন্ধ্যার পর স্টার থিয়েটারের গাড়ী বারান্দার ওপরে আমায় ডেকে নিয়ে বললেন ঃ

—মিনার্ভায় আপনার পরিচালনায় দেবীদুর্গা নাটক আমি দেখে এসেছি। আমার বিশ্বাস আপনি ভার নিলে আমার থিয়েটার বেঁচে যায়। নেবেন এ থিয়েটারের দায়িত্ব ?

আমি রাজী হলুম। তিনরাত জেগে লিখলুম গঙ্গাবতরণ নাটক। ওই গঙ্গাবতরণ নাটক অভিনয়ের তারিখ থেকে ১৯৫২-র জুনমাস পর্যন্ত স্টার থিয়েটারের নাট্য পরিচালনা করেছি আমি।

তখনকার থিয়েটারের ভেতরকার আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন করতে আমায় প্রচুর বেগ পেতে হয়েছিল। গঙ্গাবতরণ অভিনয়ের সময় একদিন ওপরে আমার বসবার ঘর থেকে শুনি স্টেজে ব্যালেদের নাচগান সব যেন কেমন তাল কেটে গেছে। তাড়াতাড়ি ছুটে এলুম নিচে। ব্যালে মেয়েরা স্টেজের ওপর হাসাহাসি কচ্ছে, তাদের পায়ের কাছে পড়ে আছে প্রকাণ্ড ফুলের মালা। খোঁজ নিয়ে জানলুম কোন একটি বিশেষ দর্শক কোন একটি বিশেষ নর্তকীর উদ্দেশ্যে ওই মালা ছুঁড়ে দিয়েছেন। এবং এই কৌতুককর ব্যাপারটির জন্য নাচগান সব গোলমাল হয়ে গেছে। যে শিল্পীটি নাচের পরেই স্টেজে বেরুবার জন্য উইংস্-এর মধ্যে অপেক্ষা কচ্ছিলেন তাঁকে আমি বল্লে দিলুম স্টেজে গিয়ে প্রথমেই মালাটিকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিতে। এই নিয়ে ভিতরে তুমুলকাণ্ড ঘটে গেল। যাঁরা আমার কাজটি অন্যায় মনে করলেন, তাঁরা বললেন :

—দর্শক আসে, ফুলের তোড়া-মালা উপহার দেয়, এটা চিরাচরিত প্রথা। মালাটিকে পায়ে মাড়িয়ে দর্শককে অপমান করা হল।

প্রতিবাদ করলুম আমি :

—মোটেই না। দর্শক যদি উপহার দিতে চান ভেতরে এসে আমার হাত দিয়ে, অথবা আমার অনুমতি নিয়ে উপহার দিতে পারেন। এভাবে মালা ছুঁড়ে দেওয়া উপহার নয়, এটা উচ্ছৃঙ্খলতা।

ওঁরা মানলেন না। বললেন :

—এরকম হলে এ থিয়েটারে দর্শক আসবেন না। জবাব দিলুম :

—উচ্ছৃঙ্খলতার জায়গা এটা নয়। সুতরাং যারা উচ্ছৃঙ্খলতা করতে চায়—তাদের এখানে না আসাই ভাল। আমার নামে থিয়েটারের কয়েকজন কর্মচারী অভিযোগ করলেন সলিলবাবুর কাছে। সলিলবাবু তাঁদের জবাব দিলেন ঃ

—এতদিন এ থিয়েটারে যা চলে এসেছে, তাই যে চিরদিন চলবে তার মানে নেই। ওঁর হাতে এখন থিয়েটারের ভার। উনি যে ভাবে চালাবেন—এখানে যাঁরা কাজ করতে চান তাঁদের সেই ভাবেই চলতে হবে।

নিঃশব্দে ফিরে এলেন অভিযানকারীর দল।

চায়ের দোকানের ওই বয়, ওই বাচ্চা ছেলেটা—ওর গতি বিধি যেন ভালো মনে হয় না। মেয়েদের জন্য চা জলখাবার নিয়ে আসে, আবার আড়ালে কি সব কথা বলে চুপিচুপি। একদিন ডেকে ধমকে দিলুম ছেলেটাকে। ও বারবার জানায়—ও নির্দোষ! একদিন ছেলেটা খাবার নিয়ে আসছিল, কি রকম সন্দেহ হতে, কাছে ডাকলুম।

—কা'র খাবার?

ভয়ে ভয়ে নাম বললে—একটি ব্যালে মেয়ের।

ডিসে একটি ডবল ডিমের ওম্‌লেট। কি রকম যেন বেশী ফোলা ফোলা লাগছে। ওমলেটটা তুলে ওল্টালুম। হাঁ, যা মনে করেছি তাই। ওমলেটের মধ্যে একখানি চিঠি! ছুঁড়ে মারলুম ডিস্ শুদ্ধ, ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙ্গে গেল, দেয়ালে লেগে। চাকরটার পাত্তা নেই, সেই থেকে থিয়েটারের ত্রিসীমানায় তাকে দেখতে পাইনি।

একজন শিল্পী আমারই সমবয়সী, বন্ধু স্থানীয়। নাম মনে করুন অরুণবাবু। যখন সীন থাকত না, তখন উনি সারাক্ষণ একটি বিশেষ অভিনেত্রীর ঘরে বসে থাকতেন। ব্যাপারটি বড়ই দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়াল, অথচ নিজে তাঁকে কিছু বলতে পারি না। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে বড়বাবু অর্থাৎ ৺উপেন মিত্র মশাই-এর শরণ নিলুম।

বড়বাবু থিয়েটারে প্রত্যহই আসতেন। বাইরে বসে তামাক খেতেন, অভিনয় দেখতেন। ভেতরে বড় একটা আসতেন না। সেদিন আমার সঙ্গে বড়বাবু ভেতরে এসে পটলবাবু অর্থাৎ মঞ্চ-শিল্পী ৺পরেশচন্দ্র বসুর ঘরে গিয়ে বসলেন। অরুণবাবুকে ডেকে পাঠালেন। আমি সরে গেলুম ঘর ছেড়ে, জানালার ওপাশে। সেখান থেকে শুনলুম বড়বাবু অরুণবাবুকে বলছেন ঃ

—দেখুন অরুণবাবু, আমি ভাবছি এখন থেকে রোজ একবার করে ভেতরে এসে বসব।

অরুণবাবু জবাব দিলেন ঃ

—সে তো খুব ভাল কথা। আপনি পিতৃতুল্য লোক। রোজ আপনাকে দেখতে পেলে আমাদের আনন্দই হবে।

—কিন্তু আমি যে একটু মুস্কিলে পড়েছি!

—কি মুস্কিল?

—বসবার ঘরের বড় অভাব। সব ঘরই ভরতি হয়ে আছে। পটলবাবুর ঘরে বসলে, পটলবাবু মুখে না বললেও, ওঁর কাজের অসুবিধে হবে। তাই একটা কথা ভাবছি!

—বলুন?

—আমি ভাবছি, আপনাকে যে ঘরটা দেওয়া হয়েছে, ওই ঘরটাই বরং আমি ব্যবহার করব!

অরুণবাবু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—সে কি স্যার? আমার ঘর!···কিন্তু আমি তবে···অরুণ বাবুর কথা শেষ না হতেই বড়বাবু বললেন ঃ

—আপনার তো ঘরের কোনো দরকার নেই। আপনার ঘর খালি পড়ে থাকে সর্বক্ষণ। যে সময়টা থিয়েটারে আসেন, শুনতে পাই সারাক্ষণ আপনি তো (সেই বিশেষ অভিনেত্রীর নাম উল্লেখ করে)···তার ঘরেই থাকেন! ঘর দিয়ে কি হবে আপনার?···একটু ভেবে পরে আমায় জানাবেন।

অরুণবাবুর মুখে কে যেন কালী ঢেলে দিল। নিঃশব্দে বেরিয়ে

এলেন। সেই দিন থেকে যতদিন স্টার থিয়েটারে ছিলেন, অরুণবাবুকে—কোন এক মুহূর্তের জন্য সেই অভিনেত্রীটির ঘরে ঢুকতে দেখিনি।

স্টার থিয়েটারে পরিচালক রূপে যোগদান করবার পর গঙ্গাবতরণ, ঊষা হরণ, কমলে কামিনী, বৃত্রসংহার, মদনমোহন, অলকনন্দা, মহালক্ষ্মী, রাণী ভবানী, রাণী দুর্গাবতী প্রভৃতি বহু নাটক সাফল্যের সঙ্গে পর পর মঞ্চস্থ হল। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী নাটকের নাট্যরূপ অভিনয়ের ব্যবস্থার পর আমার একজন অসামান্য শক্তিধর সহকর্মীকে হারালুম। মঞ্চশিল্পী পরেশচন্দ্র বসু, পটলবাবু নামে যিনি সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন পার্শী থিয়েটারের দিন্‌শা ইরাণীর ছাত্র। দিন্‌শা ইরাণীর চমকপ্রদ দৃশ্য পরিকল্পনার সঙ্গে প্রসিদ্ধ ম্যাজিশিয়ান রাজা বোসের ম্যাজিককে তিনি মঞ্চশিল্পে কাজে লাগিয়েছিলেন। তার ফলে বিরাট দৃশ্য-সজ্জার সঙ্গে তিনি সমভাবে দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে তাঁদের সামনে অলৌকিকতা সৃষ্টি করতে পারতেন। আমি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখা সুরু করবার অনেক আগেই তিনি বহু নাটকে, ঐ ধরনের দৃশ্য পরিকল্পনা করে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমি দেখেছি —মিনার্ভায় অভিনীত শিবশক্তি নাটকে মদন ভস্মের দৃশ্য। তুষার-মৌলী হিমাদ্রি। উচ্চশৃঙ্গে ধ্যানমগ্ন মহাদেব, পদতলে তপস্যারতা সতী, দূরে আবির্ভাব হল কন্দর্পের। ফুলশর সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মহাদেবের ধ্যান ভগ্ন হল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, "সংহার, সংহার" রবে গর্জন করে উঠলেন। জটাজুট সর্পফণার মত দুলে উঠল, ধ্বক্‌ধ্বক্ করে প্রজ্বলিত হল তৃতীয় নয়ন। মঞ্চের বহু দূর বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান মহাদেবের তৃতীয় নয়ন প্রজ্বলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র রশ্মি বিকীর্ণ হল, ধাবিত হল সেই অগ্নি মঞ্চের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান কন্দর্পের পানে—কন্দর্প আর্তনাদ করে ভস্মীভূত হয়ে গেল। পরশুরাম নাটকে দেখেছি পরশুরামের মাতৃ হত্যার দৃশ্য—ছায়ামূর্তিতে নয়,

মঞ্চের সম্মুখ ভাগে বিমুগ্ধ দর্শকমণ্ডলীর চক্ষের সম্মুখে। পরশুরামের মাতা রূপিনী অভিনেত্রী নিভাননী দেবী বসে আছেন, পরশুরাম রূপী শরৎ চট্টোপাধ্যায় পিতৃ আজ্ঞা পালন করবার জন্য কুঠারাঘাত করলেন মাতার স্কন্ধ দেশে। নিভাননী আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, মস্তক দ্বিধা বিভক্ত হয়ে ছিট্‌কে পড়ে গেল মঞ্চের অন্য পার্শ্বে। সমস্ত দর্শক সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে ভয়ে চোখ বুজলেন। আমার রচিত গয়াতীর্থ নাটকের সূচনাতে সমুদ্র তলে প্রবাল পুরীর দৃশ্য দেখেছি। জলের তলায় নানা জলজ উদ্ভিদ্। সামুদ্রিক মৎস্য, শঙ্খ, ঝিনুক প্রভৃতি বিচরণ কচ্ছে। সেই শঙ্খ, ঝিনুকের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এল সমুদ্র-কন্যারা গীত ছন্দে। তারপর সমুদ্রের গভীর তলদেশ হ'তে উঠল সূর্য দেবতার রথ। সাগর কন্যাকে নিয়ে সূর্যদেব সেই রথে করে সমুদ্র গর্ভ হ'তে দেখা দিলেন উদয় দিগন্তে। উভয়ের কথোপকথনে হ'ল নাটক আরম্ভ। ধর্মদ্বন্দ্ব নাটকে মঞ্চের দক্ষিণ থেকে বাম দিক পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট জলস্রোত, সেই জলপ্লাবনের উপরিভাগে মর্মর সেতু। সেতুর ওপরে বসে আছেন নায়ক অজাতশত্রু। চারিদিকে পুষ্পিত তরু লতা। সহসা মনে হল তরুশাখা দুলে উঠল, পুষ্পপুঞ্জ নারী মূর্তিতে নেমে এল। বৃক্ষলতার সঙ্গে মিশে যায়, এমনি অপরূপ সজ্জায় লুকিয়েছিল প্রায় বিশ পঁচিশটি নর্তকী। নৃত্য ছন্দে তারা নেমে এল সেতু পথে মঞ্চের সম্মুখে। স্টারে চক্রধারী নাটকে সহসা আকাশ পটে উদিত হত বিরাট নক্ষত্র, সেই নক্ষত্রে মধ্যে নিয়তি রূপিণী অভিনেত্রী। গঙ্গাবতরণ নাটকে আকাশ পথে প্রলয় গর্জনে নেমে আসত স্বর্গগঙ্গা মহাদেবের জটাজুটে; সেই জলধারার মধ্যে গঙ্গার ভূমিকাভিনেত্রীর স্বচ্ছ প্রতিকৃতি; মহাদেবের জটায় পড়ে উচ্ছ্বসিত গঙ্গাধারা তিনটি বিভিন্ন ধারায় ধাবিত হত স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল উদ্দেশ্যে। কমলে কামিনী নাটকে সিংহল বন্দরের বিরাট দৃশ্য সজ্জা। সপ্তডিঙ্গা মধুকর পাল উড়িয়ে ভিড়তো সিংহল বন্দরে; নেমে আসতেন সিংহল রাজ শালিবাহন।

ঐ নাটকেই দেখেছি সমস্ত মঞ্চ জোড়া বিরাট সমুদ্র। দূর দিগন্তে সমুদ্র গর্ভ হতে দেবীর বরে আবির্ভূত হ'ত শ্রীমন্ত সদাগর। সমুদ্র তরঙ্গের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে তটভূমে চলে আসত। সমুদ্র পার হবার সময় তরঙ্গের ওপর যেখানে পা বাড়াত সেখানেই পা রাখবার জন্য ফুটে উঠত একটি করে রক্তকমল। মহালক্ষ্মী নাটকে গ্রহরাজের দৃষ্টির আগুণে পার্বতীর বক্ষলগ্ন গণদেবের মস্তক ভস্ম হয়ে যেত। তারপর প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে দর্শক চক্ষুর সম্মুখে সুদর্শন চক্র শূন্য পথে কেটে নিয়ে আসত হস্তীমুণ্ড—সেই মুণ্ড আপনা হতে এসে যুক্ত হতো গণদেবের স্কন্ধে। জীবিত গণদেব হাত পা নেড়ে মায়ের কোলে খেলা করত। বেদীর ওপর থেকে পুত্র ক্রোড়ে গণেশ-জননী নেমে আসতেন মঞ্চের মধ্যস্থলে—যেখানে শায়িত ছিল তাঁর সিংহ। গণেশ-জননী কাছে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সিংহ আনন্দে কেশর ফুলিয়ে উঠে দাঁড়াত। দেবী সেই বাহনের ওপর উপবেশন করতেন, গণেশ জননীকে ঘিরে সুরু হ'ত দেব নাগ গন্ধর্ব কিন্নরের বন্দনা গান। এসব অলৌকিক দৃশ্য যাঁরা চোখে দেখেন নি—তাঁরা ধারণা করতে পারবেন না—যে মঞ্চে দর্শক সমক্ষে এসব দৃশ্য পরিকল্পনা কখনো সম্ভব হতে পারে।

নাটকে এসব দৃশ্য অবতারণার প্রয়োজন আছে কিনা তা তর্ক সাপেক্ষ। তবে একথা নিশ্চয় যে, পটলবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চমায়া সৃষ্টির একটি বিশেষ ধারা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে মঞ্চশিল্পী ও মঞ্চ যাদুকর। শ্রেষ্ঠ মঞ্চশিল্পী হয়তো আরও আসবেন। কিন্তু মঞ্চ যাদুকরের অভাব কোনোদিন পূর্ণ হবে কিনা কে জানে!

পটলবাবুর মৃত্যুর পর দুর্গেশনন্দিনী অভিনয়ের সময় আমি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মঞ্চ স্থাপত্যের একটি নূতন কৌশল উদ্ভাবন করেছিলুম। গোটা রঙ্গমঞ্চের ওপর বিরাট প্লাটফর্ম তৈরী করে মঞ্চকে উপরে, নিচে, দু'ভাগে বিভক্ত করেছিলুম বাড়ীর একতলা ও দোতলার

মত করে। প্রত্যেক তলায় দু'টি অংশ, অর্থাৎ মোট চারটি অংশে বিভক্ত হয়েছিল রঙ্গমঞ্চ। প্রত্যেক অংশ ঢাকা থাকত জাপানী হাত পাখার ধরনে সেলাই করা ময়ূর পালক দিয়ে। যে অংশে যখন অভিনয় হ'ত—সেই অংশের ময়ূর পালক গুটিয়ে রাখা জাপানী পাখার মত পায়ের কাছে নেমে যেত, দৃশ্যটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার খোলা পাখার মত দৃশ্যটিকে ঢেকে দিত। সেই মুহূর্তেই পরবর্তী দৃশ্যের ময়ূর পালক আবার গুটিয়ে যেত, পরবর্তী দৃশ্যাভিনয় আরম্ভ হ'ত। ঠিক এই ভাবে চোখের পলকে এক একটি দৃশ্য উদ্ঘাটিত হ'ত ও আচ্ছাদিত হ'ত। অভিনয়ে যে দ্রুততাল রক্ষিত হ'ত, ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের পক্ষে সেরূপ ক্ষিপ্রতা রক্ষা করা অসম্ভব। এই অভিনব কৌশলে নাটকটির অভিনয় ব্যবস্থা করেছিলুম বলেই, অনেক শক্তিশালী অভিনেতৃ গোষ্ঠি নিয়ে ঠিক একই কালে মিনার্ভা থিয়েটার দুর্গেশনন্দিনী নাটক অভিনয় করলেও প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কাছে দাঁড়াতে পারেন নি। মিনার্ভার নাটকখানি বন্ধ হয়েছিল দশ, বার রাত্রি অভিনয়ের পর। স্টারে দুর্গেশনন্দিনী অতিক্রম করেছিল শতাধিক রাত্রি।

নন্দকুমার, টিপুসুলতান নাটকের পর স্টারে অভিনীত হয় হায়দার আলি। প্রথম অভিনয় রজনীর পর কলকাতা জুড়ে জ্বলে উঠল হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক কলহের দাবানল। পাড়ার ছেলেরা এসে চীৎকার করল থিয়েটারের দরজায়ঃ "নামিয়ে ফেলুন হায়দার আলি নাটকের প্রচার পত্র।" ভয়ে ভয়ে নামিয়ে দিলুম হায়দার আলির ব্যানার। থিয়েটারের মুসলমান কর্মচারীরা কোথায়—জিজ্ঞাসা করল উত্তেজিত ছেলের দল। বললুম, সবাই রাতারাতি পালিয়ে গেছে। বিশ্বাস হল না। খুঁজে দেখল থিয়েটারের বাইরে ভেতরে সব ঘর, সব বারান্দা। ওরা চলে যেতে চোখ ইসারা করলুম থিয়েটারের চাকর বাবুলালকে। বাবুলাল ইসারায় জানাল সব ঠিক আছে।

—খাওয়া দাওয়ার যা হয় ব্যবস্থা করিস্—খুব হুঁসিয়ার হয়ে। বাবুলাল ঘাড় নেড়ে জানাল যা করবার সে করবে। শ্যামপুকুরে থাকি তখন—রাস্তা পার হতে শুনলুম আর্তনাদ। একটু পরেই রক্তাক্ত একটি হতভাগ্য লুটিয়ে পড়ল রাস্তার মাঝখানে—সেইখানেই নিল শেষ নিঃশ্বাস। চারিদিক হতে আসতে লাগল চরম বিভীষিকাময় সংবাদ। জীঘাংসায় মেতে মানুষ যে বর্বর জানোয়ারকেও হার মানায়—তা চোখে দেখেছি। কানে শুনেছি প্রতিদিন, প্রতি রাত্রে। রাস্তায় বেরুতে হ'ত তবু! থিয়েটারে রোজ একটিবার যাওয়া দরকার। সেদিন সকালে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে মিলিটারী টহল দিচ্ছিল, মাঝে মাঝে আসছিল গুলির শব্দ। সোজা রাস্তায় এলে হয়তো যে কোনো মুহূর্তে গুলি এসে বুকে লাগবে। উত্তরা, শ্রী সিনেমা হাউসের পেছন দিককার সঙ্কীর্ণ গলি ধরে কোন রকমে থিয়েটারে হাজির হলুম। বাবুলালকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম: সব ঠিক আছে?

বাবুলাল ঘাড় নেড়ে বলল—হ্যাঁ।

—আমি একবার যাব, আমায় নিয়ে চল। থিয়েটারের সামনের ও পেছনের দরজা বন্ধ করে নিঃশব্দে স্টেজের নিচে নামলুম। কতকালের জঞ্জাল জমেছে সেখানে, আরশুলা ইঁদুর ছুটোছুটি কচ্ছে চারিদিকে। একটা বন্ধ গ্যাস উঠছে, তীব্র গন্ধে দম নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে। দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে জ্বেলে বাবুলাল আগে চলেছে, তার পেছনে চলেছি আমি সেই অন্ধকার পাতালপুরীতে! দূর প্রান্তে কটি ছায়ামূর্তি—প্রেতের মত কা'রা যেন নড়ে উঠল, প্রাণপণে লোহার পিলার জড়িয়ে ধরল। বুকের পাঁজরগুলি হাঁপরের মত ওঠানামা করতে লাগল। বাবুলাল চাপা গলায় বললে—ভয় নেই। বাবু এসেছেন।

প্রেতমূর্তিগুলি পিলার ছেড়ে দিয়ে একটু তফাতে সরে এল। সেলাম করবার ভঙ্গীতে নিঃশব্দে শুধু হাত তুলল। তারা চারটি প্রাণী, এই অন্ধকার আবর্জনার মধ্যে ছেঁড়া চট ও খান দুই পুরোনো সীন বিছিয়ে তার ওপর তিন দিন, তিন রাত কাটিয়েছে।

সবার অলক্ষ্যে বাবুলাল কখনো মুড়ী, কখনো শুকনো রুটি, একটু আলুর দম দিয়ে যায়। তাই খেয়ে বেঁচে আছে ওরা। এই নাসীর সিপ্টার। পেটানো লোহার মত শক্ত দেহ। বড় বড় সেট্ তিনচার জনে যা সরাতে পারে না—একা নাসীর তাই সরিয়ে দেয়। পটলবাবুর ডান হাত এই নাসীর। মুখ বুজে লৌহ দানবের মত নিঃশব্দে রাজপ্রাসাদ তৈরী করে, গড়ে তোলে বিরাট পাহাড় পর্বত, প্রলয় সমুদ্র। ওই আব্বাস সহীস! স্টার থিয়েটারের ঘোড়ার গাড়ীর পেছনে থাকে, থিয়েটারের মেয়েদের কাউকে বলে "বুড়ী" কাউকে বলে "খোকী।" ছেলেবেলা থেকে থিয়েটারের মেয়েদের আনা নেওয়া করেছে, জল বৃষ্টির মধ্যে ছোট মেয়েগুলিকে গাড়ী থেকে নামিয়ে কাঁধে করে পৌঁছে দিয়েছে ঘরে—পাছে জল ভেঙ্গে ওদের অসুখ করে বলে। ওই বুড়ো কোচম্যান! মুখে কথাটি নেই, গাড়ীর বুড়ো ঘোড়ার মত কতকাল যে খাটছে এই থিয়েটারে—কে জানে? ঐ ইসমাইল শালকর! থিয়েটারের পাঁজা পাঁজা পোষাক কাঁচে, হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে সন্ধ্যার পর একটু নেশা ভাঙ্গ করে। এরা হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, বিহারী নয়, বাঙ্গালী নয়—এরা থিয়েটারের মানুষ! থিয়েটারের সংস্কার এদের সংস্কার। মিনার্ভা থিয়েটারের জাগ্রত মহাবীরজীকে এরা ভয় করে, স্টারের প্রাচীন বাস্তুদেবতাকে এরা দুধকলা দেয়—আবার নতুন জামা কাপড় পরে ঈদের নামাজে যোগ দিতে যায়। সাম্প্রদায়িক কলহে এদের কি করে তুলে দেওয়া যায় আততায়ীর হাতে?

সলিলবাবু ফোন করে দিয়েছিলেন। দুপুর বেলা 'রেসকিউ ভ্যান' এসে দাঁড়াল ওদের নিয়ে যেতে।

গাড়ীতে উঠতেও ওরা ভয় পায়। অন্ধকার থেকে বেরুলেই যদি কোনো আততায়ী ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে! করুণ অসহায় চোখে তাকাল আমার পানে। সান্ত্বনা দিলুম, ভয় নেই, কোনো ভয় নেই! মরিয়া হয়ে ইঁদুরের মত লাফিয়ে উঠল ওরা গাড়ীতে।

মিলিটারী প্রহরায় ওদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেললুম। কোচম্যান, সহীস গেল, সেই সঙ্গে বিক্রী হয়ে গেল থিয়েটারের এতকালের পুরোনো গাড়ী, ঘোড়া। তার যায়গায় এল মোটরকার।

পরপর দুটো পারিবারিক দুর্ঘটনায় বড়বাবু অর্থাৎ উপেন মিত্র মশাই একটু মুশড়ে পড়েন। তাঁর ছোট ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল। ছেলেটি ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। ঈষৎ বিকৃত মস্তিষ্ক মনে হ'ত মাঝে মাঝে। এই ছেলেটি ছিল বড়বাবুর সব চেয়ে আদরের। মাত্র উনিশ কুড়ি বছরে সে মারা গেল!

দ্বিতীয় দুর্ঘটনা বড়বাবুর ছোট ভাই জ্ঞান মিত্র মশাই-এর মৃত্যু। ছোটবাবু বা জ্ঞানবাবু ছিলেন ভাইদের মধ্যে সবার চেয়ে লম্বা চওড়া গড়ন, ভাইদের মধ্যে অথবা ও পরিবারে উনিই ছিলেন একটু ভিন্ন প্রকৃতির। যৌবনকালে অনেক দাঙ্গাবাজী করেছেন, থানা পুলিশের ভয় তিনি করতেন না, বিশেষ করে মদ্যপান করলে তিনি হয়ে উঠতেন সকলের ত্রাসের কারণ। শুনেছি, মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়ীওয়ালার সঙ্গে একবার কি নিয়ে ঝামেলা হয়, ছোটবাবু ক্ষেপে গেলেন ওই তরফের একজনকে কেটে ফেলবেন বলে। শীলবাবুরা কিছু আসল ইস্পাতের তলোয়ার উপহার দিয়েছিলেন মিনার্ভা থিয়েটারকে। সেই ধারালো তলোয়ার হাতে মদ্যপান-ঘূর্ণিত-লোচন জ্ঞান মিত্র মশাই সারা রাত জেগে আছেন মিনার্ভার পাঁচিলের ধারে —লোকটি বেরুলেই তাকে তলোয়ার দিয়ে শেষ করবেন, গোপনে নয়, মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে ডাকছেন সেই লোকটিকে। থিয়েটারে এমন কারু সাধ্যি নেই ছোটবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় বা তাঁকে বাধা দেয়। বেগতিক দেখে যতীনবাবু নামে একজন কর্মচারী ছুটে গেলেন বড়বাবুকে খবর দিতে। মিনার্ভার সামনে এসে থামল ঘোড়ার গাড়ী। সিঁড়ির ওপর পায়ের শব্দ, একটু পরে বড়বাবুর গলার আওয়াজ শোনা গেল: "বিশু!" বিশু বলেই ডাকতেন ওঁকে

বড়বাবু। ডাক শুনেই গর্জন রত বাঘ মাথা নত করল, বজ্রমুষ্টি থেকে তলোয়ার পড়ে গেল মাটিতে।

—বাড়ী চলো বিশু।...বড়বাবু গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। নিঃশব্দে ছোটবাবু গিয়ে বসলেন তাঁর পাশে। গাড়ী চলে গেল।

দুর্দান্ত বিশু ভয় করতেন জগতে ওই একটি লোককে,—যিনি জীবনে কখনো মদ্যপান করেন নি। দীর্ঘকাল মঞ্চ-মালিক রূপে ইতিহাস রচনা করে গেলেও পরম শত্রুরা যাঁর চরিত্রে কখনো নারী-ঘটিত কোনো কলঙ্কের অপবাদ দিতে পারেনি, ভয়ঙ্কর রেগে গেলেও যাঁকে কখনো কেউ চীৎকার করতে দেখেনি—ঐ ছোটখাটো আকৃতির অতি শান্ত মানুষটিকে। পিতৃ চরিত্রের এই বিশেষ গুণটির ষোল আনা অধিকারী হয়েছেন—সলিলবাবু।...জ্ঞানবাবুকে দেখেছি থিয়েটারের ওপরের ঘরে বৃদ্ধ বয়সে প্রচুর মদ্য পান কর্চ্ছেন, বড়বাবু থিয়েটারের বুকিং অফিসে এসেছেন খবর পেয়েই মদের বোতল সব চোখের পলকে উধাও হয়ে যেত, তিন চার খিলি পান ও দোক্তা, জর্দা প্রভৃতি মুখে না পূরে তিনি বড়বাবুর সামনে দিয়ে হাঁটতেন না। দিল্‌দরিয়া মেজাজ ছিল এই ভয়ঙ্কর মানুষটির। দু'হাতে নষ্ট করেছেন অর্থ, মানুষকে দিয়েছেন, খাইয়েছেন প্রচুর। জ্ঞানবাবুকে হারিয়ে বড়বাবু যে আঘাত পেলেন, তার প্রতিক্রিয়া হল তাঁর ভগ্নদেহের ওপর। মুখে অবিশ্যি কোনো দিন তাঁকে হা-হুতাশ করতে দেখিনি! আনন্দের বা শোকের বাহ্যিক প্রকাশ কোন দিনই করেন নি তিনি। একদিন একটুখানি টের পেয়েছিলুম তাঁর মনের অবস্থা আভাসে শুধু।

আষাঢ় মাস শেষ হতে চলল, বৃষ্টি দূরে থাক্ আকাশে এক ফোঁটা মেঘের ছায়া সঞ্চার নেই। আকাশ পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, বেলা ১১টার পর থেকেই কলকাতার রাস্তা জন-বিরল হতে সুরু করেছে। বাতাসে আগুণের হল্কা, পীচঢালা রাস্তা গলতে সুরু করেছে, পায়ের জুতো যেন নরম রবারের উপর দেবে যায়। ট্রামের হ্যাণ্ডেল ধরে, বাসের পেছনে ঝুলতে ঝুলতে অফিস্ যাত্রীর মেলা শেষ হলেই মনে

হয় কলকাতা বুঝি জনহীন পরিত্যক্ত পুরী। শেষে একদিন বহু আকাঙ্খিত মেঘের সঞ্চার হল। শুধু মেঘ সঞ্চার নয়, তুমুল বর্ষণ। শেষ রাত্রি থেকে সুরু হল, পরদিন দুপুর পর্যন্ত চলল তার জের। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ডুবে গেছে, থিয়েটারের সিঁড়ি ডুবিয়ে জল প্রায় থিয়েটারের ভেতরে ঢোকবার উপক্রম করেছে, আধ ইঞ্চিটাক বাড়লেই টিকেট ঘরের ভেতরে জল ঢুকে যাবে।

সেই অশ্রান্ত জলধারা মাথায় করে একখানা রিক্সায় চেপে বড়বাবু থিয়েটারে এলেন। সকাল বেলা থিয়েটারে টিকেট ঘরে বসে গড়গড়ায় তামাক খাওয়া আর সন্ধ্যায় এসে প্রথম লাইনে বসে থিয়েটার দেখা এ তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই দারুণ দুর্যোগেও তাঁর থিয়েটারে আসা বন্ধ হল না দেখে বিস্মিত হলুম।

—আজ না বেরুলেই কি চলত না?

—একা একা ভাল লাগে না বাড়ীতে, বহু দিনের অভ্যাস হঠাৎ ছাড়তে পারি না।

হাতের ছড়িটি টিকেট ঘরে রেখে দিতে দিতে বললেন :

—এই ছড়িটি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মশাই আমায় উপহার দিয়েছিলেন! বলেছিলেন হাতে রাখবেন এটা, পথ চলতে আমায় মনে পড়বে মাঝে মাঝে।

লাঠিটি একবার নিজের চোখের সামনে নিয়ে নাড়া চাড়া করলেন। তারপর আমায় বললেন :

—বারান্দায় চলো। বর্ষার দিন, আজ আর তোমার কাছে বেশী লোকজন আসবে না হয়তো। চলো, একটু নিরিবিলি কথা বলি। চাকর যজ্ঞেশ্বরকে বারান্দায় তামাক দিয়ে আসতে বলে আমায় নিয়ে এগিয়ে গেলেন প্রথম শ্রেণীর ডান দিককার বারান্দার কোণে। দুখানি চেয়ারে মুখোমুখি বসলুম দু'জনে।

একটা ভিজে কাক কার্নিশের ওপর বসে ঠোঁট দিয়ে বিপর্যস্ত পালক ঠোকরাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে বিকট শব্দ করে ডাকছে। পুরু

চশমাওয়ালা চোখ ঊর্ধ্বে তুলে বড়বাবু খানিকক্ষণ সেই কাকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যজ্ঞেশ্বর তামাক দিয়ে গড়গড়ার নল হাতে তুলে দিয়ে গেছে, সেদিকে খেয়াল নেই। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে কাকটাকে লক্ষ্য কচ্ছেন।

—তামাক দিয়ে গেছে আপনার!

আমার ডাকে ওঁর চমক ভাঙ্গল। দু'চারবার টেনে ধোঁয়া বার করে বললেন:

—তোমরা সাহিত্য পড়। কালিদাস মেঘলা দিনে মেঘদূত লিখেছিলেন। আমাদের তো তরুণ বয়স নেই।...মেঘলা দিনে আমাদের মনে পড়ে তাদের কথা—চোখের সামনে দিয়ে একে একে যারা চলে গেছে!

গড়গড়ার নলে আরও বার কতক টান দিলেন। তারপর আমার চোখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন:

—আজকে তোমাকে একটি কথা বলব বলে ডেকেছি। অনেক দিন ধরেই বলব ভাবছি। কিন্তু সুযোগ পাই না, অথবা সুযোগ পেলেও ভুলে যাই। বুড়ো বয়সের অনেক জ্বালা।

আমি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম:

—কি বলতে চান্ বলুন?

—এমন বিশেষ কিছু নয়। কথাটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম। থেমে থেমে আস্তে আস্তে বললেন বড়বাবু:

—মানুষের মরা বাঁচার কথা কিছু বলা যায় না। থিয়েটার দাঁড়িয়ে গেছে, আমার অবর্তমানে ওদের অন্নবস্ত্রের অভাব হবে না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। তবে ভাবি আমার বংশধারা থাকবে কি? চলে যাবার আগে সে বিষয়ে যদি নিশ্চিন্ত হতুম, তাহলে আমার এ বয়সে আর কোন ক্ষোভ থাকত না।

—বাবুকে বিয়ে করতে বলুন?

—অনেকবার বলেছি, কোন ফল হয়নি।

—কী বলে?

—সে তো আমার মুখের ওপর জীবনে কোন দিন কোন কথা বলে না। বিয়ের কথা বললে মাথা নিচু করে শোনে, তারপর মাথা নিচু করেই চলে যায়। এই ভাবেই কেটে গেল ক'বছর। বিয়ে সে করল না আজও।

আমি একবার বলে দেখব কি?

বড়বাবুর হাত থেকে নলটা পড়ে গেল ওঁর হাঁটুর ওপর। ডান হাত বাড়িয়ে আমার একখানি হাত চেপে ধরলেন।

—শুধু এই জন্যই তোমায় ডেকেছি। আমি জানি, তুমি, একমাত্র তুমিই পার ওর মত করাতে। তোমার অনুরোধও যদি সে না রাখে তাহলে জানব জীবনে সে কখনো বিয়ে করবে না।··· সেক্ষেত্রে আমি তার মনের ভাব স্পষ্ট বুঝতে পারব। মিথ্যে আশা না করে মনকে সেই ভাবেই তৈরী করতে পারব।

—আপনি ভাববেন না, আমি বাবুকে বলব। আমার বিশ্বাস আমি তাকে হয়তো রাজী করাতে পারব।

বড়বাবু জবাব দিলেন না। অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে গড়গড়া টানতে লাগলেন। অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে একবার ম্লান হাসি হাসলেন ঃ

—আমাদের বয়স হলে তখন বুঝবে আমার মনের কথা। এ বয়সে আর কোনো কামনা থাকে না। শুধু ঐ একটি কামনা হয়, চলে যাবার আগে যেন দেখে যেতে পারি—আমার বংশ রক্ষা হয়েছে, পিতৃ পুরুষের ধারা নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

অনেক তর্কের পর শেষ পর্যন্ত সলিলবাবুকে রাজি করালুম। মাস কয়েকের মধ্যেই উনি বিয়ে করলেন। বড়বাবু তখন বাড়ী থেকে বেরোন না। বিছানাতেই শুয়ে থাকতেন। ডেকে বললুম ঃ —বড়বাবু! বাবু বিয়ে কচ্ছে!

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন আমার দিকে, ঠিক বুঝতে পারলেন কিনা জানি না।

সলিলবাবুর বিয়ের কিছু দিন বাদেই বড়বাবু চলে গেলেন। হয়তো যা দেখবার আশায় এতদিন ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে বসেছিলেন, তা দেখা হয়ে গেছে বলেই পরম নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজলেন।

শব দেহের সামনে দাঁড়িয়ে কত টুক্‌রো টুক্‌রো কথা মনে পড়ে যায়। এই লৌহ কঠোর স্বল্পভাষী মানুষটির ওপর কত দৌরাত্ম করেছি, নির্বিকার চিত্তে আমার সব উৎপীড়ন ঔদ্ধত্য সহ্য করে গেছেন। সুযোগ পেলেই পুরোনো দিনের থিয়েটারের ইতিহাস শুনিয়েছেন, পুরোনো বন্ধু কেউ এলে সবার আগে আমায় ডেকে নিয়ে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। কত সময় বিব্রত বোধ করেছি, আমার চোখে মুখে অস্বস্তির ভাব দেখতে পেয়ে বলেছেন ঃ—কাজ আছে বুঝি? তবে যাও। আমার শুধু কথা বলতে ইচ্ছে করে, তাই বকে যাই। কাজ থাক্‌লে বলবে, কাজের ক্ষতি করে আমার আবোল তাবোল কথা শুনতে হবে না। কিছুদিন আগে একজন স্বনামধন্য সঙ্গীত পরিচালক বড়বাবুকে বলেছিলেন, তিনি একখানা নাটক্‌ পরিচালনা করতে চান্‌ স্টার থিয়েটারে। বড়বাবু রাজী হয়েছিলেন তাঁর প্রস্তাবে। আমায় ডেকে বললেন—ওঁর সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে। প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগেনি; কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে প্রকারান্তরে আমায় সেই সঙ্গীত পরিচালকের নির্দেশ মত তাঁর সহকারী রূপেই কাজ করতে হবে। সলিলবাবুকে এসে বললুম, এ প্রস্তাব আমি মর্যাদা হানিকর বলে মনে কচ্ছি, আমি আজই থিয়েটার ছেড়ে দেব। সলিলবাবু তখনই আমায় আটকে দিলেন, আমায় নিয়ে বড়বাবুর সামনে হাজির হয়ে বললেন ঃ

—ওঁর হাতে আমি থিয়েটারের সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি। এখন যদি অন্য কাউকে দিয়ে নাটক পরিচালনা করাবার ইচ্ছে হয়

আপনার, তবে শুধু উনিই চলে যাবেন না, আমাকেও থিয়েটার ছেড়ে দিতে হবে। এখন আপনার যা অভিরুচি তাই করতে পারেন।

বড়বাবুর উত্তরের অপেক্ষা না করে ছোট হাত-ব্যাগটি বাঁ হাতে ঝুলিয়ে সলিলবাবু ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন সেখান থেকে। বড়বাবু খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। যে বাবু জীবনে কখনো তাঁর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় নি, চোখ তুলে তাকায় নি—তার কাছ থেকে আজকের যা ঘটে গেল এ একেবারে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। একটু পরে আমায় বললেন ঃ

—তোমার সঙ্গে বাবুর কি ব্যবস্থা আমি সত্যিই জানতুম না। সঙ্গীত পরিচালকটির নাম করে বললেন ঃ ওঁকে আমি আজই বলে দিচ্ছি যে ওর প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যে নাটক মঞ্চস্থ করতে হয়, তুমিই কর। আর বাবুকেও আমার হয়ে একথাটি বলে দিও।

তারপর সাত দিন পেরিয়ে গেল। বাবুকে দেখি অত্যন্ত অন্যমনস্ক। বড়বাবুও নিচের টিকেট ঘরে আসেন, খানিকক্ষণ বসে থেকে চলে যান্। মুখখানি বড় ক্লান্ত, বিষণ্ণ বোধ হল। আমি বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম—ওঁর শরীরের কথা। ম্লান হেসে বললেন ঃ

—শরীর এ বয়সে যেমন থাকা উচিত, তাই আছে—ভালই আছি বলা যায়!

—তবে? চুপ করে তাকালুম ওঁর দিকে। উনি একবার লক্ষ্য করলেন। নাকের ডগাটা একবার বাঁ হাতে চুল্‌কে নিলেন, মনে হল একটু কাঁপছে যেন। অত্যন্ত পুরু চশমার কাঁচ, তার আড়াল থেকে গড়িয়ে পড়ল, দুফোঁটা চোখের জল। বড়বাবু রুমাল বার করে নাক চোখ পুছে ফেললেন। মিনার্ভা থিয়েটারের এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মঞ্চ-মালিক, থিয়েটার আগুন লেগে দাউ দাউ করে পুড়ে যাচ্ছে, যথা সর্বস্ব চোখের সামনে ছাই হয়ে যাচ্ছে, থিয়েটারের উল্‌টো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত যিনি নিজের

চোখে দেখলেন, একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল না, চোখের পাতা কাঁপল না, সব শেষ হয়ে গেলে জুড়ী গাড়ী করে যিনি বাড়ীতে ফিরে এলেন—সেই লৌহ মানবের গালের ওপর ঝরে পড়ল দুটি বড় বড় জলের ফোঁটা! নাক, চোখ মুছে রুমালখানি পকেটে রাখতে রাখতে বললেন ঃ

—আজ সাতদিন হল বাবুর মুখখানি আমি একটিবার দেখিনি!

খবরটা আমিও চাকর দরোয়ানের মুখে শুনেছিলুম। সেদিন-কার সেই ঘটনার পর বড়বাবু ঘুমিয়েছেন কিনা নিশ্চিত জেনে নিয়ে, তারপর পা টিপেটিপে সলিলবাবু তাঁর দোতলার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন, আবার সকাল বেলা বড়বাবু ঘুম থেকে ওঠবার আগেই নিঃশব্দে চোরের মত বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। বড়বাবুকে মুখ দেখাতে তাঁর সাহস হয় না। বড়বাবুর কথা শুনে আমি সলিলবাবুকে জোর করে ধরে নিয়ে এলুম।

সলিলবাবু অপরাধীর মত মাথা নিচু করে দাঁড়ালেন। কেউ কোনো কথা বললেন না। শুধু স্নেহ ব্যাকুল একটি শীর্ণ বাহু সলিলবাবুর মাথায় পিঠে তার স্পর্শটুকু রেখে দিল। আমার বুকের ওপর থেকেও সেই সঙ্গে একটি গুরুভার নেমে গেল। আমি স্বস্তি পেলুম। কৈশোর জীবনে দাদামশাই-এর ওপর বহু জুলুম করেছি। তারপর কর্ম-জীবনে প্রবেশ করে অতি দীর্ঘকাল যে মানুষটির ওপর আমার দৌরাত্ম্যের অন্ত ছিল না—আজ তিনিও বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন। শবদেহ বেষ্টিত শোকমগ্ন পরিজনবর্গের ফটো তুলতে ফটোগ্রাফার দাঁড়িয়ে আছে। আমি সরে দাঁড়াচ্ছিলুম, সলিলবাবু আমায় ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন সবার মাঝখানে। আমি তাঁর পরিজন হতে ভিন্ন নই!

॥ ছয় ॥

বড়বাবুর মৃত্যুর কিছু দিন পরেই আবার বেরিয়ে পড়লুম থিয়েটার ছেড়ে বাইরের মুক্ত হাওয়ায় কদিন ঘুরে আসব বলে। বছরে দু'চার দিন এভাবে চলে যাই, মধুপুর, রাঁচী, হাজারীবাগ বা দার্জিলিঙ। এবার গন্তব্য স্থান স্থির করলুম সমুদ্র তীরে ভিজাগাপট্টম্ বা ভাইজ্যাগ। ঠিক সমুদ্রের ওপরেই সেকালের ম্যাডান কোম্পানীর একটি প্রকাণ্ড বাড়ী। ওই বাড়ীতে নিচের তলায় এম, এল্, ব্যানার্জী এণ্ড কোং স্টিভাডোর আফিস্। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার নাট্য বিভাগের শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই ওখানে থাকতেন। প্রথমে উঠেছিলাম ওঁদের ওখানে। পরের দিন অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হল আমার ছেলেবলার বন্ধু বারীনের সঙ্গে। মাদ্রাজে সে এখন কাঠের কারবার করে, বেশ দু'পয়সা করেছে। কি একটা কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে দিন পাঁচসাত আগে ভাইজ্যাগে এসেছে। আমায় সে ধরে নিয়ে গেল তার হোটেলে। ঠিক হোটেল বলা চলে না। নিচে মদ বিক্রীর দোকান, সঙ্গে ছোট্ট হোটেল ও 'বার'। তার ওপরে বারীন একখানি ঘর ভাড়া নিয়েছে। ওপরে অন্য দুটি ঘরে অন্য প্রদেশের কারা রয়েছে। বারীনের ঘরে পাশাপাশি দু'খানি খাটে আমাদের দু'জনকার শোবার ব্যবস্থা হল। সেই দিনই বিকেল বেলা বারীনের সঙ্গে বেড়াতে গেলুম 'ডল্‌ফিন্‌স্ নোজ'-এ। সমুদ্র থেকে ছোট্ট একটি খাল বেরিয়েছে, খেয়া নৌকায় খাল পার হয়ে সামনে "ডল্‌ফিন্‌স্ নোজ"। নাকের মত আকৃতি একটি পাহাড় সমুদ্রের মধ্যে নেমে গেছে। পায়ে চলার পথ রয়েছে ওপরে ওঠবার জন্য। বেশ উঁচু পাহাড়, দস্তুর মত পরিশ্রম হয় ওপরে উঠতে। ওপরে উঠে দেখা হল এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ও একটি তরুণীর সঙ্গে। মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের পরনে অত্যন্ত মুল্যবান শেরওয়ানী ও চোস্ত্ পায়জামা। বেশ সম্ভ্রান্ত লোকই মনে হল। সঙ্গে তিনজন উর্দিপরা ভৃত্য। তরুণীটি মহারাষ্ট্র না মাদ্রাজ অঞ্চলের

কোনো পার্বত্য নারী—ঠিক বুঝতে পারলুম না। দীর্ঘাঙ্গী, নিটোল স্বাস্থ্য সম্পদের অধিকারিণী। মালকোঁচার মত করে পরা গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ীতে জানু পর্যন্ত আবৃত। গাঢ় সবুজের উপর সোনালী জরির কাজ করা কাঁচুলীর মত একটি ছোট জামা ঊর্ধ্বাঙ্গের উন্নত অংশকে বেষ্টন করে রয়েছে। তার ওপর খুব সূক্ষ্ম ওড়না, অত্যন্ত ফিকে নীল, অনেকটা ছাইরঙ বলে মনে হয়। ওড়না কখনো হাওয়ায় সরে যায়, আর গায়ের ওপর যখন লেপটে যায় তখন সেই তারুণ্য দীপ্ত দেহ সুষমাকে চোখের আড়াল করে দেয় না। অপলক চোখে তাকিয়ে মনে হয় সবুজ বনের মধ্যে সোনালতার লুকোচুরি, তার ওপর হাল্কা কুয়াসার আচ্ছাদন। সর্পিনীর মত অতি উজ্জ্বল দুটি চোখ, ঈষৎ ওল্টান সুপুষ্ট সরস ওষ্ঠ পুটে অশান্ত তৃষ্ণা! বৃত্তাকার বক্ষ বেষ্টনী থেকে গ্রীবা পর্যন্ত অনাবৃত মসৃণ অংশ যেন গ্রীক ভাস্করের মর্মর শৈলীর নিপুণ নিদর্শন। ভদ্রলোক হয়তো নেমে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দলটি আমাদের অতিক্রম করে নেমে গেল। বারীন আমার বাঁ হাতে চাপ দিল। লক্ষ্য করলুম তরুণীটি সবার অলক্ষ্যে ঈষৎ গ্রীবা বাঁকিয়ে অপাঙ্গে তাকাল। এক ঝলক বিদ্যুৎ বর্ষণ করে তর্‌তর্‌ করে নেমে গেল। বারীন সীগারেট কেস্‌ খুলে আমায় একটি সীগারেট এগিয়ে দিলে, দাঁতে চেপে ধরল আর একটি সীগারেট, ধোঁয়ার রিং তৈরী করতে করতে বলল "এক্‌স্‌কুইজিট্‌! তাই নয়?" আমি মাথা নাড়লুম, হ্যাঁ, সত্যই অপূর্ব!

ডল্‌ফিন্‌স্‌ নোজ-এর ওপর থেকে সামনে তাকিয়ে সমুদ্রের এ রূপ সত্যিই ভোলা যায় না। ক্রুদ্ধ গর্জনে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে, বিফল আক্রোশে ভেঙ্গে পড়ছে উচ্ছ্বসিত ফেন-তরঙ্গে। জেলেদের মাছ ধরবার অসংখ্য নৌকা ঢেউএর ওপর দুলছে। যেন এক ঝাঁক কালোরঙের সামুদ্রিক পাখী জলের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে।

—ছেলেবেলায় পদ্মার চরে নৌকায় বেড়ান মনে পড়ে? বারীনের দিকে তাকালুম। ও যেন অন্যমনস্ক, আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল:

—ওর একটা হিষ্ট্রী আছে, শুনবি ?

—কার ?

বারীন পেছনের পথে নিচের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল ঃ

—ঐ মেয়েটির। সঙ্গে যে লোকটিকে দেখলি, কোন একটা নেটিভ ষ্টেটের রাজা না প্রিন্স। ওই মেয়েটি হল ওর···। কথা অসমাপ্ত রেখে বারীন কৌতুকের হাসি হাসল। বুঝলুম ওর ইঙ্গিত। বারীন বলল ঃ

—আমাদের হোটেলের বারান্দা থেকে দেখা যায়, সোজাসুজি যে মস্ত বড় বাড়ীটি, ওখানে উঠেছে ওরা। অনেক কিছু দেখিছি। কাল শুনবি সব ! একটু বিরতির পর আমায় আঙ্গুল তুলে দেখাল ঃ

—দেখ···কাণ্ড দেখ !

দুটি নাবিক, শ্বেত দ্বীপবাসী, সঙ্গে এক মার্জার নয়নী। দুজনে সটান্ শুয়ে পড়েছে, দুজনের মাঝখানে দু-বাহুতে দেহ ভার রেখে আধ শোয়া অবস্থায় বসে আছে সেই অতি স্বল্প বসনা পিঙ্গল কেশী। দুটি "কুইন-অ্যানার" শূন্য পাত্র মাথার কাছে পড়ে আছে, এবার তৃতীয় পাত্রের সিলকরা মুখ খুলেছেন। উড়ন্তপরী, গোলাপ ফুল, ঈগল পাখী, এবং জাহাজের মাস্তুল শুদ্ধ উল্কি শোভিত হাত নেড়ে শ্বেতদ্বীপবাসী নাবিকদ্বয় নানাপ্রকার শপথ বাক্য উচ্চারণ করতে করতে মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠে বসছে আর মার্জার নয়নী কারুকে থুৎনি নেড়ে দিয়ে, কাউকে বা অর্ধ অনাবৃত দেহের ক্ষণিক স্পর্শ দিয়ে আবার শুইয়ে দিচ্ছে। মনে হল এই শ্বেতাঙ্গিনীকেই আমি একদিন রাত্রে দেখেছিলুম ম্যাডান কোম্পানীর সেই বাড়ীটির সিঁড়ির আড়ালে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে অত্যন্ত অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়, সঙ্গে এক মিলিটারী অফিসার। বারীন বলল ঃ

—চল্, হোটেলে ফিরে যাই ! এদের মতিগতি ভাল নয়, এখানে বেলা পড়লে অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। দুজনে নেমে এলুম পাহাড়ের ওপর থেকে।

পরদিন সকাল বেলা স্নান সেরে ঘরে এসে দেখি বারীন খোলা

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে কী যেন চিবুচ্ছে। শুকনো পাঁউরুটি নাকি! নাঃ, রুমাল! বিস্ময় বোধ হল। পা টিপে টিপে পেছনে এসে দাঁড়ালুম। ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে বাইরে তাকালুম। ওপাশের সেই বড় বাড়ীটির খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে কালকের সেই তরুণী! বারীন রুমালের প্রান্ত দাঁতে চেপে ধরেছে, তরুণীটি একখানি ওড়না দিয়ে প্রথমে মুখ মোছবার ভান করে ওড়নার প্রান্তটি দাঁতে চেপে ধরল। এইবার দু'জনে এক ঝলক নীরব হাসির বিনিময়। বারীন হাত বাড়িয়ে কী ইসারা করল বুঝলুম না। তরুণী এক মুহূর্ত জানালা ছেড়ে সরে গেল। তারপর একটি পাকা নাসপাতি এনে ঘুরিয়ে দেখাল, এবং নাসপাতি ওষ্ঠাধরে বুলিয়ে নিয়ে তার সরস কমনীয় দেহে দংষ্ট্রাঘাত করল। সশব্দে জানালা বন্ধ করে দিল। বারীন খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে পেছন ফিরে আমায় দেখতে পেয়েই দু'হাতে আমায় জড়িয়ে ধরল :

—তুই বড্ড "লাকি!" তুই এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সব প্রচেষ্টা সফল! কী খাবি বল? ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট? হোয়াইট লেবেল্? কুইন অ্যান্যা? বল্, কী অর্ডার দেব?

—এই সকাল বেলা!

—হ্যাঁ, এই সকাল বেলা! আজ সারাদিন!

প্রতিবাদ করলুম। বারীন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল :

—কেন? থিয়েটারে কাজ করিস্ অথচ ও জিনিসে স্পৃহা নেই—এই বলতে চাস্?

—স্পৃহা নেই বললে মিথ্যা বলা হবে। মাঝে মাঝে খাই। তবে দিনের বেলাও নয় কিংবা কারুর সঙ্গেও নয়। আমি পালন করি থ্রী গোল্ডেন রুলস্ অফ ড্রিংকিং। জানিস্ সে নিয়ম গুলো?

বারীন ঘাড় নেড়ে বললে, ও জানে না।

—সে নিয়মগুলো হল :

"ডোণ্ট ড্রিঙ্ক হোয়েন্ দী সান্ সাইনস্।

ডোণ্ট ড্রিঙ্ক উইদাউট্ প্লেন্টি অফ সোডা ওয়াটার। ডোণ্ট ড্রিঙ্ক ইন্ কম্পানী।"

লেখার সময় দরকার হয়, এক পেগ্ আধ পেগ্ খাই। একা, কারু সঙ্গে নয়।

—ওয়ার্থলেস্!···বারীন বিরক্ত হয়ে বসে পড়ল।

বিকেল বেলা কি একটা জরুরী দরকার আছে বলে বারীন বেরিয়ে গেল। আমি ম্যাডান কোম্পানীর বাড়ীতে শচীনবাবুদের ওখানে আড্ডা জমালুম। তার পরদিন এবং তৃতীয় দিনও তাই। আমার যেন কী রকম একটা সন্দেহ হল। বারীন যেন কী রকম ঠাণ্ডা মেরে গেছে, ক্লান্ত অথচ মুখে কি রকম একটা আত্ম-তৃপ্তির ছাপ। মনে হল, আমার কাছে কী যেন লুকোচ্ছে। স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলুম। লজ্জিত ভাবে একটু হাসল, তারপর বলল ঃ

—ডলফিন্স্ নোজের উল্টো দিকে, মানে ম্যাডাম কোম্পানীর সেই বাড়ীটা ছাড়িয়ে বাঁ হাতে সোজা চলে যাবি সমুদ্রের ধারে। অনেকগুলি বড় বড় কাঠ পড়ে আছে, সমুদ্রের ধারে। নুলিয়ারা রেখে দিয়েছে নৌকা তৈরী করবে বলে। ওগুলোও ছাড়িয়ে খানিকটা যাবি। সমুদ্রের মাঝখানে এলোমেলো পাথরের স্তূপ, মানে বাচ্চা পাহাড় মাথা উঁচু করে আছে। সন্ধ্যের সময় ঐদিকে গিয়ে লক্ষ্য করিস্। আমায় পাবি ওরই কাছে পিঠে।

বারীনের নির্দেশ মত পরদিন সেই দিকে গেলুম। একটি কাঠের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে বারীন। তার পাশে সেই তরুণীটি। বারীন ঈষৎ হেসে আমায় অভ্যর্থনা করল, পরিচয় করিয়ে দিল। মেয়েটির নাম মহাশ্বেতা, মালাবার কোস্ট-এ থাকে। ওর মা এককালে ও অঞ্চলে নাম করা বাঈজি ছিল। ইসারায় দেখিয়ে দিল সৈকতের ওপর দিকে। রামায়ণে বর্ণিত অশোকবনের চেরীর মত ঝুঁটি বাঁধা এক বৃদ্ধা তাম্বুল সেবা কচ্ছিল সেখানে বসে। বারীন বললে—ওই মহাশ্বেতার মা। ডল্ফিন্স্ নোজ-এ যেদিন বিকেলে দেখা হয়—ঐ রাত্রেই রাজা-বাহাদুর নাকি কি একটা বৈষয়িক কাজে

গঞ্জাম জিলার সমুদ্র নগরী গোপালপুরে চলে গেছেন। বারীন কী কৌশলে রাজার অনুপস্থিতির এই সুযোগে রাজ অনুগৃহীতা মালাবার সুন্দরীর সাহচর্য লাভে সক্ষম হল—সে প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করলুম না। কারণ, বারীনের নিজের মুখেই শুনেছি এককালের এই শান্তশিষ্ট ছেলেটি কর্মজীবনে ইতিমধ্যে বহু বিদেশিনীর মনোহরণ করেছে। এ বিদ্যাটি বারীন কলাবিদ্যা হিসাবেই অভ্যাস করেছে বলা অন্যায় হবে না। আমরা দু'জনে বাংলায় কথা বলছি, মহাশ্বেতা অপলক চোখে বারীনের দিকে তাকিয়ে আছে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চার দিকটা আবছা অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। সেই তরল অন্ধকারের মধ্যেও মনে হল মহাশ্বেতার চোখ দুটি সাপের চোখের মত জ্বলজ্বল করে উঠল। সর্বাঙ্গে বিষক্রিয়া সুরু হল, তার উত্তাপে অর্ধাবৃত বক্ষস্থল সঘনে দুলতে লাগল। বারীনের বামবাহু ধরে আচমকা সে এমন আকর্ষণ করল যে বারীন উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কোন রকমে টাল সামলে নিল। কিম্বদন্তী শুনেছি, বিরাট পাহাড়ীয়া সাপ ক্ষুধার্ত হয়ে মুখব্যাদান করে। অজগর, হরিণশিশু কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে সেই সাপের মুখবিবরে প্রবেশ করে। বারীনকে দেখে মনে হল সর্পিনী তেমনি মায়ামন্ত্র বলে তাকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। দশ পনের হাত দূরে জেলেদের একখানি নৌকা সমুদ্র সৈকতে বালির ওপরেই উল্‌টে পড়েছিল। ওরা ওই নৌকার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। একা একা সমুদ্রের পানে তাকিয়ে বসে আছি। সহসা একটা ঘূর্ণি হাওয়া ধেয়ে এল, সমুদ্রের ঢেউগুলি উদ্দাম বেগে আছড়ে পড়তে লাগল তটভূমির ওপর। কী উন্মাদ গর্জন, উজল ফেণোচ্ছ্বাসে সৈকতের ওপর ভেঙ্গে চূরমার হয়ে ছিটকে পড়ে হা হা শব্দে, সে যেন এক প্রলয় তাণ্ডব সুরু হল। ঘূর্ণি বেগে উঠল বালুকায় ঝড়। আকাশ আবৃত করে ফেলেছে সেই ধূলিঝঞ্ঝা। চোখ বুজে বসে আছি, কানে আসছে শুধু অবোধ্য হুংকার। খানিক বাদে ধূলি ঝড় থেমে গেল। সমুদ্র তরঙ্গ সৈকত সিক্ত করে নিচে নেমে গেল। আবছা আলোয় মনে হল দিগন্ত ছেয়ে একটা প্রশান্তি নেমে এসেছে।

বারীন কখন নিঃশব্দে এসে আমার পাশে বসেছে টের পাইনি। পিছনে স্বল্পালোকিত পথের পানে তাকিয়ে দেখলুম—দুটি নারী মূর্তি অস্পষ্ট ছায়ার মত মিলিয়ে যাচ্ছে দূর শহরের পথে।

পরদিন সন্ধ্যার পর সমুদ্র তীরে গিয়ে দেখি এক অদ্ভুত কাণ্ড। মহাশ্বেতা বালির ওপর লুটিয়ে পড়েছে, বারীনের কোলের মধ্যে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! কী ব্যাপার? শুনলুম, খবর এসেছে, রাজা বাহাদুর কাল ভোরেই ভাইজ্যাগ-এ ফিরে আসছেন। মহাশ্বেতা বারীনকে যে করে হোক্ কাল ভোরেই ভাইজ্যাগ ছেড়ে যেতে অনুরোধ করল। বুড়ো তবলচির মনে খানিকটা সন্দেহ হয়েছে। সুতরাং বারীনের আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। এই বলে আবার খানিকটা চুপ করে মুখ গুজে পড়ে থাকল বারীনের কোলে। জিজ্ঞাসা করলুম:

—রাজা বাহাদুর যদি কিছু টের পান তাহলে কী বিপদের আশঙ্কা কচ্ছ তুমি? মহাশ্বেতা মুখ তুলল:

—ও থানা পুলিশের ধার ধারে না। একেবারে গুম্ খুন করে ফেলবে। এর আগে এমনি আরও দুটো খুন হয়েছে। লাশ এমন পাচার করে দিয়েছে যে পুলিশ তার পাত্তাই পায়নি। গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল:

—শেষবার যে ছেলেটিকে গুলি করেছিল, তার দেহ টলে পড়েছিল আমারই কোলের ওপর। আমার ওড়না রক্তে ভিজে গিয়েছিল। সে নেই, তার রক্ত মাখা ওড়নাখানা আজও আমি লুকিয়ে রেখেছি। রূপ থাকলেই রূপেয়া পাওয়া যায়, কিন্তু দিলদার পাওয়া যায় কটি?...চোখ মুছে মহাশ্বেতা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দূর সমুদ্রের পানে। একসময় দূর হতে বুড়ীর গলার আওয়াজ শোনা গেল। মহাশ্বেতা চমকে উঠে বারীনের দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল। কণ্ঠে তার আর্ত কাকুতি:

—কাল ভোরেই তোমায় চলে যেতে হবে। মনে থাকে যেন।

আস্তে আস্তে মহাশ্বেতা ওপরে উঠে গেল। আর পেছন ফিরে

তাকাল না। আমরা হোটেলে চলে এলুম। ওধারে মহাশ্বেতার ঘরের জানালা বন্ধ, ফাঁক দিয়ে আলোর একটি সূক্ষ্ম বাঁকা রশ্মি কাঁপতে কাঁপতে বাইরে এসে পড়ছে, সতর্ক ইসারার মত। ভোরবেলা বারীন রওনা হয়ে গেল মাদ্রাজ। আমি চাপলুম কলকাতার গাড়ীতে। ট্রেণে বসে বারবার মনে পড়তে লাগল বারীনের কথা। আমাদের ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যে বারীন ছিল সবার চেয়ে শান্ত শিষ্ট ভালো ছেলে। মেয়েদের মুখের পানে তাকিয়ে কথা বলতে হলে বারীন লজ্জায় রাঙা হয়ে যেতো। সেই বারীন···!

॥ সাত ॥

কলকাতায় ফিরে এসে আবার পূর্ণোদ্যমে থিয়েটারের কাজে মন দিলুম। থিয়েটার বাঁচাতে হলে যেমন নতুন নাটক চাই, তেমনি চাই নতুন শিল্পী আবিষ্কার। এদিকটায় আমি বরাবর সজাগ থেকেছি। একবার একটি মেয়ে এসেছিল আমার কাছে, সুন্দর মুখশ্রী, বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল কচ্ছে। মেয়েটি ভাল নাচতে পারে শুনে আমি তাকে থিয়েটারে ভর্তি করে নিলুম। বেলুড় থেকে যাতায়াত করত স্টার থিয়েটারে। ক্রমে তার সঙ্গে আলাপ করে বুঝলুম তার ভেতর রয়েছে সত্যিকারের শিল্পী সত্তা। ভাল ছবি আঁকতে পারত। একবার ক্রিস্টমাস্-এ নিজের হাতে চিত্রিত একটি শুভ-কামনা লিপি সে আমায় উপহার দিয়েছিল। সে ছিল বড় আপন ভোলা। একদিন থিয়েটারে বসে সেপ্টিপীনের ডগা দিয়ে চোখ চুলকোতে গিয়ে চোখের মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়েছিল সেপ্টিপিন। বীডন স্ট্রীটের আই-স্পেশালিস্ট নিরঞ্জনবাবুর চেম্বারে পাঠিয়ে দিলুম তাকে থিয়েটারের গাড়ী করে লোক সঙ্গে দিয়ে। পাঁচ, ছ'দিন বাদে সে ভাল হয়ে উঠল। আমায় ধরল, শুধু নাচ নয়, এবার তাকে অভিনয়েও ভূমিকা দিতে হবে। তখন স্টার থিয়েটারে বেশীর ভাগ

অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত পৌরাণিক নাটক বা ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হত। আমি তাকে কথা দিয়েছিলুম, সামাজিক বই হলে তোমায় নিশ্চয়ই খুব ভালো ভূমিকায় নামবার সুযোগ দেব। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সামাজিক নাটকে তুমি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে পারবে। কিন্তু বছর খানেক কাজ করেই সে বসে গেল, তার আর কোনো খবর পাইনি। পরে জানলুম, বোম্বের চিত্রজগতে সে উদীয়মানা চিত্র তারকা। মেয়েটির নাম স্মৃতিরেখা বিশ্বাস্।

মহারাজা নন্দকুমার নাটকে যে ছেলেটি প্রথমে মীরকাশেমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়—সে আমার নিষেধ সত্ত্বেও থিয়েটারের কয়েকটি নিয়ম ভঙ্গ করে। আমি তার যায়গায় অন্য শিল্পী খুঁজতে লাগলুম। সঙ্গীত পরিচালক ধীরেন দাস মশাই একটি লোককে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর, বাচন ভঙ্গী আমার খুব ভাল লাগল। দু'তিন দিন থিয়েটারের দোতালায় আমার ঘরের সামনের ছাদে আমি তাঁকে মীরকাশেমের ভূমিকা মহলা দিলুম, তারপর ঐ ভূমিকায় তাঁকেই নির্বাচিত করলুম। নন্দকুমার বই-এর শেষ রাত্র পর্যন্ত, অর্থাৎ দু'শো রাত্রের ওপর, তিনি মীরকাশেমের ভূমিকায় প্রচুর খ্যাতি অর্জন করলেন। তারপর টিপুসুলতান নাটকে তাঁকেই দিলুম টিপুর ভূমিকা। প্রায় ৪০।৪৫ রাত্রি অভিনয়ের পর বোম্বের এক চিত্র প্রযোজক তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রচুর অর্থ দিয়ে বোম্বে নিয়ে যেতে চাইলেন। শিল্পী আমায় সব ঘটনা খুলে বললেন। আমি তাঁকে নির্দেশ দিলুম অবিলম্বে বোম্বে চলে যেতে। অভাবক্লিষ্ট বাঙলার দরিদ্র শিল্পীর সংসারে যদি সাচ্ছল্য আসে, শুধু এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু শিল্পীটির সঙ্গে স্টার থিয়েটারের ছিল বহুদিনের কন্ট্রাক্ট। তাই নিরুপায় শিল্পী আমার মুখের পানে তাকালেন। আমি তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললুম ঃ

—আপনাকে এখানে এনেছি আমি। যদি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে কারু কাছে কোনো জবাবদিহি করতে হয়—সেও করব

আমি! জীবনে এত বড় সুযোগ এসেছে আপনার। সে সুযোগ আমি নষ্ট হতে দেব না।

শিল্পীটির সামনেই আমি তাঁর কনট্রাক্ট বার করে ছিঁড়ে ফেললুম। তিনি নিশ্চিন্ত মনে বম্বে চলে গেলেন সেখানকার চিত্র জগতে যোগদান করতে। ইনি আজ বোম্বের প্রখ্যাত শিল্পী এবং চিত্র প্রযোজক। নাম এঁর শ্রীবিপিন গুপ্ত।

বিপিনবাবু বোম্বে চলে গেলে যে নবাগত শিল্পীকে টিপুর চরিত্রে নির্বাচিত করলুম—তাঁকেও বিপিনবাবুই এনে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের দীর্ঘ দেহ, ভাব-গম্ভীর কণ্ঠ স্বর। তাঁর অভিনয় ক্ষমতা যাচাই করে নিয়েছিলুম—কেদার রায় নাটকে তাঁকে মুকুট রায়ের চরিত্র চিত্রণের দায়িত্ব দিয়ে। ঐ ভূমিকার রূপারোপে বুঝতে পেরেছিলুম এঁর অভিনয় দক্ষতা অসাধারণ। বিপিনবাবু বোম্বে যাবার সময় বারবার আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর অবর্তমানে টিপুর ভূমিকায় কাকে নির্বাচিত কচ্ছি। আমি হেসে জবাব দিয়েছিলুম,—আপনি যাঁকে কিছুদিন আগে থিয়েটারে এনেছিলেন সেই ভদ্রলোককে। বিপিনবাবু আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন ঃ

—ছেলেটি বহুদিন থিয়েটারে ঢোকবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনো রঙ্গমঞ্চে স্থান পায়নি! আপনি ওকে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে প্রথম সুযোগ দিয়েছেন। ও আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র বলেই বলছি—টিপুর মত অত বড় চরিত্র চিত্রণের দায়িত্ব ওকে এখনি দেবেন না। কারণ, ও যদি অত বড় দায়িত্ব বহন করতে না পারে, আপনার বিরক্তি উৎপাদন করবে। ফলে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের দ্বার ওর পক্ষে আবার রুদ্ধ হয়ে যাবে।

আমি হেসে জবাব দিলুম ঃ

—আচ্ছা, এবিষয়ে আমি যথেষ্ট ভেবে, তারপর যা হয় করব। বিপিনবাবু বোম্বে চলে গেলেন। আমি কিন্তু ঐ ভদ্রলোককেই টিপুর ভূমিকায় নামালুম। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নবাগত হলেও

ঐ চরিত্রের রূপদানে উনি সক্ষম। আমার আশা নিষ্ফল হয়নি। দু'শো রাত্রের ওপর তিনি সাফল্যের সঙ্গে টিপুর চরিত্রাভিনয় করেছেন। তারপর "কঙ্কাবতীর ঘাটে" নন্দুয়ার চরিত্রে তাঁর অভিনয় দেখে মিনার্ভা থিয়েটার তাঁকে তিনগুণ বেশী মাইনে দেবে প্রস্তাব করে পাঠাল। ভদ্রলোক আমার মতামত চাইতে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মুক্তি দিলুম। ইনি বর্তমান বাঙলার সুখ্যাত চরিত্রাভিনেতা শ্রীকমল মিত্র।

কমলবাবু চলে যাবার পর তাঁর যায়গায় আমি যে নবাগত শিল্পীটিকে মনোনীত করেছিলুম, তিনি কমলবাবুর চেয়ে দীর্ঘকায় পুরুষ, অমন জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমি ইতঃপূর্বে কখনো শুনিনি। "শতবর্ষ আগে" নাটকে তাঁকে আমি নানাসাহেবের ভূমিকা দিয়েছিলুম। আর কেউ ডাকবার আগেই স্বয়ং মহাকাল তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল। ভদ্রলোকের নাম ছিল ভূপাল সেন।

"শতবর্ষ আগে" নাটকে আরও দু'জন নবাগত তরুণকে আমি স্টার থিয়েটারে সুযোগ দিয়েছিলুম। একজন গৌরকান্তি সুগঠিত দেহ, দৃষ্টি ঈষৎ স্বপ্নাতুর। তাঁর আবৃত্তি শুনে আমার খুব ভাল লেগেছিল। শিল্পীটি কিছুদিন অভিনয় করে নিজের খেয়ালেই হঠাৎ ডুব মেরে বসলেন। ইনি আজ চিত্রে ও মঞ্চে সমান সাফল্য অর্জন করেছেন। এর নাম ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রখ্যাত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্য শিল্পীটি ছিলেন শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারা, চোখের দৃষ্টিতে প্রখর আত্ম-প্রত্যয়ের আভাস। "শতবর্ষ আগে" নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র বিদ্যাসাগর রূপে আমি তাঁকে নির্বাচিত করলুম। পঞ্চাশৎ অথবা শততম রজনীর অভিনয় উৎসবে, কবে আমার ঠিক মনে নেই, একদিন অনুপস্থিতির জন্য তিনি পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন। এই অভিমানে তিনি থিয়েটার ছেড়ে চলে গেলেন। বর্তমান বাঙলার মঞ্চ ও চিত্রজগতের কীর্তিমান এই শিল্পীর নাম শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাঁরা লব্ধ প্রতিষ্ঠ—তাঁদের নিয়ে আমি থিয়েটার চালাতুম না! আমি স্টার থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবার আগে মাত্র কয়েকমাসের জন্য নটসূর্য এবং নাট্য সম্রাজ্ঞীকে বরণ করে এনেছিলুম স্টার থিয়েটারে। তাছাড়া আমার সুদীর্ঘ পরিচালক জীবনে আমি সর্বদা নতুন প্রতিভার সন্ধান করে এসেছি। সফল হয়েছি বহু ক্ষেত্রে। "স্বর্গ হতে বড়" নাটকে অমরেশের চরিত্রে রূপদানের জন্য যোগ্য নূতন শিল্পী না পেয়ে বাধ্য হয়ে একজন এই চরিত্রে মঞ্চাবতরণ করল। তার নাম খবরের কাগজে বা প্রাচীর পত্রে প্রচারিত হল না। বন্ধু-বান্ধব যাঁরা, তাঁরা অভিনেতাকে চিনলেন। কিন্তু সাধারণ দর্শকদের নিকট হতে তাগিদ এল অভিনেতার নাম প্রকাশ করতে। অগত্যা প্রচার করা হল, অমরেশ চরিত্রে রূপদান করেছি আমি নিজে। হ্যাঁ, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নটরূপে ঐ আমার প্রথম আবির্ভাব। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে। সেই থেকে রাজসিংহ, কালিন্দী, মা, নৌকাডুবি প্রভৃতি স্টারের প্রত্যেকটি নাটকে আমি পরিচালক এবং নটরূপে আত্মপ্রকাশ করেছি।

"স্বর্গ হতে বড়" নাটক দেখতে এসেছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশাই। উত্তরা নাটক নিয়ে তাঁর সংস্পর্শে এসে নাট্য-জগতে আমি প্রবেশ অধিকার পেলুম। অথচ এমনি দৈবের বিধান সে উত্তরা নাটক তিনি অভিনয় করতে পারলেন না। কঙ্কাবতীর ঘাট নাটকে মিঃ মুখার্জীর চরিত্রটি লিখেছিলুম তাঁর জন্য। সে চরিত্রে রূপদান করলেন নির্মলেন্দু নন, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। যাই হোক, আমার নাটকে অভিনয় করবার যোগাযোগ না ঘটলেও তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরের সম্পর্কটি শেষ দিন পর্যন্ত এতটুকু বিকৃত হয়নি। আমার অভিনয় দেখে লাহিড়ী মশাই বললেন:

—অনেকের মুখে শুনেছি, তোমার অভিনয় ধারা নাকি আমার মত। কিন্তু কৈ, আমি তো আমার মত কোথাও পেলুম না! এক কণ্ঠস্বরের কথা বলা যেতে পারে—অনেকটা সাদৃশ্য আছে আমাদের।

কিন্তু বাচন-ভঙ্গি তো আমার মত মনে হ'ল না। বরং কবিতা আবৃত্তির অংশগুলিতে স্থানে স্থানে মনে হয়, যেন শিশিরবাবুর প্রভাব রয়েছে। তুমি কি বল?

আমি বললুম:

—এক টাকার টিকিট কিনে আপনার আর শিশিরবাবুর অভিনয় ছাত্র জীবনে অনেক দেখেছি, কোনো বই দেখা বাদ দিয়েছি মনে পড়ে না। কার প্রভাব কতটুকু এসেছে—আমি নিজে কেমন করে বলব? যাঁর যেটুকু ভালো লেগেছে, নিঃসংকোচে হজম করেছি।

লাহিড়ী মশাই মাথা নেড়ে বললেন:

—অভিনয় দেখে দেখে তুমি অভিনয় শিক্ষা করেছ। এই শিক্ষাই সত্যিকারের শিক্ষা।

তারপর কৌতুক করে বললেন:

—শিশিরবাবুকে নয়। যদি একটু আধটু অনুকরণ করতে হয়—আমাকেই কোরো। তবু মরবার সময় মনে ভাবব আমার একজন ছাত্র রইল।

কথা শেষ করেই লাহিড়ী মশাই হো হো শব্দে প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠলেন। তিনি আজ নেই—সেই শিশুর মত প্রাণ খোলা হাসি আজও যেন কানে বাজে। থিয়েটারের আবহাওয়া তাঁর কোনো দিন ভাল লাগত না। সরল বিশ্বাসের বিনিময়ে আজীবন পেয়েছেন শুধু বঞ্চনা। মরবার সময় অচল টাকা, সিকি, দুয়ানি ভর্তি একটি থলে রেখে গেছেন। অচল জিনিস দিয়ে কেউ তাঁকে ঠকালে, তিনি তা আলাদা করে রেখে দিতেন, আর কারুকে দিতেন না। নিজে যে বঞ্চনা পেয়েছিলেন, সে ছিল তাঁর বেদনার সঞ্চয়, সে সঞ্চয় তিনি আর কাউকে ফিরিয়ে দিয়ে যান নি।

আর একজন শিল্পীর কথা বলা হয়নি। য়ুরোপীয় চরিত্র চিত্রণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট ভূমেন রায়ের কথা। মহারাজা নন্দকুমার নাটকে ক্লেভারিং-এর চরিত্রে রূপদানের জন্য এই দক্ষ শিল্পী স্টারে যোগদান

করেছিলেন। মৃত্যুর ছ'মাস পূর্বেও তিনি স্টারে নিয়মিত অভিনয় করেছেন। বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে নট হিসাবে খ্যাতি অর্জনের পূর্বে এঁর কর্ম-জীবনের পরিচয়—ইনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের পর কাষ্টমস্ অফিসে ভালো চাকরি পেয়েছিলেন। প্রচুর রোজগার করতেন সে সময়। ওঁর মুখেই শুনেছি, কাষ্টম্স্-এ চাকরি করবার সময় সৌখীন নটরূপে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সুরু করেন। তারপর বহু বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের শেষ অধ্যায় বড় মর্মান্তিক। ভূমেন রায়ের জীবন কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে মহাকবি মাইকেলের কথা। ত্ব'হাতে অজস্র অর্থ কাজে অকাজে ব্যয় করে দারিদ্র্য এঁদের কোনোদিনই ঘুচল না। মহাকবি মাইকেলের মত ভূমেন রায় শেষ জীবনের সব জ্বালা ভুলে থাকতে চেষ্টা করতেন শুধু মদ্যপান করে। পূজোর সময় বাড়িতে বাজার আসবে কিনা—ছেলেমেয়ে ত্ব'টি খেতে পাবে কিনা, তার স্থিরতা নেই, কিন্তু রাজামহারাজার মত থিয়েটারের সমস্ত নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের কাপড় বিলিয়েছেন ভূমেন রায়। অনেক সময় ধার করেও এ কাজটি করেছেন। হাতে টাকা এলে সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ হয়ে গেল রাজাবাদশার মত, অবিশ্যি পরদিন হয়তো সব উড়িয়ে দিয়ে উপবাসেই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। অমিতাচারী, অমিতব্যয়ী এই লোকটি জীবনের সর্বক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসে, দয়ায় দাক্ষিণ্যে। হাতের মুঠো যখন খুলে দিয়েছেন—শেষ কপর্দকটিও নিঃশেষ হবার আগে ইনি কখনো হাত গুটিয়ে নেন্ নি। তাই এঁর সৌভাগ্য-লক্ষ্মী হয়তো দেউলে হয়ে যাবার ভয়ে নিজেই হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন এঁর জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কে।

মনে পড়ে 'রায়গড়' নাটকের উদ্বোধন রাত্রি। ভূমেন রায় 'অগষ্টাস্ পেড্রো'। নাটক সুরু হবার আগে ভূমেন রায়ের সাজবার ঘরে গিয়ে দেখি—এত মদ্যপান করেছেন যে রূপসজ্জাকর মাথায় চুল পরাতে হিম্‌সিম খেয়ে যাচ্ছে। মাথা বারবার টলে পড়ছে। অবস্থা দেখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বালা করতে লাগল। এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান

নেই লোকটার! প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অত বড় চরিত্রে রূপদান করতে হবে—এতটুকু খেয়াল নেই!

—বাঃ ভূমেনবাবু! চমৎকার!

গলার আওয়াজ শুনে ভূমেনবাবু একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, আমি বাধা দিলুম ঃ

—যথেষ্ট হয়েছে! কিছু জানতে চাইনা।

হন্ হন্ করে বেরিয়ে এলুম ওঁর সাজবার ঘর থেকে। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে ভূমেন রায় কোনো রকমে টলতে টলতে এলেন। স্মারককে বললেন—ওঁর সীনে বেরুবার সময় ধাক্কা দিয়ে বা'র করে দিতে। যথা সময়ে স্মারক ওঁকে বা'র করে দিল। টাল্ খেয়ে সীনে পড়ে যাচ্ছিলেন প্রায়। কোনো রকমে টাল্ সামলে নিয়ে ঠিক সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়ালেন। তারপর সেকি অপূর্ব অভিনয়! সে কি অপরূপ ভাবব্যঞ্জনা! কে বলবে—লোকটা একটু আগে বেহুঁস্ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল! পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগার বারবার করতালি ধ্বনিতে সম্বর্ধনা জানাতে লাগল তাদের পরমপ্রিয় শিল্পীকে। মঞ্চে ওকে এতটুকু মাতাল দেখলুম না। উনিই মাতাল করে দিলেন সারা প্রেক্ষাগৃহটিকে।...

ছোটবাবু অর্থাৎ জ্ঞান মিত্র মশাই-এর মত ভূমেন রায় একদিন তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অভিনেতা জয়নারায়ণ মুখার্জিকে কাটবার জন্যে। স্টারে সেদিন প্রতাপাদিত্য অভিনয় হচ্ছিল। ভূমেন রায় রডা, জয়নারায়ণ মুখার্জি বসন্ত রায়। কি নিয়ে দু'জনে কথা কাটাকাটি হয়েছে। অভিনয় অন্তে ভূমেন রায় একখানি আসল তলোয়ার নিয়ে তাঁর সাজবার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন—কথার পরিবর্তে এবার জয়নারায়ণবাবুর মাথা লক্ষ্য করে। খবর পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলুম।

—ঘরে যান ভূমেনবাবু! আমি যতক্ষণ না বলব ঘর থেকে বেরুবেন না।

নীরব সম্মতি জানিয়ে ভূমেন রায় তাঁর সাজবার ঘরে চলে

গেলেন। জয়নারায়ণ মুখার্জিকে ইসারা করতে তিনিও থিয়েটারের ফটক পার হয়ে চলে গেলেন। রাত তখন অনেক হয়েছে। ওপরের ঘরে বসে একখানি নতুন নাটক লিখছি। আশে পাশের বাড়িগুলোর আলো নিভে গেছে, গোটা হাতীবাগান পাড়াটাই প্রায় নিঝুম হয়ে এসেছে। থিয়েটারের দোতলায় আমার ঘরের সামনের ছাদে এসে হঠাৎ লক্ষ্য হ'ল নিচে ভূমেন রায়ের ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাত্রে এঘরে আলো কেন? তবে কি চাকর-বাকর কেউ দরজা বন্ধ করবার সময় আলো নেভাতে ভুলে গেছে! ডাক শুনে বাবুলাল ওপরে এসে বলে, ভূমেনবাবু ঘরে বসে আছেন, তাই আলো নেভায় নি।

—ভূমেনবাবু! এত রাত্রে থিয়েটারে! কেন? কি কচ্ছেন?

জবাব এল: চুপ করে বসে আছেন।

নেমে গেলুম নিচে—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম:

—এখনো বসে রয়েছেন কেন ভূমেনবাবু?

শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন উনি:

—আপনি না বললে ঘরে থেকে বেরুতে নিষেধ করেছিলেন, তাই বসে আছি!

হাতের ঘড়ি দেখলুম, রাত তখন দু'টো পঁচিশ। এতটুকু নেশা করেন নি, সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষটি ঠায় বসে আছেন। খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত হয়নি। লজ্জায় যেন মরে গেলুম। ওঁকে জব্দ করতে গিয়ে সেদিন জব্দ হয়েছিলাম আমি নিজে।

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে থেকেই স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে অনিয়মিত অভিনয় করতেন। শেষে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। সলিলবাবুকে বলে স্টার থিয়েটার থেকে কিছু কিছু সাহায্য পাঠাতুম। তারপর একদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে এল ভূমেন রায়ের মৃত্যু সংবাদ, আর সেই সঙ্গে খবর এল শবদেহ সৎকারের সামান্য অর্থ সংস্থানও নেই। শেষকৃত্যের জন্যে যা প্রয়োজন স্টার থিয়েটার থেকে দক্ষিণেশ্বরে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিলুম। বাংলার এই জনপ্রিয় শিল্পীর এই শোচনীয় পরিণতি

চোখে দেখবার জন্যে আমি বা সলিলবাবু কেউ শ্মশানে উপস্থিত হইনি। শুনেছি অনেকে রজনীগন্ধার স্তবক দিয়ে মৃত শিল্পীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন এবং আমরা পুষ্প স্তবক নিয়ে উপস্থিত হইনি বলে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কি করব? যাইনি, যেতে পারিনি। শিল্পীর মৃত দেহের ওপর স্তূপাকারে বর্ষিত শাদা শাদা রজনীগন্ধা আর যুঁই ফুলের কথা ভাবতে, মনে পড়ে যায়—শাদা শাদা ভাতের কথা। জীবিত কালে শিল্পী ও তাঁর পুত্র কন্যাদের সামনে ঐরকম শাদা ভাতের থালা যদি চারদিক থেকে এগিয়ে আসতো তবে শুধু ভূমেন রায় নন—বাংলার অনেক শিল্পীকেই অতি শোচনীয় অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হ'ত না।

মৃত্যুর করাল ছায়া সামনে এসে পড়েছে, কথা জড়িয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা পাশে বসে কাঁদছে। ভূমেন রায় জীবনের সেই শেষ লগ্নে আমার উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন, ছেলেমেয়েদের বলেছিলেন —আমার জন্য দরজা খুলে দিতে। আমি জানি, তাঁর মনের দরজা আমার জন্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খোলাই ছিল। পুষ্প সুরভিত সে মন, ফুলের সেখানে অভাব নেই। আমি তাকে কি ফুল দেব?

॥ আট ॥

ভূত বিশ্বাস করেন? করেন না? না করবারই কথা। কারণ, শতকরা নিরানব্বুই জনই বিশ্বাস করেন না। ভূত মানেই তো অতীত। অতীতকে কে বিশ্বাস করে এ যুগে? কেই বা অতীতকে নিয়ে মাথা ঘামায়? আমার মত অনেকেই, যাঁরা মঞ্চের সংস্রব অনেকটা ছেড়ে দিয়েছেন, আজ অতীতের কোঠায় গিয়ে ভিড় জমিয়েছেন তাঁরা। জীবিত থেকেও আমরা অনেকে আজ প্রায় অস্তিত্বহীন। জীবিত মানুষেরই যখন এই দশা হয়—তখন মৃতের অস্তিত্ব এযুগে কেই বা স্বীকার করবে? তবে এখনও কলকাতার

জনস্রোতের মধ্যে, পথে, বাসে, ট্রামে দু'একজন আমাদের দেখে হঠাৎ চমকে উঠে যেমন করে ঘাড় ফেরান, আমাদের পূর্ব-অস্তিত্বের কথা দমকা হাওয়ার মত এক ঝলকে তাঁদের স্মৃতির পাতায় এলোমেলো ভাবে নাড়া দিয়ে যায়—ঠিক তেমনি করে মৃতজনের উপস্থিতি এবং সান্নিধ্য মাঝে মাঝে অনুভব করেছি। সেই অবিশ্বাস্য কথাই এবার বলব।

যতদিন স্টার থিয়েটারে ছিলুম, দিন এবং রাত্রির অনেকখানি সময় কাটত থিয়েটারে, আমার দোতলার ঘরটিতে। সকাল আটটায় থিয়েটারে যেতুম, সাড়ে বারটা—একটায় বাড়ি ফিরতুম। আবার বেলা দুটো আড়াইটে থেকে রাত বারটা একটা পর্যন্ত থিয়েটারেই কেটে যেত। আমি স্টারের নট, নাট্যকার এবং নাট্য পরিচালক ছিলুম। তা ছাড়া বিজ্ঞাপন লেখা, প্রাচীর পত্রের ডিজাইন করে দেওয়া, শিল্পী নির্বাচন করা, শিল্পীদের পারিশ্রমিক ঠিক করা, মঞ্চ-শিল্পী, নৃত্য-শিল্পী, সুর-শিল্পী নির্বাচন করা, এমন কি নূতন নাটকের সাজ-সজ্জার জন্য দর্জি সঙ্গে নিয়ে বড়বাজারে গিয়ে কাপড় বাছাই করে কেনা এসব কাজই আমাকে করতে হ'ত। তাই দিন রাত্রির অধিকাংশ প্রহরগুলি থিয়েটারেই পার হয়ে যেত। নতুন নাটক লেখা? ও কাজটিও থিয়েটারের দোতলার ঘরেই হ'ত। কখনও নিজে লিখতুম। কখনও বা আমি পায়চারি করতে করতে মুখে বলে যেতুম, থিয়েটারের স্মারক ৺বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, হাবুলদা নামেই মঞ্চে এবং বেতার জগতে যাঁর সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল—তিনি আমার ডিকটেশন অনুযায়ী নাটকের পাণ্ডুলিপি রচনা করতেন। এই ভাবে অনেক দিন কখন যে থিয়েটারের ঘরে রাত শেষ হয়ে গেছে, টের পাইনি। স্টার থিয়েটার ছেড়ে যখন মিনার্ভায় গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নাটকে দুটি নূতন অঙ্ক আমি রচনা করেছিলুম এবং গুরুদাস-মলিনা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ভাবে মিনার্ভায় মঞ্চস্থ করেছিলুম তখন একদিন একটি মজার ব্যাপার ঘটে গেল। স্মারক শচীন ভট্টাচার্য এবং মিলন দত্ত কাগজ কলম নিয়ে বসে আছেন, আমি নাটকের

দৃশ্যের পর দৃশ্য মুখে মুখে রচনা করে যাচ্ছি। একজন লেখক ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করেন, অন্যজন আবার লিখতে সুরু করেন, আমি অনর্গল বলে যাচ্ছি। এক সময় ওঁরা দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কলম থেমে যেতে, আমি আচমকা তাকিয়ে দেখি অপরিসীম ক্লান্তিতে ওঁদের চোখে মুখে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে।

আমার পানে তাকিয়ে শচীনবাবু বললেন :

—একটু ছেড়ে দেন তো চা খেয়ে নিই।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম :

—এই গভীর রাত্রে কোথায় চা পাবেন? মিলন দত্ত এবার লাফিয়ে উঠলেন :

—গভীর রাত মানে?

পূর্ব দিকের জানালাটা সশব্দে খুলে গেল। এক ঝলক রোদ এসে পড়ল ঘরের মাঝখানে। ঘড়িতে দেখলুম সকাল আটটা বেজে গেছে। লজ্জিত হয়ে ওঁদের সেদিনকার মত খাতা পত্তর গুটিয়ে নিতে বললুম। তাড়াতাড়ি বাড়ি রওনা হলুম।

ভূতের কথা বলছিলুম। প্রাত্যহিক অভ্যাস মত সেদিনও অনেক রাত অবধি স্টার থিয়েটারে বসে একা একা কাজ কচ্ছি। হঠাৎ মনে হল নিচে, স্টেজের দিক থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। সমবেত কণ্ঠের গান, কোরাস্ মেয়েদের গান। গোটা পাড়াটা প্রায় নিঝুম হয়ে গেছে। থিয়েটারের চাকর দরোয়ান সব ঘুমিয়ে পড়েছে। এসময় গান গায় কা'রা? আমার বসবার ঘরের ডান দিকে একটা কাঁচের জানালা ছিল। মঞ্চে অভিনয়ের সময় কোন রকম গোলমাল হচ্ছে কিনা দেখবার জন্যে ঘরে বসে আমি ওই জানালাটা খুলে দিতুম। ওখান থেকে সবার অলক্ষ্যে বেশ স্পষ্ট ভাবে স্টেজের ওপর কি হচ্ছে দেখতে পেতুম। সেই জানলা খুলে দিলুম। একটা পাঁচশ' পাওয়ারের বাল্ব স্টেজের এক কোণে জ্বলছে, প্রকাণ্ড স্টেজটাকে আলো আঁধারিতে পরম রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। ভালো

করে তাকিয়ে দেখলুম। না, কোথাও কিছু নেই। গানও থেমে গেছে মনে হ'ল। জানালা বন্ধ করে দিলুম। খানিক বাদে আবার শব্দ উঠল। এবার গান নয়, নর্তকীদের ছন্দোবদ্ধ ঘুঙুরের শব্দ। কখনো জোর আওয়াজ, কখনও বিলম্বিত লয়ে মৃদু মৃদু ধ্বনি! দু'চার কলি গানের পর, সেই গানের কথাকে যেন ঘুঙুরের লীলায়িত ছন্দে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। জানালা খুলে দিলুম। এবারও কিছু দেখতে পেলুম না। ঘুঙুরের আওয়াজও মিলিয়ে গেল। জানালা বন্ধ করতে আবার সেই ঘুঙুরের বোল! চুপ করে বসে স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনতে লাগলুম। শুধু গভীর রাত্রে নয়, মাঝে মাঝে দুপুর বেলাও ঐ নাচের শব্দ শুনেছি। দু'একদিন সলিলবাবুর ঘরে বসে বেলা দুটো, আড়াইটার সময় ঐ শব্দের দিকে সলিলবাবুর মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। সলিলবাবু বলতেন, বাড়ি পুরোণো হয়ে গেছে, মন্দিরের মত প্রকাণ্ড চূড়ায় অনেক ইস্পাতের পাত, লোহা লক্কড় আল্‌গা হয়ে গেছে, ওর ভেতর হাওয়া ঢুকে ওই রকম আওয়াজ হচ্ছে। সলিল-বাবু ষোল আনা বস্তু-তান্ত্রিক লোক। ভাব বিলাস বা কল্পনার বালাই ওঁর মধ্যে এক তিল নেই। উনি যা অনুমান করেছেন, যুক্তির দিক দিয়ে বিচার করবেন যাঁরা—তাঁরা প্রত্যেকেই হয় তো ঐ কথাই বলবেন।

কিন্তু কেন জানিনা, আমার মন ও যুক্তিতে সায় দিতে পারে নি। আমার কি মনে হয় জানেন? আগের কালে থিয়েটারে যেসব মেয়েরা নর্তকীর কাজ করত—তাদের সকলকেই পতিতা সম্প্রদায় থেকে সংগ্রহ করা হ'ত। স্টারের ভূতপূর্ব নৃত্যাচার্য সাতকড়ি গাঙ্গুলী মশাই রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত কলকাতার জঘন্য পল্লীগুলিতে একা একা ঘুরে বেড়াতেন। পাহাড়াওয়ালা হাঁক দিচ্ছে, বেলফুলের মালাওয়ালা বুড়োবাবুকে শীতের রাত্রে একা একা ঘুরতে দেখে একটু রসিকতা করে যাচ্ছে, কোনো মাতাল এসে হয়তো হঠাৎ জাপটে ধরছে—সাতকড়িবাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঘের দুরন্ত শীতে গ্যাসপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে একটির পর একটি বিড়ি

পোড়াচ্ছেন, আর সামনের বাড়ির দোতালার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। দোতালায় যে মেয়েটি নিশি-সঙ্গীদের খুশী করবার জন্য গান গাইছে, নাচছে—তার মুখখানা যদি একটিবার দেখতে পাওয়া যেতো! মেয়েটি নাচে গায় ভারী সুন্দর। নোটবইএ বাড়ির নম্বর টুকে নিয়ে এলেন সাতকড়িবাবু ওরফে কড়িবাবু। পরের দিন গাড়ি পাঠিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে এলেন থিয়েটারে। এইভাবে সংগ্রহ হ'ত ব্যালেগ্রুপ্। তারা পেটের দায়ে অন্ধকারে দেহ বিক্রয় করত। যেটুকু আলোর আভাস পেত সে শুধু থিয়েটারে। তাদের অন্ধকার জীবনের মুক্তবাতায়ন ছিল থিয়েটার। খোলা আকাশ বাতাসের সন্ধান পেত তারা এই বাতায়নে দাঁড়িয়ে। থিয়েটারের সঙ্গে ছিল তাদের প্রাণের বন্ধন। মৃত্যুর পরও সে বন্ধন শিথিল হয়নি। যে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিশপ্ত জীবনে একটুখানি আনন্দের আস্বাদন পেয়েছে, মৃত্যু কি সেই মঞ্চকে ভুলিয়ে দিতে পারে? তাদের বিদেহী আত্মা তাই সকলের অলক্ষ্যে মঞ্চের ওপর নৃত্য-ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। ঠিক যেমন করে বেজে ওঠে জরাজীর্ণ পুরোনো জমিদার বাড়িতে খট্‌খট্ খড়মের আওয়াজ। পোড়ো আস্তাবলের দিক থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। জমিদারী গেছে, পুরোনো জমিদার বাড়িগুলোও ভেঙ্গেচুরে কংক্রিটের হালফ্যাশানের বাড়ি তৈরী হয়েছে, কোলাপ্‌সিবেল গেটওয়ালা মোটর-গ্যারেজ। তাই খড়মের আওয়াজ নেই,—নেই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। গিরিশ, অর্দ্ধেন্দু, বিনোদিনী, তিনকড়ির যুগের পুরোনো বাড়িগুলোও আজ ক'বছর হ'ল ভোল পাল্‌টেছে! আধুনিক রুচি অনুযায়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমুল সুসংস্কৃত ইমারৎ—অভিজাত নট-নটীর সমাবেশে ঝলমল করছে! কড়িবাবুর রাত জেগে কুড়িয়ে আনা সেই চুনো গলির মেয়েগুলির আত্মা এখন নিশ্চয়ই দস্তুরমত ভড়কে যাবে ওখানে ঢুকতে। সুতরাং বর্তমানের দর্শক নট-নটী সকলেই ওদের বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

॥ নয় ॥

মৃত জনকে সামনে উপস্থিত দেখতে পেলে মানুষ হঠাৎ যেমন চমকে ওঠে—ঠিক তেমনি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলুম। মৃত নয়, দুটি জীবন্ত নারী মূর্তি। থিয়েটারে আমার বসবার ঘরে লঘুপাদক্ষেপে আমারই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমা একটু খর্বাকৃতি, ইঙ্গ-বঙ্গ ধরনের চাল চলন। রঙ-চটা বাসন্তী রাতের ছবিখানিতে অতি নিপুণ হাতে রুজ, কস্‌মেটিকের রঙ ধরিয়েছেন, যেমন করে তাজমহলের ফাটল ধরা অংশের সংস্কার করেছেন ইংরেজ আমলের কারু-শিল্পী। পুরোনোকে নতুন করে তোলা হয়েছে, কিন্তু স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে নতুন করে তোলবার প্রয়াসটি। জীইয়ে তোলা মর্মর স্বপ্ন—আর ত্রিযামা রাতের যৌবন স্বপ্ন। কিন্তু বিস্ময়ের কারণ আমার প্রথমা নয়, তাঁর পশ্চাৎ অনুসারিণী। পরনে রূপালী জরিপাড় প্রুশিয়ান ব্লু সাড়ী। নীল সমুদ্রকে বেঁধেছে যেন রূপালী সৈকত। একটুখানি ভ্রূ বাঁকিয়ে সে আমায় কী যেন ইসারা করল। ভালো করে না বুঝলেও স্তব্ধ হয়ে গেলুম। না হয়ে উপায় নেই। শুধু আমি কেন? বুঝি ওই ভ্রূর শাসনেই উচ্ছল যৌবন স্তব্ধ হয়ে বাঁধা পড়েছে তনুদেহের রেখায় রেখায়।

প্রথমা জানালেন, আমার অভিনয় দেখতে ওঁরা নিয়মিত ভাবে স্টার থিয়েটারে আসেন। রাজ সিংহ, কালিন্দী থেকে সুরু করে নৌকাডুবি, সমুদ্র গুপ্ত প্রভৃতি কোন বই-ই দেখতে বাকী রাখেন নি। প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ নিয়ে এসেছেন এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা। তাড়াতাড়ি উঠে হাত বাড়িয়ে ওঁদের উপহার নিলুম। প্রথম বিস্ময়ের ঘোরে প্রতি নমস্কার করতেও ভুলে গিয়েছিলুম, এবার অনেকটা নত হয়ে ভুল শুধরে নেবার চেষ্টা করলুম। ডানদিকের বড় সোফাটা দেখিয়ে দিতে ওঁরা দু'জনে পাশাপাশি বসলেন। প্রথমা এদিকে, দ্বিতীয়া ওদিকে।

—যেচে এসে আলাপ কচ্ছি। তাই নিজেদের পরিচয় দেওয়া দরকার। আমার নাম মনীষা রায়। …নম্বর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে থাকি।

একটু থেমে মৃদু হেসে বলতে লাগলেন প্রথমা ঃ

—মিঃ রায় বার-এট্-ল্। নম্বর না বললেও, ওঁর নাম বললেই অবিশ্যি ও অঞ্চলের সবাই আমাদের বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

ভ্যানিটি ব্যাগটি ডান দিক থেকে তুলে বাঁ দিকে রাখলেন, একবার মুখটা খুলে আবার চেপে বন্ধ করলেন। বোধ হয় ওঁর বার-এট্-ল্ মিস্টারের ভ্যানিটি একবার প্রকাশ করে আবার পরম যত্নে বাক্স-বন্দী করে রাখলেন। তারপর দ্বিতীয়ার দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে আইগ্লাস্ রুমাল দিয়ে মুছে নিতে নিতে বললেন ঃ

—আর এটি হচ্ছে—

—আমি ওঁকে চিনি—এই কথাটি বলব মনে করে দ্বিতীয়ার মুখের পানে তাকাতেই আবার সেই ভুরু দুটি কেঁপে উঠল, চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বলা আমার হ'ল না। প্রথমার চশমার কাঁচ মোছা হয়ে গেছে। তিনিই বললেন ঃ

—এটি হচ্ছে শর্মিষ্ঠা চৌধুরী।

—চৌধুরী! অনেকটা নিজের অজ্ঞাতেই অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করলুম—চৌধুরী!

—আমার ছোট ভাই অলক চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার—প্রথমার কথা শেষ হবার আগেই আমার দৃষ্টি শাণিত তীরের মত ছিটকে পড়ল শর্মিষ্ঠার কপালের ওপর। কালো চুলের গোছার মাঝখানে ওকি! রক্তের দাগ! না, সিঁথেয় সিঁদুর চিহ্ন! ইলেকট্রিক শক্-এর মত একটা তীব্র অনুভূতি আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল! গরম বাষ্পের মত কী যেন দু'কানের মধ্যে আবর্তিত হতে লাগল। মনীষা রায় তাঁর ইঞ্জিনিয়ার ভাই-এর পরিচয় আরও কী সব বলে

যেতে লাগলেন বুঝতে পারলুম না। দূরাগত সমুদ্রের একটানা গোঙানিতে সব যেন অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। একটু বাদে নিজেকে জোর করে সামলে নিলুম। সোজা তাকাবার চেষ্টা করলুম শর্মিষ্ঠার দিকে। চোখে চোখ পড়তেই শর্মিষ্ঠা এক পলক দৃষ্টি নামিয়ে নিল। শুধু এক পলক। তারপর বোধ হয় ঘরের আবহাওয়াকে স্বাভাবিক করবার জন্যে দেয়ালে টাঙানো আমার একখানি ছবির দিকে লক্ষ্য করে মনীষা রায়কে বলল ঃ

—এ ছবিটি কোথায় যেন দেখেছি! তাই নয়, ছোড়দি? ছোড়দি ওরফে মনীষা রায় ছবিখানিকে অনেকক্ষণ দেখলেন তারপর বললেন ঃ

—ঠিক মনে পড়ছে না! অথচ দেখা ছবি! দু'জনেই জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন আমার দিকে। আমি জবাব দিলুম ঃ

—আমারই এই ঘরে এই টেবিলের সামনে ও ছবি তুলেছেন ক্যাপ্টেন কস্টার্। ফিনিক্স কাগজের এডিটর্।

—ফিনিক্স! ফিনিক্স-এ আপনার লাইফ বেরিয়েছিল, সেই সঙ্গে ওই ছবি ছাপা হয়েছিল! তাই না?

শর্মিষ্ঠার উৎসুক জিজ্ঞাসার জবাবে বললুম ঃ হাঁ! টিপু সুলতান বই অভিনীত হচ্ছিল তখন। আমার একার নয়, আমার থিয়েটারের আর্টিস্টদেরও অনেক ছবি বেরিয়েছিল ফিনিক্স-এ। টিপু সুলতান ওঁদের খুব ভালো লেগেছিল।

বলতে বলতে দেরাজ খুলে বা'র করলুম ক্যাপ্টেন কস্টার-এর লেখা চিঠি। এত ভালো লেগেছে বইখানি যে ওঁরা তিন তিনবার অভিনয় দেখেছেন। মিস্ বিয়েট্রিকস্ ও আর সব অতিথিরাও মহাখুশি হয়েছেন। ক্যাপ্টেন আমায় একদিন লাঞ্চ-এ নেমন্তন্ন করেছেন। লাঞ্চ-এর টেবিলে আরও আলোচনা হবে দেশ-বিদেশের নাট্যকলা সম্বন্ধে চিঠিতে এই সব কথা লিখেছেন।...শর্মিষ্ঠা ও মনীষা রায় দু'জনেই টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিনিক্স-এর এডিটারের চিঠিখানি পড়তে লাগলেন। ঘরের গুমোট ভাব অনেকটা কেটে গেছে মনে

হ'ল। সীগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত আমার মনকে হাল্কা করে ছড়িয়ে দিতে লাগলুম।

একটু পরে হাতের ছোট্ট রিস্টওয়াচটির প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন মনীষা রায়।

—সাড়ে আটটা! অনেক রাত হ'ল। উঠি এবার। দুজনেই দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে একদিন আমায় ধরে নিয়ে যাবার বাসনা প্রকাশ করলেন মনীষা রায়।

—আমরা মাঝে মাঝে আসব। খুব বিরক্তির কারণ হবে কি আসাটা?

জবাবে বললুম:

—আশা করি, তাতে অনুরক্তিই বাড়বে!

শর্মিষ্ঠার মুখে রক্তের ছোপ লাগল! আর সশব্দে হেসে উঠলেন মনীষা রায়। আমি তাড়াতাড়ি শুধরে নিলুম:

—আমাদের অভিনয়ের অনুরাগী যাঁরা…তাঁদের প্রতি অনুরক্তি প্রকাশও আমাদের ধর্ম। তাই নয় কি? ঘাড় নেড়ে লীলায়িত ভঙ্গিতে এগিয়ে চললেন মনীষা রায়, পিছনে তাঁর শর্মিষ্ঠা খুব আলগোছে পা ফেলে চলল। দোতলার বাঁ দিকের বারান্দা দিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলুম। সিঁড়ির মাঝামাঝি নেমে একবার নিঃশব্দে ফিরে তাকাল শর্মিষ্ঠা। নিঃশব্দেই নেমে গেল। আমি ফিরে এলুম আমার ঘরের সামনে ছাদে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। অগুন্তি তারা ঝিক্‌মিক্ কচ্ছে কালো আকাশে। উর্বশীর স্তনহার হতে খসে পড়া অসংখ্য মুক্তা আর হীরার কুঁচি। মনে পড়ল ছোট ছোট মুক্তা গাঁথা সরু মফ্‌চেনের সঙ্গে একটি হীরক খচিত পেণ্ডেণ্ট উঁকি দিচ্ছিল শর্মিষ্ঠার নীল বক্ষবাসের আড়ালে। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ল কাশ্মীরের সেই দুই চূড়া নীল পাহাড়, মাঝখানে রূপালী চাঁদ। দেখেছিলুম শ্রীনগর থেকে জম্মু আসবার

পথে, বানিহাল রোডে। মেঘ নীল পাহাড়ের গায়ে চাঁদের আলো পিছলে পড়ে, সুর-সুন্দরীর সূক্ষ্মনীলাম্বরী ভেদ করে উছলে পড়ে নিটোল দেহকান্তি। রভসে দোলে চন্দ্রাঙ্কিত কণ্ঠমালা। পাইন পপলার বন দম্‌কা হাওয়ায় কেঁপে ওঠে, এলোমেলো ওড়ে সুন্দরীর কালো চুলের গোছা, নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে উগ্র গন্ধে! খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ে পাহাড়ী ঝরণা। দুরন্ত ঝরণার মতই দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে মন অফুরন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে। শর্মিষ্ঠা! সেই শৈশব পরিচয়! তারপর কৈশোরে চট্টগ্রামে আবার দেখা। সেই দেব পাহাড়। সেই ইন্দ্রযব বন! একমুঠো শাদা ফুল, মিষ্টি ফুল। ভেবেছিলুম সে ফুল ক'টি শুকিয়ে গেছে, গন্ধ তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কে জানতো যে দেব পাহাড়ের ইন্দ্রযব সুদূর কাশ্মীরে জাফরাণ ফুল হয়ে ফুটে উঠবে? মিষ্টি গন্ধে জাগবে রক্ত চঞ্চল করা মত্ততা? সেদিন সে এসেছিল ঝড়ের পাখীর মত, ডানার ঝাপটে আমার জীবন আকাশেও ঝড় তুলে দিয়ে সে চলে গেল কাশ্মীর ছেড়ে। তারপর দু'বছর তার খবর রেখেছিলুম। চিঠি আসত এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এবং কলকাতা থেকে এলাহাবাদে প্রতি সপ্তাহে। তারপর একদিন এলাহাবাদ হঠাৎ নিস্তব্ধ হ'ল। কলকাতা তিন তিনবার চেষ্টা করেও যখন সে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গাতে পারল না, এমন কি এতটুকু জানতে পারল না নিস্তব্ধতার কারণ—তখন সেও হাত গুটিয়ে বসল। বীণা না বাজলে কি হবে মিছামিছি তারগুলোতে আঙ্গুল চালিয়ে খেলা করে? ধ্বনি নেই প্রতিধ্বনিও নেই। ভাবলুম সবই শেষ হয়ে মিলিয়ে গেছে। স্মৃতিটুকুও ঘুমিয়ে পড়েছে। দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ আর্তনাদের মত তীব্র ঝঙ্কারে ঘুম ভেঙ্গে গেল। রক্তে আগুন লাগল, টকটকে লাল সিঁদুরের আগুন। ঝড়ের পাখী দেখা দিল ধূমকেতুর মত। সারা আকাশ ব্যাকুল দৃষ্টিতে খুঁজেছি, কোথাও তা'র ছায়া মাত্র দেখতে পাইনি। আজ অতর্কিতে কোথা হ'তে খেয়ে এলো পথের দু'ধারে আগুন ছড়িয়ে! নাটক লিখব বলে সে রাতে থিয়েটারে ছিলুম।

নাটক নিয়েই নাড়াচাড়া করলুম সারারাত। আমার জীবন-নাটক। আর সেই নাটকে এক ধূমকেতুর বিচিত্র আবির্ভাব! রাত শেষ হয়ে আসে। ঘুমোবার চেষ্টা করি এবার। কিন্তু ঘুম আসে না। দু'চোখ জ্বালা করে। ধূমকেতু শুধু কি আগুন ছড়ায়? শুধু কি জ্বালা দেয়? সেও কি আগুনে পোড়ে না? সেও নিজে জ্বলে না?

পরদিন ফিকে নীলাভ লেপাফায় চিঠি এল ডাকে। লেপাফার গায়ে হাতের লেখা দেখেই বুঝতে কষ্ট হ'ল না কে লিখেছে। বুক দুরু দুরু কাঁপতে লাগল, তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে বা'র করলুম চিঠিখানি। সংক্ষিপ্ত কয়েক ছত্রের চিঠি। একা একা আমার সামনে আসবার উপায় নেই, তাই ছোড়দি মানে মনীষা রায়কে সঙ্গে নিয়ে অপরিচিতার মত আসতে হয়েছে। এই সঙ্গিনীটি রয়েছেন বলেই মাঝে মাঝে ওঁকে নিয়ে সে আসতে পারবে আমার কাছে। অতীতের মণিকোঠা এখন কালো পর্দাতেই ঢাকা থাক, ঝোড়ো হাওয়ায় যদি পর্দা কোন দিন সরে যায় সেদিন মুখোমুখী দাঁড়াব দু'জনে। আপাততঃ দু'জনেই নবপরিচিত। দু'জন নয় তিনজন, মানে, মনীষা রায়ও তো সঙ্গে থাকবেন। চিঠি শেষ করে পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে শর্মিষ্ঠা, ঠিকানা দেওয়া থাকলেও ওকে যেন কখনো চিঠি না লিখি। কারণ সে চিঠি হয়তো ওর হাতে পৌঁছুবে না।··· বারবার পড়লুম চিঠিখানি। তবু যেন অর্থ বোধ হল না, পাঠোদ্ধার করতে পারলুম না। যত পড়ি, ততই রহস্যের বাষ্প ঘনিয়ে আসে। চিঠি লিখলে, তাও তার হাতে পৌঁছুবে না। কেন? সে কি বন্দিনী? কতকাল আগে প্যাহালগাম-এর অশ্রান্ত হিমানী প্রবাহের সামনে 'বলাকার' সেই চঞ্চল বিহঙ্গিনীকে মনে পড়ল—

হে হংস বলাকা

ঝঞ্ঝা মদ-রসে মত্ত তোমাদের পাখা

রাশি রাশি আনন্দের অট্ট হাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

দিন সাতেক বাদে ওঁরা আবার এলেন। আমার ঘরে লোক ছিল, বেরিয়ে এসে সামনের ছাদে দেখা করলুম। ওখানেই চেয়ার দিতে বললুম দরোয়ানকে। মনীষা রায় বললেন :

—না, আজ বসব না, আর একদিন আসব।

—কেন? এসেই চলে যাবেন যে?

উনি চাপা গলায় বলেন :

—আপনার ঘরে কা'রা সব রয়েছেন। জানেন, আমরা একরকম পালিয়ে আসি, অন্য কোথাও যাচ্ছি বলে।

কৌতূহল জাগল আমার! তাই নাকি? পালিয়ে আসবার হেতু?

এবার শর্মিষ্ঠার পানে তাকালুম। ওর মুখ যেন কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল! চোখ নিচের দিকে নামাল। দ্বিধা জড়িত স্বরে মনীষা রায় থেমে থেমে বললেন :

—মানে, আম্‌াদের বাড়ির ওঁরা পছন্দ করেন না। আমার ভাইও নয়।···আর্টিস্টদের সঙ্গে আলাপ কচ্ছি শুনলে হয়তো···হেসে ফেললুম আমি :

—ভীষণ চটে যাবেন ওঁরা, তাই না! তবে এ অনর্থের সূচনা করছেন কেন?

কৌতুক ভরা দৃষ্টিতে তাকালেন মনীষা রায় শর্মিষ্ঠার মুখে, শর্মিষ্ঠা মনীষা রায়ের মুখে। মনীষা রায় শর্মিষ্ঠার বাহুতে চিমটি কেটে ফিস্ ফিস্ করে কী যেন বললেন।

শর্মিষ্ঠা আমার কথার জবাব দিল :

—অনর্থ যাতে না ঘটে, তাই আমাদের লুকিয়ে আসা। আর দৈবাৎ যদি ঘটে, তাহলে বলব, অনর্থের অর্থ হয় না।

—আর যাঁরা এভাবে লুকিয়ে আসার কদর্থ করবেন?

তাঁদের অপদার্থ বলবার দুঃসাহস করি না। তবু বলব তাঁরা বিচিত্র পদার্থ!

উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম করলেন মনীষা রায়। হঠাৎ আমার ঘরের দিকে তাকিয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসি রোধ করলেন। এইবার চলে যেতে চাইলেন। আমিও আপত্তি করলুম না। আমার ঘরে লোক বসে রয়েছে। মস্ত এক ঝামেলা বেঁধেছে! সেটা মেটাতে হবে। পরের সপ্তাহে ওঁদের আসবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ঘরে ফিরে এলুম।

ঝামেলা বেঁধেছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' অভিনয় নিয়ে। নাটক খানিকে আমি যুগোপযোগী করে এডিট করে নিয়েছি। সেকালের পাঁচ ঘণ্টার নাটককে একালের মত করে কেটে নিয়েছি। পূর্ণাঙ্গ নূতন রূপ দিতে নাটক কাটবার সঙ্গে সঙ্গে দু-চার ছত্র জুড়েও দিতে হয়, নইলে জোড়া লাগবে কেমন করে? জোড়া লাগাবার জন্যও বটে, এবং আমার অভিনীত ঔরঙ্গজেব চরিত্রের বিশদ বিশ্লেষণের জন্য যে ছত্র ক'টি নাটকে স্থান পেয়েছিল—এক অভিনয় রাত্রে, তাই নিয়ে ঝামেলা সুরু হ'ল। ইতিহাস বলে, ঔরঙ্গজেব তাঁর নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করতেন না। মঞ্চে ঔরঙ্গজেবের প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমি ঐভাবে নিজের ছায়া দেখে চমকে উঠতুম,—'কে! না, না, আমারই ছায়া! মনের! না, দেহের! কিন্তু কী কালো!' তারপর কালোছায়াকে এড়াবার জন্য মুখ ফিরিয়ে নিতুম—দৃষ্টি পড়ত আকাশের পানে, 'আকাশও কালো, মেঘাচ্ছন্ন! ঝড় উঠবে!' এই ভাবে অভিনয় করতুম। সেদিন অভিনয় কালে একজন বিক্ষুব্ধ দর্শক এবং তাঁর দু'টি সঙ্গী নানা বিরূপ মন্তব্য করে বারবার অভিনয়ে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন। আমি অভিনয় থামিয়ে এই ভাবে বারম্বার দর্শকমণ্ডলীর রসগ্রহণে বাধা জন্মাবার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তাঁরা তিনজন প্রেক্ষাগারের সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। একজন মুখপাত্র রূপে উত্তেজিত

ভাবে বললেন, আমি নাকি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মশাই-এর নাটকখানিকে হত্যা করেছি। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে কলম চালানো তাঁরা বরদাস্ত করবেন না! তখন দর্শকমণ্ডলীর অভিমত চাইলুম! পূর্ণ প্রেক্ষাগারের সমবেত দর্শকেরা জানালেন, আমি যে ভাবে 'এডিট' করে সাজাহান নাটক মঞ্চস্থ করেছি, তাঁরা সকলে ঐ ভাবেই অভিনয় দেখতে চান্। বিক্ষুব্ধ দর্শক তিনজন প্রেক্ষাগার ত্যাগ করে চলে গেলেন। আবার অভিনয় আরম্ভ হ'ল।

ঘটনাটি কিন্তু এখানেই শেষ হ'ল না। পরদিন প্রচার পত্র বেরুল আমার বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক হত্যার অপরাধের চমকপ্রদ বিবরণী সহ। উৎসাহী ছেলের দল রাস্তায়, ফুটপাতে হাজার হাজার হ্যাণ্ডবিল ছড়িয়ে দিয়ে নিরস্ত হ'ল না, থিয়েটারে ঢুকে সলিলবাবুর টেবিলে ফেলে দিয়ে গেল। বাড়িতে এসে দেখি—ইতিমধ্যে বাড়িতেও হ্যাণ্ডবিল পৌঁছে গেছে। তুমুল আন্দোলন সুরু হ'ল, ঝড় উঠল রেস্তোঁরাগুলির চায়ের কাপে!

বিক্ষোভকারীরা বিচার চাইলেন। বিচার-সভার আয়োজন করলুম আমি। আমন্ত্রণ জানালুম নট, নাট্য-সমালোচক প্রমুখ বিভিন্ন নাট্য-রসিকজনকে সাজাহান অভিনয় দেখতে। অপর পক্ষও আমন্ত্রিত অতিথিরূপে উপস্থিত হলেন। অভিনয় অন্তে নাট্য-রসিকেরা আমার স্বপক্ষে রায় দিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের কন্যা শ্রদ্ধেয়া মায়া দেবী আমার পিঠে সস্নেহে হাত রেখে বললেন—'আমি বলছি, আমার বাবার লেখার এতটুকু অমর্যাদা করোনি। আমি পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যাচ্ছি অভিনয় দেখে।' মায়া দেবী চলে গেলেন। অভিযোগ এনেছিলেন যাঁরা, নিঃশব্দে চলে গেলেন অভিমত শুনে।

আজ ওঁদের আবার ডেকে এনেছি। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী চিঠি দিয়েছেন—সেই চিঠি শোনাতে। ওঁরাই আমার ঘরে বসেছিলেন। মনীষা রায় ও শর্মিষ্ঠাকে বিদায় দিয়ে ঘরে ফিরে এসে চিঠি দু'খানি ওঁদের হাতে দিলুম। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

'স্টার থিয়েটারে অভিনীত সাজাহান দেখিলাম, সাজাহানে বক্তৃতার মধ্যে যে সামান্য নূতন সংযোজনা হইয়াছে তাহাতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মর্যাদা কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হয় নাই বলিয়াই আমার ধারণা হইল। নূতন সংযোজনা চরিত্র বৈশিষ্ট্য স্ফুটতর করিবার জন্যই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে দর্শকের কোন ক্ষোভের কারণ ঘটে নাই। অভিনয় কৌশল বিশেষ প্রশংসনীয় ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।'

যুগান্তর পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীপরিমল গোস্বামী লিখেছেন ঃ

'আপনাদের সাজাহান নাটকের অভিনয়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। এ নাটকের অভিনয় আমি পূর্বে একাধিকবার দেখেছি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই আগের দিনের নাটক আগের দিনের মতো ভাল লাগে না। সে জন্য অনেকবার মনে হয়েছে হয়তো অভিনয় কালে এই জাতীয় নাটকের মধ্যে কিছু পরিমাণ অভিনবত্ব যোগ করতে পারলে ভাল হয়। অবশ্য পরিচিত রূপ যথা সম্ভব বজায় রেখে। এই অভিনবত্ব অবশ্য অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করেই গ্রাহ্য হতে পারে। সেদিন আপনার ঔরংজেবে এই জাতীয় অভিনবত্ব কিছু পরিমাণ দেখা গেল। এটি আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছে। পরিবর্তনের আরও অনেক সুযোগ ছিল, কিন্তু হয়তো ততটা হঠাৎ দর্শকদের কাছে বাঞ্ছনীয় না হতে পারে সে দিকে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। সিনেমার ক্ষেত্রে দেখেছি সেক্সপীয়রকে আরও বেশী বদলাতে। টেমিং অফ দি শ্রু-তে এটি প্রত্যক্ষ হয়েছিল খুবই বেশি, ডগলাস্ ফেয়ার্ ব্যাঙ্ক ও মেরি পিকফোর্ড-এর অভিনয়ে। তাতে নিন্দা হয়নি বরঞ্চ তা আরও বেশি সিনেমার উপযোগী হওয়ায় সবার প্রশংসা পেয়েছিল। একজন বিশিষ্ট সমালোচক খুব তারিফ করে শেষে বলেছিলেন "ইট্ ইজ্ নট্ সেক্সপীয়র, বাট্ হু কেয়ার্স্?" অর্থাৎ সেক্সপীয়রের প্লট যদি ঠিক থাকে তবে প্রয়োজনীয় অদল বদলের জন্য মাথা ব্যথা কেন? কাজেই নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই।'

ওঁরা চিঠি পড়ছিলেন। এই সময় বাংলা দেশের একজন সু-পরিচিত নাট্যানুরাগী আমার ঘরে ঢুকলেন। একখানি বই নিতে এসেছেন উনি। ভদ্রলোকদের দেখে সেই নাট্যানুরাগী—আসল নামটি থাক, বিমলদা বলে পরিচয় দেব তাঁর—বিমলদা বিস্ফারিত চোখে বললেন :

—কী ব্যাপার! তোমরা এখানে?...সেই সাজাহান-এর ব্যাপার বুঝি!

বিমলদা ওঁদের জবাব না পেয়ে আমার দিকে ফিরলেন।

আমি মৃদু হেসে মাথা নেড়ে জবাব দিলাম—হাঁ।

উৎসাহিত কণ্ঠে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলতে সুরু করলেন বিমলদা :

—বাংলা দেশে থিয়েটার মাত্র তিন চারটে, তাও আজ এখানে আলো জ্বলছে, কাল ওখানে আলো নিভছে। একমাত্র এই স্টার থিয়েটার—আজ কত বছর ধরে এই একটি লোকের অমানুষিক পরিশ্রমে টিকে রয়েছে। এই লোকটিকে তোমরা উৎসাহ দেবে, আশা দেবে—তা নয়, কি সব ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছ! ওসব কোরোনা। ছিঃ! একটি প্রতিষ্ঠান বাঁচলে কত শিল্পী-পরিবারের অন্নের সংস্থান হয়—সে কথাটি ভেবে দেখো।

বক্তৃতা অন্তে বিমলদা তাঁর প্রয়োজনীয় বইখানি নিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন। মহাব্যস্ত-বাগীশ লোক, নানা স্থানে বক্তৃতা, আলোচনা, নাট্য-চর্চা, কাজের তাঁর অন্ত নেই।

বিমলদা বেরিয়ে যেতে আমি ওঁদের জিজ্ঞাসা করলুম,—বলুন, আপনাদের মনে আর কোনো ক্ষোভ আছে? ওঁদের যিনি দলপতি —তাঁর মুখের পানে তাকালুম। ভদ্রলোক বললেন :

—না, ক্ষোভ আমাদের নেই, দ্বিজেন্দ্রলালকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। তাই প্রথমে একটু উত্তেজিত হয়েছিলুম, তবে সে উত্তেজনা হয়তো একটু পরেই কমে যেত। যদি...এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক একটু ইতঃস্তত করতে লাগলেন।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম :

—থামলেন কেন? বলুন না? যদি...?

—যদি আমাদের বাইরে থেকে উত্তেজিত না করত!

—বাইরে থেকে উত্তেজিত করেছে? কে?

—কার নাম বলব? আপনার পরিচিত অনেক স্বনামধন্য নাট্যানুরাগী তার মধ্যে আছেন! এমন কি ওই বিমলদাও বাদ যান না!

—বিমলদা!…কথাটা যেন অসম্ভব মনে হ'ল! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না! ভুল শুনিনি তো! সোজা ভদ্রলোকের চোখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম: বিমলদা!

তিনিও আমার পানে সোজা তাকালেন। স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন:

—হাঁ, বিমলদা!

—কি বলেছেন উনি?

—থিয়েটার থেকে গোলমাল করে সে রাত্রে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম! উনি ছিলেন উল্‌টো দিকের ফুটপাতে। ঘটনা শুনে আমার হাত চেপে ধরে বললেন:

—সাবাস্! এই তো চাই! ভগবান করুন, এমনি সতেজ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে পার যেন সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে!

চুপ করে শুনতে লাগলুম ভদ্রলোকের কথা।

—বিমলদা আপনার নাম করে বললেন, বছরের পর বছর একটানা থিয়েটার চালিয়ে বড় দেমাক হয়েচে! ওকে গুড়িয়ে দাও, কোনো চিন্তা নেই, আমরা সাহায্য করব! তবে বুঝলে কি না, সব থিয়েটারের সঙ্গেই মুখের ভাব রাখতে হয়, তাই সামনা-সামনি কিছু করতে পারব না! তোমাদের পেছনে থেকে আমরা বারুদ যোগাব, কামান চালিও তোমরা!

বিমলদা এই কথা বলেছেন! রাস্তায় দেখা হলে যিনি আমার পেছু ছাড়তে চান না, আমার পরিশ্রম, আমার প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমত্ব বোধ, আমার নিষ্ঠা সম্বন্ধে অনর্গল স্বীকৃতি ও উৎসাহ বাণী দিতে দিতে যিনি প্রায় প্রতিদিন জরুরী কাজ ভুলে থিয়েটারের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আসেন সেই বিমলদা! বিচিত্র!

ওঁরা এবার উঠে পড়লেন! যাবার সময় ভদ্রলোক হেসে বললেন ঃ

—আপনি সব শুনে খুবই অবাক হয়ে গেছেন, বুঝতে পাচ্ছি। তবু একটি অনুরোধ করে যাই, বিমলদার মত শুভার্থী আপনার একটি দুটি নয়, অনেক! তার কারণ আপনার আসনটি অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু! মনে ভাবলুম হবেও বা! নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশাই-এর সেই সতর্কবাণী স্মরণে জাগল, 'কাউকে বিশ্বাস কোরো না! বিশ্বাস করেছ কি ঠকেছ!' ক্ষমতার আসনে বসে বহুজনকে বিশ্বাস করে ঠকেছি, ভালবেসে ঠকেছি। মনে আঘাত লেগেছে, সঙ্গে সঙ্গে এই সান্ত্বনাটুকু পেয়েছি, বিশ্বাস করে ঠকেছি, ভালবেসে ঠকেছি, তবু মানুষকে অবিশ্বাস করিনি, ভাল না বেসে পারিনি। ক্ষমতার প্রসার হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে নিন্দা ও কুৎসার বৃদ্ধি হয়েছে। নাট্যকার, শিল্পী প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চ সংশ্লিস্ট বহুজনকে খুসী করতে পেরেছি, পারিনি আরও বিপুল সংখ্যককে; তাই ক্ষুব্ধও হয়েছেন বহুজন। এ আমার আত্মদোষ স্খালনের প্রয়াস নয়। রক্তমাংসের মানুষ আমি, ভুল করেছি, ত্রুটি করেছি, হয়তো অন্যায়ও করেছি বহুক্ষেত্রে। তবু শচীন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলার ভাষাতেই বলি,—'যত কালি আমার গায়ে, সবই অঙ্গ ফুটে বের হয়নি, বাইরে থেকেও খানিকটা ঢেলে দেওয়া হয়েছে।' এই সত্য কথাটি যদি কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, সেইটুকুই আমার সান্ত্বনা।

॥ দশ ॥

সাজাহান অভিনয়ের গোলমালের পর আরও তিনচার মাস পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে কয়েকবার শমি এসেছে, মনীষা রায়ও সঙ্গে এসেছেন—অভিনয় দেখতে, বাড়ির ওঁরা অপছন্দ করা সত্ত্বেও। বাড়ির ওঁদের লুকিয়ে থিয়েটার বন্ধের দিন এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। অনেকবার আমন্ত্রণ করেছেন বালিগঞ্জ সার্কুলার

রোডের বাড়িতে একটিবার যাবার জন্যে। নানা ওজর দেখিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। কাটিয়ে দেবার কারণ এ নয়—ওঁদের সঙ্গ আমার কাছে লোভের বস্তু নয়; আসল কথা, ভয়ে পেছিয়ে গেছি। গৃহস্বামী জানবেন না, তাঁর অবর্তমানে দুপুর বেলা যেতে হবে! হঠাৎ যদি বাড়ি এসে পড়েন, বা কোন রকমে টের পান, তখন? থিয়েটারের লোক, সুতরাং মুখ বিশেষ অচেনা নয়, ভদ্দর লোকের সঙ্গে দেখা হলে আমিই বা কী বলব, আর এই দুই নাছোড়বান্দা নারী কোন্ যুক্তি দিয়ে সিচুয়েশন্ রক্ষা করবে? শিল্পীর পূজারী ওঁরা, তাই আমন্ত্রণ করে এনেছেন? গৃহস্বামী যদি বলেন, বেশ তো, পূজোটা আমার উপস্থিতিতে হলে এমন কি অশুদ্ধ হ'ত? তখন?… অনেক বোঝালুম, কিন্তু আজ ওঁদের ধনুকভাঙা পণ, আগামী কাল আমায় যেতেই হবে। অগত্যা ফলাফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করে রাজী হয়ে গেলুম। বিজয়িনীদ্বয় আঁচলে বিলিতি সেণ্টের মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে, এক ঝলক খুশির হাওয়ার মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কথা রইল—কাল বেলা দেড়টা। ঠিক দেড়টা!

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের যতো কাছে এগুচ্ছি, ততই যেন সাহস হারিয়ে ফেলছি। বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। জোর করে সাহস সঞ্চয় করে নিলুম। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ঢুকেছি। দুটো মোড় ঘুরে যেতেই নজরে পড়ল…নম্বর বাড়ি! ফটকে শ্রী… রায় বার-এট-ল'র নাম খোদাই করা পেতলের প্লেট। অন্য দিকে শ্বেত মর্মর খণ্ডের ওপর কালো রঙ-এ লেখা বাড়ির নম্বরটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ত্রস্ত পায়ে ভেতরে ঢুকে পড়লুম। দুধারে কেয়ারী করে সাজানো মরসুমী ফুলের বাহার। ময়দানে হাওয়া খেতে-আসা সাহেব মেমের বাচ্চাদের মত লাল, হলদে, বেগুনী নানা রঙের সৌখীন ফুল হাওয়ায় দুলছে, এ ওর গায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে! টকটকে লাল সুড়কী আর কাঁকড় বিছানো পথ ধরে চলেছি। গৈরিক স্রোতস্বিনী যেন আবর্ত বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, দুধারে

সবুজ আর হরিৎ হিরণের হাতছানি উপেক্ষা করে। স্রোতের টানে বারান্দার উপর ছিটকে পড়েছি। চওড়া বারান্দা, সবুজ রঙের বেতের চেয়ার আর চৌকো টেবিল সাজান রয়েছে এক পাশে। একটি বেশ চটপটে বাঙালী বয় আমায় অভ্যর্থনা করল। কা'কে চাই এবং নাম ইত্যাদি লেখবার জন্য কাগজ পেনসিল এগিয়ে দিল। তারপর আমায় ওখানে বসিয়ে রেখে পর্দা ঠেলে ভেতরে চলে গেল। মিনিট দুই বাদে সে ফিরে এসে আমায় পৌঁছে দিল ভেতরে বসবার ঘরে। মনীষা রায় ঐ ঘরেই সোফায় বসে বিলিতি ছবিওয়ালা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্‌টাচ্ছিলেন। মৃদু হেসে আমায় ছোট্ট একটি নমস্কার করে বসতে ইসারা করলেন। প্রতিনমস্কার জানিয়ে আদেশ পালন করলুম। খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। মনীষা রায় আনমনে পত্রিকার পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে বললেন:

—মিছামিছি আপনাকে কষ্ট দিলুম।

তাড়াতাড়ি বললুম: কিছু না।

সত্যই কষ্ট তো হয়নি! স্পষ্ট স্বীকার কচ্ছি, হয়েছে ভয়। দক্ষ যজ্ঞ নষ্ট না হয়—এই ভয়! কৈলাশনাথ এসে হাজির হবার আগে এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। শঙ্কিত এবং সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে ঘরের চার দিকটা তাকিয়ে নিলুম। কমলালেবু রঙের পর্দা হঠাৎ কেঁপে ওঠে, বুকের ভেতর কাঁপুনি জাগে। আবির্ভাব হ'ল কি? না, হাওয়া খেলা কচ্ছে। দূর ছাই, ও চিন্তা মন থেকে তাড়াতে হবে। বসে বসে ঘর সাজানোটাই দেখি। দিব্যি কেতাদুরস্ত ভাবে সাজানো। বিলাসের প্রাবল্যকে চাপা দেওয়া হয়েছে কমলালেবু বা গেরুয়া রঙের পর্দা, টেবিল ক্লথ আর সোফার ঢাকুনি দিয়ে। প্রতিটি আচ্ছাদনের প্রান্তে রয়েছে রঙীন সূতোর সূক্ষ্ম শিল্প-কর্ম। টেবিলের ওপর একটি বিচিত্র ছাই-দানী—প্রবালখণ্ড আর নীল পাথর বসানো তিব্বতী ডিজাইন। হল ঘরের বাঁ দিকটায় বড় টেবিলে কাঠের ওপর কারুকার্য খচিত চাইনিজ্ প্যাগোডা, চন্দন কাঠের বাক্স, হাতীর দাঁতের কাজ করা নানা

রকম কিউরিও, তার পেছনে দুটি হাতী শুঁড় উঁচু করে রয়েছে। সবার ওপরে পদ্মাসনে বসে রয়েছেন শ্বেত পাথরের সৌম্য শান্ত ধ্যানী বুদ্ধ। ডানদিকে আমার সোফার পাশেই আবলুস্ কাঠের বুক স্ট্যাণ্ড। হুইটম্যান, ন্যুট হামসুন, জন বোয়ার, শেখভ—কালো মরক্কো লেদার-এর ভেতর উঁকি দিচ্ছেন, মেঘের আড়ালে সোনালী আলোর মত। ঘোরানো বুক স্ট্যাণ্ড একটুখানি ঘুরিয়ে দিতেই চোখে পড়ল সেল্ফ ভরতি অজস্র রবি-রশ্মি বড় বড় গ্রন্থাবলীর আকারে।

—শুনুন্! ফিরে তাকালুম মনীষা রায়ের ডাক শুনে। বই ফেলে সোজা হয়ে উঠে বসেছেন উনি।

—আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। প্লীজ, ডোণ্ট টেক্ ইট আদারওয়াইজ্। আমার নিছক কৌতূহল!

জিজ্ঞাসা করলুম ঃ

—বলুন, কি জানতে চান?

একটু থেমে, বাঁ হাতখানা সামনের দিকে এগিয়ে কাপড়ের আঁচলটা একবার নাড়াচাড়া করলেন। আমার পানে তাকালেন, অন্তর্ভেদী সে দৃষ্টি। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—শমিকে আপনি আগে কখনো চিনতেন? আই মীন, পরিচয় ছিল আপনাদের?

চমকে উঠলুম ঃ আমার সঙ্গে পরিচয় শর্মিষ্ঠা দেবীর!

মনীষা রায় সব কথা টের পেয়ে গেছেন অনুমান করে আমি চমকে উঠলুম। তবে কি শর্মিষ্ঠা ওঁকে বলে দিয়েছে! কিন্তু তাও তো সম্ভব নয়! কোথায় সে? তাকেও তো দেখছি না!

নিজে থেকেই বলেন মনীষা রায় ঃ

—শমি কালরাত্রে আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। ভোর হতে না হতে চলে গেছে এখান থেকে!

শমি চলে গেছে! কথাটা যেন বুকের ভেতর খোঁচার মত বিঁধল! ইচ্ছা হ'ল জিজ্ঞাসা করি কেন ঝগড়া হ'ল তার সঙ্গে!

কোথায় সে গেল! কিন্তু নিতান্ত পারিবারিক ব্যাপার বলে অদম্য কৌতূহল সত্ত্বেও কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলুম। একটু বাদে মনীষা রায় নিজেই সুরু করলেন :

—ঘটনাটা আপনাকে খুলে বলা দরকার। কারণ ইন্‌ডিরেক্টলি আপনি এ ব্যাপারে জড়িত।

আমি! অবাক হয়ে তাকালুম ওঁর চোখের দিকে। একটু থেমে উনি বলেন :

—আগেই বলেছি, আপনার অভিনয় আমাদের ভালো লাগে। তাই আমার ভাই এবং আমার স্বামী থিয়েটার বিশেষ পছন্দ না করলেও আমরা প্রায় প্রতি সপ্তাহে আপনার অভিনয় দেখতে যেতুম। এমন অনেক সময় হয়েছে, আমার শরীর হয়তো ভাল নেই, তবু শমি জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। ওর বিশেষ আগ্রহেই সেদিন আলাপ করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু তখন আমি এসব ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি।...মনীষা রায় আমার পানে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন, আমি নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলুম। জজ সাহেবের এজলাসে দণ্ড-প্রত্যাশী আসামীর মত দারুণ উৎকণ্ঠা আমার গলা পর্যন্ত যেন বাষ্প হয়ে ঠেলে উঠতে লাগল। থেমে থেমে বললেন উনি।

—আমার মনে হয়, আপনার ওপর শমির খানিকটা দুর্বলতা আছে। না, না, আপনি চমকাবেন না, আপনাকে আমি দোষী বলছি না। যা কিছু উপদ্রব ঘটেছে সবই ওর মনে। ও আমার ছোট ভাই-এর স্ত্রী। এরকম হবে আগে জানলে কখনই এতটা এগুতে দিতুম না।

অনেকক্ষণ দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। তারপর এক সময় অপরাধীর মত অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম :

—তাহলে কাল রাত্রে আপনাদের ঝগড়া হয়েছে বোধ হয় আমাকে নিয়েই?

মনীষা রায় মাথা নেড়ে সায় দিলেন :

—আপনি আসবেন, তাই অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। আপনার জন্য খাবার তৈরী করা, ঘর সাজানো প্রতিটি কাজে যেন অস্বাভাবিক উৎসাহ। মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলুম। চমকে উঠে সে কি তীব্র প্রতিবাদ! কিছুতেই স্বীকার করল না। তবু বোঝালুম, অনেক রকম বলে। সত্যিই বলুন তো, বিয়ে হয়েছে, এখন এরকম করলে দুটো জীবন কি একেবারে নস্ট হয়ে যাবে না?

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললুম:

—সে তো নিশ্চয়ই! তারপর?

—যখন ও কিছুতেই নিজে দোষ স্বীকার করল না তখন বললুম, বেশ, তোমার মনে কোন পাপ থাক আর নাই থাক এখন থেকে আর থিয়েটারে যাওয়া চলবে না। আমার কথা শুনে ও ভয় পেয়ে গেল! বারবার বোঝাতে লাগল থিয়েটার দেখতে দোষ কি! আমি বললুম, দোষ গুণের কথা নয়। এখন থেকে অন্ততঃ ছ'মাসের মধ্যে তোমাকে আমি থিয়েটারে নিয়ে যাব না। আর কোনো কথা বলল না। খানিকটা বসে থেকে এক সময় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।···আমি শুয়ে পড়লুম। শোবার আগে দেখে এলুম ওঘরে আমার মেয়ে বেবীর সঙ্গে শমি শুয়ে পড়েছে। মনীষা রায় হঠাৎ কথা বন্ধ করলেন। বয় ট্রেতে সাজিয়ে এনেছে বিবিধ উপাদেয় আহার্য সহ দু'জনকার মত উষ্ণ পানীয়। বয়কে চলে যেতে ইসারা করে মনীষা রায় কেৎলি থেকে পানীয় ঢালতে লাগলেন। আমার দিকে গোটা দুই প্লেট এবং কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন:

—আগে খেয়ে নিন। তারপর বলছি। যে কাহিনী উনি বিবৃত কচ্ছিলেন, আমি নিজে যদি তার সঙ্গে জড়িত না থাকতুম তাহ'লে নিশ্চয় বলতুম, আপনার কাহিনীর চেয়ে আহার্য অধিক উপাদেয় নয়। দয়া করে কাহিনীটিই আগে শেষ করুন। কিন্তু তা তো বলতে পারলুম না। কাহিনী সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করে শুধু বললুম:

—এত সব খেতে পারব না।

—আরম্ভ করুন তো, তারপর দেখা যাবে।

আদেশ পালন করলুম। চামচে করে চায়ের কাপে চিনি মেশাতে মেশাতে কী যেন ভাবতে লাগলেন উনি। ঈষৎ তীর্যক-দৃষ্টিতে একবার লক্ষ্য করলেন আমায়। তারপর ঠোঁটের কাছে কাপটি এগিয়ে নিলেন। খুব আস্তে আস্তে দু'তিন চুমুক খেয়ে কাপটি আল্‌গোছে রেখে দিয়ে বললেন :

—হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল। রাত তখন কত হবে ঠিক বলতে পারি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। বারান্দায় কিসের যেন আওয়াজ! ভাল করে কান পেতে শুনলুম কে যেন বারান্দার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত হেঁটে বেড়াচ্ছে। একবার ভাবলুম ওঁকে ডাকি! তারপর ভাবলুম, থাকগে! অনেক রাত অবধি কাজ করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছেন। দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি! আলো না জ্বালিয়ে একটুখানি পর্দা ফাঁক করে বারান্দায় তাকালুম। দেখি শমি! একা একা পায়চারী কচ্ছে। অবাক হয়ে গেলুম। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। তারপর এক সময় হঠাৎ যেন সরে গেল। দরজা খুলে পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়লুম! দোতলার ঐ কোণের ছাদে গিয়ে দেখি দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে শমি!

—কী হয়েছে শমি?

আমার সাড়া পেয়েও মাথা তুলল না। বলল :

—কিছু না।

—ওভাবে বসে কেন?

—ঘুম পাচ্ছে না।

—তা বলে এত রাত্রে বাইরে থাকতে হবে না। বেবী একা রয়েছে। দরজা খোলা, যাও শোওগে।

আর কোনো জবাব না দিয়ে ও উঠে দাঁড়াল। ঘরের দিকে পা বাড়াতেই আমি ওর একখানি হাত ধরে টেনে বললুম, শোনো। মুখখানি ডান হাত দিয়ে জোর করে আমার দিকে ফিরিয়ে নিলুম।

ওর গলার আওয়াজে যে সন্দেহ হয়েছিল, দেখলুম ঠিক তাই। কাঁদছিল ও! এক ঝট্‌কায় আমার হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। ঘরে ঢুকে সশব্দে কপাট বন্ধ করে দিল। ফিরে এলুম আমার ঘরে। সকালে উঠে শুনি শমি চলে গেছে।

এই পর্যন্ত বলে মনীষা রায় টেবিলের ওপর কনুয়ে ভর দিয়ে মাথা নোয়ালেন, দুই ভুরুর মাঝখানটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন। ঠোঁট দুটো একটুখানি কেঁপে উঠল। তারপর ছোট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। চোখের চাউনি এবার প্রখর হয়ে উঠল।

—অলক ওকে এতটুকু অনাদরে রাখেনি। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে সে হেলার পাত্র নয়। পাঁচ বছর কনটিনেণ্টে ছিল, আড়াই হাজার টাকা মাইনে পায়, গোল পার্কের ধারে মস্ত বাড়ি করেছে। আর কি চায় শমি?

মনীষা রায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং প্রতিটি কথা যেন সূঁচের মত বিঁধতে লাগল আমার সারা গায়ে। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলুম। কাতর ভাবে তাকালুম ওঁর মুখের দিকে। বোধ হয় আমার অবস্থা অনুমান করে এবার একটু নরম সুরে বললেন:

—আপনার সঙ্গে হয়তো ও দেখা করতে চাইবে। আপনি দয়া করে ওর সঙ্গে দেখা করবেন না। একটুও প্রশ্রয় দেবেন না। দু'চার মাসেই হয়তো ওর মোহ কেটে যাবে তা হ'লে। কেমন, আমার এ অনুরোধ রাখবেন তো?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলুম:

—নিশ্চয়ই! সে আপনাকে বলতে হবে না। আপনি আমায় যথেষ্ট সতর্ক করে দিয়েছেন।

কথা শেষ করে এক সেকেণ্ডে দেখে নিলুম মনীষা রায় অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছেন। চারটে বেজে গেছে, আর এখানে অপেক্ষা করা উচিত নয়। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে মনীষা রায়ও চম্‌কে উঠলেন। বললেন: না, আর নয়। আচ্ছা, নমস্কার। প্রতিনমস্কার করে

তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ীতে উঠলুম। গাড়ী স্টার্ট নেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, যেন প্রেসিডেন্সী জেলখানা থেকে এইমাত্র খালাস পেয়ে বাইরে এলাম। আঃ, কী তৃপ্তি। মুক্ত হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিচ্ছি, বুক ভরে—মুক্তির নিঃশ্বাস।···

॥ এগার ॥

—বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে আর যাবেন না কখনো না। ডাকলেও নয়। কেমন, মনে থাকবে তো?

—যদি যাই?

—বেশ, ইচ্ছে হয় যাবেন।

অস্বাভাবিক ভারী গলায় জবাব দিয়ে শমি মুখ ফিরিয়ে নিল। লেকের একেবারে একপ্রান্তে পাশাপাশি বসেছি দু'জনে একটি গাছের ছায়ায়। বালিগঞ্জ থেকে ফিরে সোজা থিয়েটারে গিয়েই শমির টেলিফোন পেয়ে এসেছি সংকেত স্থানে। বিশেষ জরুরী দরকার আছে নাকি ওর, আসতেই হবে। ও আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল, দূরে আমায় দেখতে পেয়ে ইশারা করে সামনে এগিয়ে চলল। নিঃশব্দে আমি চললুম ওর পেছনে! এই গাছতলাটি পছন্দ হ'ল শমির! খানিকটা অন্ধকার, গাছের গুড়িতে একটুখানি আড়াল তৈরী হয়েছে! সান্ধ্য ভ্রমণাভিলাষী জনস্রোতের মাঝখানে এ যেন একটি নির্জন দ্বীপ! উচ্ছ্বসিত হাসি আর কোলাহল থেকে থেকে আছড়ে পড়ে, ছোট্ট দ্বীপকে গ্রাস করবে বুঝি। শমি ভয় পেয়ে চমকে ওঠে! ভীরু চোখে এদিক ওদিক তাকায়—ঢেউ-এর গায়ে ঢেউ ভেঙ্গে পড়ে, মিলিয়ে যায়।

—বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড এমন একটি দ্রষ্টব্য স্থান নয় যে সেখানে আমায় যেতেই হবে। আকর্ষণ স্থানের প্রতি নয়, ব্যক্তি বিশেষের প্রতি। সেই বিশেষ ব্যক্তিটি না থাকলে, সেখানে যাবার কি হেতু থাকতে পারে?

—ইচ্ছে না থাকলেও আপনাকে জোর করে নিয়ে যাবে। কৌতুক বোধ হ'ল! হেসে জিজ্ঞাসা করলুম ঃ

—এতখানি গায়ের জোর কার ?

—হাসবেন না। গায়ের জোরের কথা নয়, নানা রকম ছুঁতো করে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে!

—তার মানে ?

এবার শমির হাসবার পালা। আমার দিকে তাকিয়ে ওর ভুরু নাচতে লাগল। আঁচলের একটি প্রান্ত দাঁতের মধ্যে চেপে ধরে হাসি চাপবার ছলে বলল ঃ

—মানে, ও তরফেরও একটুখানি দুর্বলতা আছে।

—দূর! অসম্ভব! একেবারে বাজে কথা! ঠাট্টা কচ্ছ তুমি! হো হো শব্দে হেসে উঠলুম। এত জোর হাসির শব্দ শুনে আমাদের পেছন দিকের রাস্তার লোক ফিরে তাকাল। শমি ভয় পেয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল ঃ

—কি হচ্ছে! অত জোরে হাসলেন যে লোকগুলো ফিরে তাকাল! যদি চেনা জানা কেউ হয়! কী ভাববে বলুন তো!

চাপা গলায় জবাব দিলাম ঃ

—খেয়াল হয়নি! না, আর হাসব না।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে শমি একটু পরে বলল ঃ

—আমার কথা বিশ্বাস হয়নি! না? আপনাকে আর আমাকে নিয়ে যে কথা বলেছে, তাতো শুনলুম। আমার মনের অতলে কি আছে, আর কি নেই, তা জানবার জন্য ওঁর এত আগ্রহ কেন বলুন তো? স্বার্থহানি হলেই মানুষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অন্যের গতিবিধির ওপর নজর রাখে। চোরাকারবারীকে চোরাকারবারী ধরিয়ে দেয়। পাখী দিয়ে পাখী শিকারের মত—দুর্বলতা দিয়ে দুর্বলতাকে ধরবার চেষ্টা করে।

সায় দিলুম ওর কথায়। অনেক ক্ষেত্রে তা হয় বটে। কিন্তু তা হলেও একথা বিশ্বাস হতে চায় না।

—বিশ্বাস আপনি করুন আর নাই করুন, আমি জানি, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। কাছাকাছি বাড়ি বলে আমি প্রায়ই ও বাড়িতে থাকি! এর আগে দু'একটা ঘটনার কথা জানি।...ওঁকে দেখেছি, ওঁর দু'একটি বান্ধবীকেও দেখেছি। ওদের হামেশা এ ধরনের শখ হয়ে থাকে। নতুন ডিজাইনের সাড়ী, বা নতুন নতুন ভ্যানিটী ব্যাগ দুলিয়ে চলবার মত এও একটা ফ্যান্সি! স্রেফ ফ্যান্সি, আর কিছু নয়। তীব্র হেড লাইট ফেলে পেছনের রাস্তায় একটি ঝক্ ঝকে গাড়ী চলে গেল। চোখে আলোর ঝল্‌কানি লাগতেই শমি ত্রস্ত ভাবে সাড়ীর আঁচলটা মাথায় চাপিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। চাপা গলায় বলল: এই রে!

—কী হ'ল?

—আমাদের বাড়ির পাশের অনাদি ব্যানার্জির গাড়ী মনে হ'ল! দেখে ফেলেছে কিনা, কে জানে? আপনি থিয়েটার করেন, আপনাকে সবাই চেনে।

চিন্তিত মুখে একটুকাল মৌন থেকে শমি জিজ্ঞাসা করল:

—পরশু দিন সন্ধ্যেয় ৫টা থেকে ৫৷৷০টায় আসবেন একবার এইখানে?

জানালুম, আসব। শমি উঠে দাঁড়াল:

—আজ আর দেরী করতে পাচ্ছি না।...সোমবার ঠিক রইল কিন্তু।

যাবার জন্য পা বাড়িয়ে একটু ইতঃস্তত করল। কী যেন বলিবলি করেও বলতে পাচ্ছে না! একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে খুব আস্তে আস্তে বলল:

—পরশু দিন কার্শিয়াং যাচ্ছে। তিন দিনের জন্য।

জিজ্ঞাসা করলুম: কে?

—অলক চৌধুরী।

জনস্রোতের উচ্ছ্বসিত হাসি আর কোলাহল যে নির্জন দ্বীপকে গ্রাস করতে পারেনি, সেই নির্জনতা যেন চুরমার হয়ে গেল—অত্যন্ত

সন্তর্পণে উচ্চারিত ঐ একটি কথায়, একটি মাত্র নাম মৈনাকের মত মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল, দু'জনে বিপরীত দু'ধারায় ভেসে চললাম। সম্বিৎ ফিরে আসতে দেখি—শমি অনেকটা এগিয়ে গেছে। জনস্রোত পার হয়ে গোল-পার্কের দিকে।

সোমবার সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট স্থানে এসে শমির দেখা পেলুম না। কী আশ্চর্য! আমায় আসতে বলে, এল না! এরকম তো হবার কথা নয়। তবে কী কোনো কাজে আটকে পড়েছে! তাই বা এমন কী কাজ হঠাৎ এসে হাজির হ'ল যে একটিবার এসে বলে যেতে পারল না! একটু অভিমান হ'ল, রাগও হ'ল। অতদূর থেকে আনিয়ে এ হয়রানির মানেটা কি? অকস্মাৎ মনে একটা সন্দেহের দোলা লাগল। অলক চৌধুরীর কার্শিয়াং যাত্রা কি কোন কারণে বন্ধ হয়ে গেছে? তাই কি শমি আসতে পারেনি? উৎকণ্ঠিত ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। এমন সময় অদূরে পথের ধারে একখানি শাদা রঙের মরিস্‌টুরার্ এসে দাঁড়াল। স্টিয়ারিং ধরে বসে রয়েছেন একটি মহিলা। অস্পষ্ট অন্ধকারে মনে হ'ল তিনি যেন আমায় ইসারায় ডাকছেন, দু'একপা করে কুণ্ঠিত ভাবে এগিয়ে যেতে দেখি শর্মিষ্ঠা! আমি কাছে যেতে নিজেই গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বলল ঃ

—লেকে বড্ড ভিড়। একটু বেড়িয়ে আসব চলুন! বিহ্বল ভাব কাটিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়লুম।

শমি গাড়ি ড্রাইভ করে চলল নিউ আলিপুরের দিকে। নিউ আলিপুর ছাড়িয়ে ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরে। আমাকে একটু বিস্মিত দেখে হাসতে হাসতে বলল ঃ

—রোজ সকালে ড্রাইভ করি। অনেকদিন পর আজ সন্ধ্যাবেলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি। খানিকটা ছুটতে ইচ্ছে কচ্ছে। আঃ কতকাল পরে অন্ধকারে ছুটেছি।

হু-হু করে গাড়ি ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে মাল-বোঝাই

লরী তীব্র হেড লাইট জেলে দানবের মত গর্জন করে ধেয়ে আসে, তীব্র বেগে মিলিয়ে যায়। দু'ভাগ করা অন্ধকার আবার ঘন হয়ে জোড়া লাগে। দূরের বস্তিগুলিতে কেরোসিনের ডিবে জ্বলে, লাউ-কুমড়োর মাচায় আর পাটের ক্ষেতের আশে পাশে থেকে থেকে জোনাকি জ্বলে। হাওয়ার বেগে শমির শাড়ির আঁচল ফুলে ফুলে উঠছে, কোঁকড়ান চুলের গোছা ঝাঁপিয়ে পড়ছে কপালে, গালে। শমি আরামেই নিঃশ্বাস ফেলে বলে ঃ

—ভারী চমৎকার লাগছে। তাই না? ফিফ্‌টি মাইল স্পীডে চলেছি। আরও জোরে চালাতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বাধা দিয়ে বললুম ঃ

—উঁহু! যথেষ্ট জোরেই যাচ্ছে। শেষে এক্‌সিডেন্ট করে বসবে!

—এক্‌সিডেন্টের ভয় করেন আপনি? আমার কিন্তু বেশ মজা লাগে ছুটতে।

মনে পড়ে গেল কাশ্মীরের কথা। সেই মুক্ত পক্ষ বলাকা। জিজ্ঞাসা করলুম ঃ

—বলাকার মত। তাই নয়?

শমির মুখের পানে তাকালুম। কথা শুনে ও অন্যমনস্ক হয়ে গেল, কি যেন ভাবতে লাগল। সেই কাশ্মীরের স্মৃতি রোমন্থন কিনা কে জানে! একটু বাদে অনেকটা আপন মনেই বলল ঃ

—বলাকা নয়, বন্দী বিহঙ্গ! ডানা ঝাপটায়! সোনার খাঁচা মুক্ত আকাশের পথ আগলে রাখে।

ঈষৎ অন্ধকারে ওর গলার স্বর কাঁপছিল, মুখে ফুটে উঠেছিল বেদনার ছায়া।

অত্যন্ত সংকোচ বোধ হ'ল। তবু বললুম ঃ

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? যদি জবাব দাও—

শমি সোজা হয়ে বসল ঃ

—দেব। তবে কি জিজ্ঞাসা করবেন, তাও জানি! আমার কথা, তাই নয়?

মাথা নেড়ে জানালুম, তাই। ও বলতে লাগল ঃ

—কাশ্মীর থেকে ফিরে আসবার পর দু'বছরের কথা জানিয়েছি চিঠিতে। তারপর বাবার হঠাৎ থ্রম্বসিস্ অফ্ হার্ট্। মারা গেলেন তিনি!

চমকে উঠলুম ঃ

—তোমার বাবা!

শমি নির্লিপ্তের মত জবাব দিল—হ্যাঁ! ওর গলার স্বরে এবার আর কাঁপুনি নেই। এতটুকু বেদনা নেই। ওর বাবা যে ওর জীবনের কতখানি যায়গা জুড়ে ছিলেন, তার খানিকটা আভাস পেয়েছিলুম, কাশ্মীরে সেই ক'টি দিনের পরিচয়ে। বুঝলুম কেঁদে কেঁদে—কান্না ওর ফুরিয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাই এমন নির্লিপ্ত ভাবে কথা বলে ঃ

—বাবার ইচ্ছে ছিল, অলক চৌধুরীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়! মরবার সময়ও সেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আমি কথা দিয়েছিলুম বাবাকে। সে কথা আমি রেখেছি।

শমি থামল। কিন্তু তারপর? অসংখ্য প্রশ্ন জাগল আমার মনে। ভিড় করে এল তারা। কিন্তু একটি কথাও জিজ্ঞাসা করতে সাহস হ'ল না। শমি চুপ করে আছে। চুপ করেই থাক। আজ ওকে ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। বাইরে তাকালুম। পথের দুপাশে বড় বড় গাছ। দু'ধারে ছায়া পড়েছে। ঘন একটানা ছায়া।

—অনেক দূরে এসেছি শমি। ফিরবে এবার? শমি চমকে উঠল। হাতের ঘড়ির দিকে নজর দিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল ঃ

—হ্যাঁ, ফিরেই চলুন।

ফিরতি পথে শমি বিশেষ কথা বলল না। আমিও না। মনের ভেতর নানা জিজ্ঞাসা উঁকি দিচ্ছে। তাদের নিয়ে আপন মনেই নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। তাস নিয়ে একা একা রঙ মেলানো খেলা।

গাড়ি আলিপুর ব্রীজ পার হয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে আসতে শমি জিজ্ঞাসা করল ঃ

—এখন কোথায় যাবেন ?

—একবার থিয়েটারে যেতে হবে। দুপুর থেকে এই রাত পর্যন্ত থিয়েটারের কোনো কাজই করা হয়নি।

—চলুন তবে, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসছি।

—সে কী! না না, তোমায় যদি কেউ দেখে ফেলে!

—দেখলেই বা! আপনার নিজের দিক থেকে কোন আপত্তি নেই তো ?

—রামচন্দ্র! আমি বলছি, তোমার জন্য!

—আমার জন্য ভাবি না, মিথ্যা জুজুর ভয় করে নিজের ক্ষতি করেছি। ভেবে দেখলুম, ওসব ভয় আমার মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

ও যেন আজ রাত্রে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিদ্রূপ করে বললুম ঃ

—এত সাহস একজন কার্শিয়াং চলে গেছে বলে। তাই নয় ?

—মোটেই না। দেখবেন, এরপর তাকে নিয়েই থিয়েটার দেখতে যাবো।

কথাটা বিশ্বাস হ'ল না। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলুম ঃ

—পারবে যেতে ? সত্যি বলছ ?

শমি জোর দিয়ে বলল ঃ

—পারি কি পারি না, সামনের হপ্তাতেই দেখতে পাবেন।

—আমি কি করে দেখবো ? ধরে নিলুম, দু'জনে একসঙ্গে থিয়েটারে আসবে। কিন্তু আমার সীন এলে মাথা তুলে তাকাবার সাহস হবে কি ? তখন যে পাশে বসে থাকবেন স্বয়ং মূর্তিমান জুজু।

হো হো শব্দে হেসে ফেললুম। শমির মুখ লাল হয়ে উঠল। আমার কথার আর কোনো জবাব না দিয়ে শমি গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দিল। থিয়েটারে পৌঁছে গেছি। আমায় নামিয়ে দিয়ে গাড়ি গ্রে ষ্ট্রীট ধরে সেন্ট্রাল এভিন্যুর দিকে ছুটল।

সেদিন কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম, কিন্তু রবিবার সন্ধ্যার সময় বুঝলুম, শমি এতটুকু পরিহাস করেনি। সোজা এসে হাজির হ'ল থিয়েটারের দোতলায় আমার ঘরে। এই ঘরেই আমি বসি, লিখি, অভিনয়ের সময় মেক্-আপ নিই। সেদিন ছিল তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বালাজীরাও'-এর অভিনয়। প্রথম শো অভিনয় হয়ে যাবার পর আমেদ আবদালির রূপসজ্জা নিয়ে ইজি চেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম কচ্ছি। হঠাৎ দরজার ধারে সাড়া পেলুম ঃ

—ভেতরে আসব ?

চম্‌কে উঠে মুখ বাড়ালুম। শমি একা, সঙ্গে আর কেউ নেই! ব্যস্ত হয়ে বললুম ঃ

—এসো, এসো! কি আশ্চর্য! সত্যিই এলে তা হলে! উনি ?

—নিচে অডিটোরিয়ামে বসেছে। আমি বললুম, ভিড় ভাল লাগে না, দোতালায় ফিমেল সীটে বসব। প্লে ভাঙলে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমার সঙ্গে এই কন্‌ডিশন হয়েছে।

—অদ্ভুত ভাবে ম্যানেজ করেছ। কিন্তু ভাবছি, থিয়েটার দেখতে রাজী করালে কি করে ?

শমি একটুখানি হাসল। বাঁ হাতের মুঠোয় চেপে ধরা ছোট রুমালখানি একবার কপালে ও নাকের দুপাশে বুলিয়ে নিল, অত্যন্ত হাল্কা একটি মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল। কানের হীরের দুল দুটি একটু নড়ে উঠল, ঠিকরে পড়ল এক ঝলক আলোর রশ্মি। আদুরে মেয়ের মত গলার স্বরে খানিকটা আব্দার মিশিয়ে বলল ঃ

—আমরা ইচ্ছে করলে সব কিছুই করিয়ে নিতে পারি। বুঝলেন ?

জবাব দিলুম না, শুধু হাসলুম। ভাদ্রের ভরা নদীর মত দুকূল প্লাবিনী এই লাবণ্যময়ীর পানে তাকিয়ে মনে পড়ল ঃ

"মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল।"

অলক চৌধুরী তোমার অনুরোধে থিয়েটার দেখতে আসবে সে আর বিচিত্র কি ? কথাটা জিজ্ঞাসা করাই বোকামি হয়েছে।

শমি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

—কে যেন আসছে! আমি পালাই এবার।

মুখ বাড়িয়ে দেখলুম এক অপরিচিত ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। দোতালায় ফিমেল সীটে যাবার জন্য আমার ঘরের ওদিকের দরজা খুলে দিলুম। যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল শমি :

—আবার কখন সময় হবে ?

আস্তে আস্তে বললুম :

—দ্বিতীয় অঙ্কে আমার সীনটা হয়ে গেলেই সোজা চলে এসো।

দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে ভদ্রলোককে ডাকলুম। নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই-এর চিঠি এনেছেন দুটি আসনের ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। ওঁকে প্রবেশ পত্র লিখে দিয়ে নিচে নামলুম। সাড়ে ছটা বেজেছে, অভিনয় আরম্ভ হবে এবার।

দ্বিতীয় অঙ্কে আমার দৃশ্যটি শেষ করে আবার ওপরে চলে এসেছি। শমি হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল।

—বাবা! কী নিষ্ঠুর! কী বীভৎস! জিজ্ঞাসা করলুম :

—কার কথা বলছ ?

শমি আমার পানে আঙ্গুল তুলে দেখাল।

—লাফিয়ে উঠে গাছ থেকে ডালিম ছিঁড়ে নিয়ে হাঁটুর উপর রেখে এক ঘুষিতে ভেঙ্গে ফেললেন! ঐ ভাবে বালাজী রাওয়ের মাথা ভাঙ্গতে চেয়েছিল আবদালী ?

ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম। শমির দু'চোখে বিস্ময় :

—ডালিমটা ওভাবে ঘুষি মেরে ভাঙ্গতে হাতে লাগল না ?

গম্ভীর ভাবে বললুম :

—এক ঘুষিতে যে বালাজীরাও-এর মাথা ভাঙ্গতে চায়—সেই দুরন্ত আফগানের হাত ব্যথা হবে ডালিম ভাঙ্গতে ? দেখলে না,

নিজেও তৃষ্ণার্ত—ওর ছেলেও তৃষ্ণার্ত। ছেলে জল খাচ্ছিল দেখে এক লাথি মেরে ছেলেকে ফেলে দিয়ে বলল :

—পহেলে মুঝে দে, এ গাধ্বিকে বাচ্চে!

ছেলের হাতের লোটা কেড়ে নিয়ে গল্‌গল্‌ করে জল ঢালল নিজের গলায়, মাথায়। ও লোককে তুমি কি সাধারণ মানুষ মনে কর?

শমি উত্তেজিত হয়ে বলল :

—আর ওই সৈনিকটার দশা! ইস, লাথি মেরে ফেলে দিয়ে নাকের মধ্যে তীর ঢুকিয়ে দেওয়া! দেখে সবাই শিউরে উঠল। আবদালী তার রক্ত হাতে মেখে হাসতে লাগল। মানুষ, না হিংস্র জানোয়ার ছিল আবদালী?

—মানুষ যখন শক্তিমত্ত হয়, ধ্বংসের নেশা যখন তার রক্তে আগুন ধরায়—তখন সে হয় জানোয়ারের চেয়েও হিংস্র। শমি আমার মুখের পানে তাকাল। তার সারা শরীর আন্দোলিত হ'ল। হঠাৎ যেন আপাদমস্তক শিউরে উঠল।

—আপনার দিকে তাকিয়ে দৃশ্যগুলি মনে পড়ে যাচ্ছে। কী বীভৎস লাগছে আপনাকে। মাথায় প্রকাণ্ড টাক, পেছনে দু'চার গোছা লাল চুল, মুখে সামান্য দাড়ি, তাও লাল, যেন রক্তমাখা, ফোলাফোলা ভুরুতে চুল নেই, ঠোঁট দুটো ভয়ঙ্কর মোটা, নাকের মাঝখানটা একেবারে বসে গেছে, ডগাটা চ্যাপ্টা বাঘের নাকের মত। এত ভয়ঙ্কর সাজলেন কি করে? কি লাগিয়েছেন নাকে, ভুরু আর ঠোঁটে?

—একে বলে প্লাস্টার মেক আপ্‌!

—তোলবার সময় কষ্ট হবে খুব?

—তা হয় বৈকি?...

ভুরুর একটা ধারের প্লাস্টার একটুখানি খুলে গিয়েছিল, সেখানে চাপ দিলুম। ঝরঝর করে অনেকখানি ঘাম বেরিয়ে এল, দু'চার ফোঁটা চোখে গিয়ে চোখ জ্বালা করতে লাগল। শমি আঁৎকে উঠে বলল :

—কি সাংঘাতিক। এত কষ্ট করে না সাজলে হয় না? না হয় একটু কম কুৎসিত দেখাতো?

ভুরুর প্লাস্টার ঠিক করতে করতে জবাব দিলুম:

—তাতে হয়তো আমার কষ্টটা কম হ'ত। কিন্তু চরিত্র রূপায়ন ঠিক হ'ত না!

—খুব হ'ত। অত কুৎসিত না হলেও হয়। অতটা জানোয়ারের মত হিংস্র ব্যবহার না করলেও কোনো ক্ষতি হয় না। এর চেয়ে সমুদ্র গুপ্ত অনেক ভাল বই।

আসল কথা শমি আমার এই ভয়াবহ মূর্তি সহ্য করতে পাচ্ছে না। ও চায় আমি সব বই-এ সমুদ্র গুপ্তের মত সুপুরুষ হয়ে দেখা দিই। কাঞ্চন মালার সঙ্গে মাধবী রাত্রে প্রাসাদ উদ্যানে প্রণয়কূজন-রত মূর্তিটি ওর কাম্য। তাই ও আজ আমাকে সহ্য করতে পাচ্ছে না। নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় আরম্ভের পূর্বে যে চিঠিখানি পাঠিয়ে ছিলেন—সেইখানি শমির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম: পড়! শমি পড়তে লাগল:

'গতকাল আপনার অভিনয় আমাদের দু'জনকেই বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। চরিত্রটির বর্বরতা আপনার অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। সত্যি, বাংলা মঞ্চে ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্র রূপায়ণে এ এক নতুন কন্‌সেপশন্! আপনার অভিনয় দেখে মনে হচ্ছিল ইতিহাসের পাতা থেকে বর্বর, নৃশংস, দস্যু আফগান সর্দার আহম্মদ শা আবদালী যেন রূপ ধরে আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত হয়েছে।......'

চিঠির ওপর থেকে চোখ তুলে শমি বলল:

—ওঁরা যাই লিখুন, এ চেহারা আমি স্ট্যাণ্ড করতে পারি না। কষ্ট হয় যেন। আপনার নিজের ভালো লাগে?

—শুধু ভাল লাগে বললে ভুল হবে। অনেক দর্শকের সঙ্গে আমারও অভিমত—আজ পর্যন্ত যত চরিত্রে রূপদান করেছি—তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ না হোক—অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র এই আমেদ আবদালী।

একটি জিনিস দেখাচ্ছি তোমায়। আলমারি থেকে বার করলাম তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "যুগ বিপ্লব" নাটক। সেখানি দেখিয়ে বললাম ঃ

—এই বইখানি তারাশংকর লিখেছিলেন অন্য একটি থিয়েটারের জন্যে। বই লেখা শেষ হলে তাঁরা পছন্দ করলেন না। তারাশংকর বইখানিকে ছাপালেন। ছাপার বই আমার হাতে পড়ল। ইচ্ছামত এডিট করে নিয়ে আমি এই বই-এরই নাম দিয়েছি বালাজীরাও। তারাশংকরের লেখা ভূমিকাটি পড়ছি। শোনো—

"নাটকখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে যাবার পর অকস্মাৎ স্টার রঙ্গমঞ্চের সুযোগ্য পরিচালক নাট্যকার এবং নট শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত বইখানি পড়ে খুশী হয়ে বইখানিকে মঞ্চস্থ করবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি সানন্দে সম্মতি দিই। মিনার্ভা যে নাটক প্রত্যাখ্যান করেছেন—সেই নাটক তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদে অভিনন্দিত করে মঞ্চস্থ করতে যাওয়ার কথা আমি ভুলব না। বিস্মিত হইনি। কারণ, অনেকদিন পূর্বে দুটি রঙ্গমঞ্চ আমাকে নাটকের জন্য বলেন—তখন আমার হাতে নতুন নাটক না থাকায় 'কালিন্দী' মঞ্চস্থ করতে বলেছিলাম। সে সময় তাঁরা পুরানো বলে মঞ্চস্থ করেন নি। কিন্তু 'কালিন্দীর' সম্ভাবনা সম্পর্কে আমার প্রত্যাশা ছিল। নাট্য-নিকেতনে মাত্র ২৫ রাত্রি অভিনয়ের পর মামলা সূত্রে নাট্য-নিকেতন উঠে যাওয়ার জন্যই 'কালিন্দী' বন্ধ হয়েছিল। আরও বেশ কিছুদিন 'কালিন্দী' চলবে এ প্রত্যাশা আমার ছিল। এই ঘটনার কিছুদিন পরই শ্রীযুক্ত গুপ্ত নিজে এসে 'কালিন্দী' বই মঞ্চস্থ করবার প্রস্তাব করেন। এবং 'কালিন্দী' অভিনয় সে সময় রঙ্গমঞ্চের সাফল্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ চিহ্নপাত করে। ঠিক এই কারণেই এবার শ্রীযুক্ত গুপ্তের প্রস্তাবে আর বিস্মিত হইনি। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্তের গুণগ্রাহিতা এবং বিচারশক্তি আছে বলেই বিস্মিত হইনি।

শ্রীযুক্ত গুপ্ত আবদালীর ভূমিকায় অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন। এর জন্য প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে, আবদালীর প্রবেশ দৃশ্যে, তৈমুরকে নিয়ে ওপার থেকে এপারে আসা এবং মাথায় জল দেওয়া, ফল ছিঁড়ে ভেঙে পেশবাকে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেওয়া ইত্যাদি অংশটুকু এবং দ্বিতীয় অঙ্কের

শেষ দৃশ্যে তৈমুরের শাসন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার অংশটুকু তিনি নিজে রচনা করে নিয়েছেন।

নর্তকীদের একখানি গানও তিনি রচনা করে নিয়েছেন। এবং অল্প সময়ের মধ্যে যে কঠিন পরিশ্রম করে বইখানিকে তিনি অভিনয়ে সার্থক করে তুলেছেন—সে দেখে এই কথাই মনে হয়েছে যে, এই সাধনায় তিনি জীবনে অসাধারণ সাফল্য লাভ করবেন। রঙ্গমঞ্চে তিনি ব্যবসায়ী নট নন। তিনি নিষ্ঠাবান পরিচালক। এবং তাঁর এই জীবন সাধনায় আজও পর্যন্ত ফাঁকি ঢুকে বসেনি। রঙ্গমঞ্চকে তিনি ভালবাসেন।……”

ওয়ার্ণিং বেল বেজে উঠল। এবার তৃতীয় অঙ্ক অভিনয় আরম্ভ হবে। দুজনেই উঠে দাঁড়ালুম। হঠাৎ একটি কথা মনে পড়ে গেল! শমিকে বললুম ঃ

—বলতে ভুলে গেছি। বালিগঞ্জ সাকুর্লার রোড থেকে দু'দিন টেলিফোন পেয়েছি এর মধ্যে।

—তাই নাকি!

কৌতুক ও আগ্রহে শমির চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল যেন। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করল ঃ

—কি! কি বলছিল?

—তোমার সঙ্গে দেখা হয় কি না,—তুমি কোনো ফোন করেছ কিনা এই ধরনের সব জিজ্ঞাসা।

—জবাবে কি বললেন?

—যা বলবার তাই বললাম। সব স্রেফ্ অস্বীকার। মনে হ'ল ওঁর ষোল আনা বিশ্বাস হচ্ছে না আমাকে। যত এড়াতে চাই, ততই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন। আবার বলেন কি জান?—আমার কথায় বার্তায় আর নাকি উত্তাপ নেই। ঠাণ্ডা মেরে গেছি। আমি বললাম, আপনাদের কাণ্ডকারখানা দেখে ভয়ে যে জমাট বরফ হয়ে যাইনি, এই যথেষ্ট। শমির টানা ভুরু দুটি ধনুকের মত বেঁকে গেল। পাতলা দুটি ঠোঁট একটুখানি কাঁপিয়ে শাসনের ভঙ্গিতে বলল ঃ —হুঁ!

আলোর ফ্লিকার্ দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি নিচে নামবার সংকেত।

—যাচ্ছি এবার। আজ আর দেখা হবে না। প্লে ভাঙলেই তো—সিঁড়ির কাছে—। শমি মৃদু হেসে পালিয়ে গেল।

স্টেজের দিকের জানালা খুলে দেখলাম। প্রথম দৃশ্য অভিনয় সুরু হয়ে গেছে। দ্বিতীয় দৃশ্য আমার। ছাদ পার হয়ে নেমে এলাম নিচে।

৷৷ বার ৷৷

অভিনয় শেষে রঙ তুলে সবে জামা কাপড় পড়েছি, ছাদের দিক থেকে ভারী গলায় আজ এল ঃ

—হ্যালো, এম. জি. আছ ঘরে ?

গলা শুনেই চিনেছি স্বনামধন্য নট ছবি বিশ্বাস। উঠে দাঁড়িয়ে রিসিভ্ করলুম ঃ

—আসুন, আসুন ! ক্যা তাজ্জব। এম. জি. মানে ? অ্যাম আই মিনিমাম্ গ্যারান্টি ?

ছবিবাবু আমার সামনের চেয়ারটাতে বসে টেবিলে একটি চাঁটি মেরে বললেন ঃ

—নো, ইউ আর মাক্সিমাম্ গ্যারান্টি অর এম. জি. ইউ আর মেট্রো গোল্ডউইন মেয়র।

ছবিবাবুর বলার ভঙ্গিতে হোহো করে হেসে উঠলাম। একটা সীগ্রেট ধরিয়ে কেস্‌টা এগিয়ে দিতে উনি বললেন ঃ

—নো থ্যাঙ্কস্ ! তুমিতো জান, আমি সিগ্রেট ছেড়ে দিয়েছি।

কুণ্ডলিত ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিলাম ঃ

—ভুলে গিয়েছিলাম।

—শোনো বন্ধু, যেজন্য এসেছি। অভিনেতৃ-সংঘ মিনার্ভায় মিশরকুমারী অভিনয়ের আয়োজন করেছে। তোমায় সে রাত্রে নামতে হবে।

—সম্মিলিত অভিনয়!

চুপ করে রইলাম। আমায় ইতঃস্তত করতে দেখে ছবিবাবু বললেন:

—কোনো ওজর শুনব না। যদি কিছু শুনে থাক—সব ভুল। মাইন্ ইজ্ এ ক্লীন্ শ্লেট! কতদিনের বন্ধুত্ব তোমার সঙ্গে মনে করে ছাখো তো?

ওঁর চোখের পানে তাকিয়ে দেখলাম একটিবার। আপত্তি করতে পারলাম না আর।

—ঠিক আছে। অভিনয় করব। কি আমায় করতে হবে?

—যে চরিত্র তোমার খুশি। সামন্দেশ করবে?

—না, না, সামন্দেশ তো আপনি? মিশরকুমারী নাটকে আমি এর আগে অভিনয় করিনি। আপনাদের যা তৈরী 'রোল্' আছে, আপনারা তাই করবেন। যেটি বাকি থাকবে—আমি নামব সেই চরিত্রে।

—ঠিক আছে। খুশি হলুম বন্ধু। বন্ধুত্বের মর্যাদা আমরা দুজনেই রাখতে পেরেছি। ইজ্ নট্ ইট্?

আমার একখানি হাতে পরম আন্তরিকতার সঙ্গে একটু চাপ দিয়ে ছবিবাবু বিদায় গ্রহণ করলেন।

সামান্য একটুখানি ঘটনা ঘটেছিল। আর পাঁচজন শুভার্থীর কল্যাণে সেই সামান্য ঘটনাটিই অসামান্য হয়ে উঠেছিল কিছুদিন আগে—নাট্য সম্রাজ্ঞী সরযুবালার পুরস্কার রজনী উপলক্ষ্যে 'চন্দ্রশেখর' অভিনয়ে। নটসূর্য, নটশেখর, ছবি বিশ্বাস প্রমুখ বাংলার সমস্ত দিকপাল অভিনেতা এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মিলন হয়েছিল—মিনার্ভা থিয়েটারে সেই অভিনয় রাত্রে। নবাবের ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করেছিলাম আমি। শ্রেষ্ঠ নট-নটীর সম্মিলিত অভিনয়ে সেই আমার প্রথম মঞ্চাবতরণ। এতে অনেকে খুশি হলেন, আবার কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত হলেন। কি কারণে জানি না সংবাদ-পত্রের

বিজ্ঞাপনে আমার নাম নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলা সুরু হ'ল। কোনো দিন বিজ্ঞাপনের শীর্ষদিকে, কোনো দিন মাঝখানে, আবার কোনোদিন বা সাধারণ সৈনিক-প্রহরীর চরিত্রে যাঁরা রূপদান করেন —তাঁদের দলের মধ্যে একটি কোণে আমার নাম বিজ্ঞাপিত হ'ল। ব্যাপারটি অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু মনে হ'ল এবং কেউ কেউ আমাকে এসে জানালেন যে এভাবে নাম প্রচারটা উদ্দেশ্যমূলক। আমি মিনার্ভার বিজ্ঞাপন প্রেরক এবং ম্যানেজার উভয়কেই এবিষয়ে অবহিত হতে বললাম। যাঁকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম, তিনি ফিরে এসে বললেন—মিনার্ভার বেতনভোগী একজন কর্মচারী উদ্ধত ভাবে বলে পাঠিয়েছেন, 'নাম যেখানে দেওয়া হচ্ছে—ঠিকই হচ্ছে। আবার কোথায় দিতে হবে শুনি?' অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলাম, সোজা চলে গেলাম মিনার্ভা থিয়েটারে। সেখানে নাট্য-সম্রাজ্ঞী ছিলেন, মিনার্ভার ম্যানেজার ছিলেন, পূর্বোক্ত কর্মচারীটিও উপস্থিত ছিলেন। আমি প্রথমে নাট্য-সম্রাজ্ঞীকে বললাম: আমি ওঁদের সঙ্গে দু'একটি কথা বলতে এসেছি, আপনার সঙ্গে আমার যে প্রীতির সম্পর্ক—তাতে স্থির জানবেন—কাল যদি খবরের কাগজে আমার নাম প্রকাশিত না-ও হয়—তবু আমি অভিনয় করব। আপনাকে আমার অনুরোধ, এঁদের সঙ্গে যে সব কথা বলব—তা' আপনি কানে তুলবেন না। বা শুনলেও তিলমাত্র আমায় ভুল বুঝবেন না।

নাট্য-সম্রাজ্ঞী অনুমানে হয়তো বুঝেছিলেন—আমি কি বলতে এসেছি, অথবা সেই অভিনয় রাত্রির নানা ঝামেলা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে এসব ব্যাপার এতটুকু খেয়াল করেন নি। কোনো জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন আমার পানে। আমি মিনার্ভার ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলাম:

—খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন লেখার ভার কার ওপর? তিনি আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন সেই বৃদ্ধ কর্মচারীটিকে, যিনি থিয়েটারের বহু শিল্পীর শুভার্থী। অথচ শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি

করতে সর্বদা পুরান বর্ণিত দেবর্ষির মতই উদ্‌গ্রীব। তাঁকে লক্ষ্য করে বললাম: গল্প শুনেছি, দানীবাবুর সঙ্গে শিশিরকুমারের প্রথম সম্মিলিত অভিনয় রজনীতে নাকি শিশিরকুমারের অনুরাগীদের মধ্যে কেউ বলেছিলেন,—বুড়ো দানীবাবুকে আজ আচ্ছা জব্দ হতে হবে শিশিরকুমারের সঙ্গে অভিনয় করতে এসে। সে কথা শুনে দানীবাবুর চোখে জল এসেছিল। তিনি বলেছিলেন—আমি যদি বাপীর সন্তান হই, তাহলে কাল বাপীর আত্মা আমাকে আশ্রয় করে অভিনয় করবে। সেদিন প্রফুল্ল নাটক অভিনয় কালে দানীবাবুর যোগেশ চরিত্রের অভিনয় দেখে দর্শকরাও বুঝেছিলেন, দানীবাবুর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। মনে হয়েছিল, নিজে গিরিশচন্দ্রই অভিনয় করছেন যোগেশরূপে। সেই গল্প অনুসরণ করে আমিও বলছি, নবাব চরিত্রে স্বর্গতঃ নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় আপনারা যদি সবচেয়ে সাফল্যমণ্ডিত মনে করেন—তাহলে কাল আমার ভেতরে থেকে সেই নির্মলেন্দু লাহিড়ী অভিনয় করবেন। জিজ্ঞাসা করেছেন, আমার নাম খবরের কাগজে কোথায় দিতে হবে? তাহলে শুনুন, কাল বাংলা দেশের সমস্ত দর্শক আমার অভিনয় দেখে আপনাকে জানিয়ে যাবেন—যে আমার নাম কোথায় দেওয়া উচিত!

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলাম মিনার্ভা থিয়েটার ছেড়ে। উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কাঁপছিল।···বাড়ি ফিরে এসে সারারাত ঘুম হ'ল না। একটি সামান্য লোকের ঔদ্ধত্য ও অবিনয় সহ্য করতে না পেরে এত বড় কথা বলে এলাম! আমিও তো দম্ভ প্রকাশ করেছি? দর্পহারী যদি আমার দর্পও চূর্ণ করে দেন? তখনই মনে হ'ল: না, কোনো দোষ করিনি। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।' অবিচারের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করেছি, ভগবান আমায় সাহায্য করবেন। সাধারণতঃ আমি মন্দিরে যাই না, ঠাকুর দেবতাকেও বিশেষ স্মরণ করি না। কিন্তু পরদিন ভোর বেলায় মনে হ'ল দক্ষিণেশ্বরে কে যেন আমায় আকর্ষণ করছে! মন্ত্রমুগ্ধের মত চলে গেলাম, অনেকক্ষণ মন্দির চত্বরে মাথা ঠেকিয়ে

পড়ে রইলাম। বাড়ি ফিরে এসে বারবার স্মরণ করলাম নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্রকে, আর যাঁর নাম করে বড় গলায় চ্যালেঞ্জ করে এসেছি সেই বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ীকে। মিনার্ভায় আমার সাজবার ব্যবস্থা হয়েছিল ওপরের ঘরে—নটসূর্য, নটশেখর প্রভৃতি যেখানে বসে রূপসজ্জা গ্রহণ করেন। আমি সে ঘরে যেতে রাজী হলুম না। ওখানে থাকলে নানা লোক আসবে, কথা কইতে হবে। সিঁড়ির নিচে ছোট্ট একটি নির্জন ঘর বেছে নিলাম। মেক্‌আপ কচ্ছি, মনে মনে নবাবের ভূমিকা আবৃত্তি কচ্ছি, আর মাঝে মাঝে স্মরণীয় পূজনীয়দের আশীর্বাদ ভিক্ষা কচ্ছি অন্তরের অন্তস্থল থেকে। আশীর্বাদ আমি পেয়েছিলাম, একটি অনির্বচনীয় প্রেরণা আমার সমস্ত দেহের শিরায় শিরায় গভীর আত্ম-প্রত্যয় এনে দিয়েছিল—জীবনে কখনো তেমনটি আর অনুভব করিনি! অভিনয় কালে প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল—আমি যেন অভিনয় কচ্ছি না, আমার ভেতর থেকে এক অলৌকিক শক্তি নটরূপে নিজেকে প্রকাশিত কচ্ছে! তার পূর্বে এবং পরে বহু রাত্রি আমি চন্দ্রশেখর নাটকে নবাব চরিত্রে রূপদান করেছি। দর্শকমণ্ডলীকে খুশিও করেছি। কিন্তু সেই বিশেষ রাত্রের অভিনয়ের সঙ্গে অন্য দিনের অভিনয়ের তুলনা করতে গেলে নিজেরই সঙ্কোচ বোধ হয়। ওরকম রাত্রি জীবনে সহসা আসে না। যদি বা আসে, একটি রাতই আসে, দুটি রাত নয়।

চন্দ্রশেখর অভিনয়ের পর পেয়েছিলুম বহুজনের অভিনন্দন। অভিনন্দনের পালা শেষ হতে না হতেই, অনেকে বহন করে আনলেন গোপন গুঞ্জরণ। বাংলা দেশের শিল্পীরা নাকি আমার সঙ্গে আর কোনো সম্মিলিত অভিনয়ে যোগদান করবেন না! এবং তার প্রধান কারণ, সেই শুভার্থী দেবর্ষি টেলিফোন যোগে এবং স্বয়ং ট্রামগাড়ি যোগে শিল্পীদের বাড়ি বাড়ি নানাপ্রকার কল্পিত কাহিনী বর্ণনা করে এসেছেন অভিনয়ের পূর্ব রাত্রির ঘটনাকে কেন্দ্র করে। কথাটা যখন

নানা জনের মুখে শুনলাম, নিজে গিয়ে উপস্থিত হলাম নটসূর্যের গোপাল নগরের বাড়িতে!

—নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশাইএর সঙ্গে ছিল আমার অন্তরের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তিনি আজ নেই। তাঁর অবর্তমানে রঙ্গজগতে আপনার চেয়ে শ্রদ্ধেয় নিকট আত্মীয় আর আমার কেউ নেই। সম্মিলিত অভিনয়ে আপনি আমার সঙ্গে অভিনয় না করুন—তাতে কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু ভুল বুঝাবুঝির ফলে যদি আপনার সঙ্গে আমার অন্তরের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় তবে সে দুঃখ রাখবার ঠাঁই থাকবে না আমার।

নটসূর্য একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমার কাঁধে একখানি হাত রেখে বললেন ঃ

—আপনি তো জানেন, থিয়েটারের লোকের কথায় কান দিয়ে আমি কখনও ভুল করি না। যে যা বলে শুনে যাই, কিন্তু কাজ করি নিজের বিচার শক্তির সাহায্যে। অভিনয় আপনার সঙ্গে করব, সুযোগ এলেই করব। আমার বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাড়ি ফিরে এলাম! বুক থেকে যেন একটা পাথরের ভার নেমে গেল। তারপর ভাবলাম, ছবিবাবুর কথা। সেদিন ওঁর প্রতাপের ভূমিকায় অভিনয় করবার কথা ছিল। কিন্তু বাগানে ফুল গাছের পরিচর্যা করবার সময় ওঁর পায়ে নাকি বিছেয় কামড়েছিল, তাই সেদিন উনি অভিনয় করতে পারেন নি। দেখাও হয়নি সেই থেকে ওঁর সঙ্গে। একদিন যাবো ভাবছিলাম—দেখা করতে, ইতিমধ্যে উনি নিজেই এসে হাজির হলেন 'মিশর-কুমারী' অভিনয়ের প্রস্তাব নিয়ে। ওঁর কথায়, আচরণে আমার মনে সংশয়ের ছায়াটুকু রইল না। তরল পরিহাসচ্ছলে উনি অভিনয়ের প্রস্তাব এনেছিলে। অভিনয় কালেও চলেছিল আমাদের দু'জনের মধ্যে তেমনি নির্মল হাস্য কৌতুক। ছবিবাবু সামন্দেশ, আমি সেজেছিলাম হারেম্হেব। সায়া ও রামশিসের বিবাহ সভায়—'বৎস রামেশিস, মা সায়া, এসো, হাতে হাত দাও' সামন্দেশের এই

বক্তব্য অংশটি ভুল করে আমি বলে ফেলেছিলাম। ছবিবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'সম্রাট ও আমার বক্তব্য। তুমি বলছ কেন?' নিজের ভুল বুঝতে পেরে, আমিও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম,—'ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন প্রভু! আপনার বক্তব্য হলে আপনিই বলুন।' শুধু সেই রাত্রে নয়, তারপর সাজাহান নাটকে ছবিবাবু দিলদার, আমি ঔরঙ্গজেব; চরিত্রহীনে ছবিবাবু সতীশ আমি শিবপ্রসাদ; দুই পুরুষে ছবিবাবু সুটবিহারী, আমি সুশোভন; পি-ডবল্যু-ডিতে ছবিবাবু সৌম্যেন, আমি মিঃ সেন ইত্যাদি চরিত্রে বহুবার অভিনয় করেছি এবং সুযোগ পেলেই পরস্পর পরস্পরকে কৌতুক বাণে জর্জরিত করেছি। অবিশ্যি তাতে নাটকের রস হানি হয়নি, বরং বহুস্থলে নূতন রসের সঞ্চার হয়েছে। দর্শকগণ খুশিই হয়েছেন।

নটসূর্যও শুনেছি প্রথম জীবনে অভিনয় কালে মাঝে মাঝে সহ-অভিনেতাকে কৌতুক করতেন। তবে আমি যতদিন তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছি, কোনোদিন লক্ষ্য করিনি। অবিশ্যি আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বন্ধুত্বের নয়, শ্রদ্ধার। তাই হয়তো আমার উপস্থিতিতে তিনি কখনো কৌতুক করেন নি। আর নটসূর্যের কাছ থেকে ও ব্যাপারটি আমি ভাবতেই পারি না। অমন বাকসংযমী লোক, প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি কাজ যাঁর নিক্তির মাপে ওজন করা—তাঁর তরল হাস্য কৌতুক কল্পনার বাইরে। নটসূর্য সম্বন্ধে গল্প শুনেছি কোনো নূতন অভিনেতা থিয়েটারে এসে কি ভাবে কাজ করতে হবে—নটসূর্যের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। নটসূর্য বললেন:

—তোমার নিজের ওপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, তার বাইরে এক তিল কিছু করতে যাবে না। ওজন করে কাজ দেবে, ওজন করে দাম নেবে।

নূতন অভিনেতা বললেন:

—কথাটা আর একটু খুলে বলুন।

নটসূর্য একটি উদাহরণ দিলেন ঃ

—ধরো, থিয়েটারে অভিনয় করতে এসেছ। হঠাৎ দেখলে, থিয়েটারে আগুন ধরে গেছে! তখন তুমি কি করবে?

—তাড়াতাড়ি বালতি নিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করব।

—নাঃ। তা করবে না। তুমি থিয়েটার থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াবে উল্টো ফুটপাতে!

নূতন অভিনেতা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—একথা বলছেন কেন? আগুন নেভাবার চেষ্টা করব না কেন?

—চেষ্টা করবে না, তার কারণ থিয়েটার ফায়ার ইন্‌সিওর করা থাকতে পারে! এ অগ্নিকাণ্ড কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাকৃত নয়—তাই বা তুমি কি করে জানলে? আগুন নেভাতে গিয়ে সেক্ষেত্রে তুমি উপকারের পরিবর্তে হয়তো মালিকের ক্ষতিই করে বসবে!

নূতন অভিনেতা মাথা চুলকিয়ে আমতা আমতা করে বললেন ঃ

—আচ্ছা বেশ, আগুন নেভাব না। তারপর উল্টো ফুটপাতে গিয়ে কী করব?

—সেখানে দাঁড়িয়ে দেখবে, আগুন নিভল কিংবা সব জ্বলে পুড়ে গেল। যেটাই হোক না কেন, মোট কথা আগুনের কাজ শেষ হয়ে গেলে তুমি থিয়েটারের মালিকের সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে—স্যার, আজ কি অভিনয় হবে? তিনি যদি বলেন—না, হবে না—তখন বাড়ি চলে যাবে।

প্রশ্নকারী এবারও প্রতিবাদ করলেন ঃ

—থিয়েটারে আগুন লেগে গেলে সেদিন অভিনয় হবে না, এতো জানা কথা। মালিককে আবার জিজ্ঞাসা করতে যাবো কেন?

—জিজ্ঞাসা করবে এই জন্যে, মালিক যদি পরে বলেন, থিয়েটার জ্বলুক আর যাই হোক আমি অভিনয় করাতুম। না জানিয়ে চলে

গিয়ে অভিনয় বন্ধ করিয়েছ। সুতরাং তোমায় 'ড্যামেজ' দিতে হবে। তাই মালিকের কাছে অনুমতি নিয়ে 'ড্যামেজ'-এর দায় থেকে রেহাই পেতে বল্‌ছি। বুঝেছ!

জবাব শুনে প্রশ্নকর্তার চোখ কপালে উঠল। মুখে আর কথা ফুটল না। ঘাড় নেড়েই জানালেন, বুঝেছি।

গল্পটি অবিশ্যি খুবই কৌতুককর। হয়তো নটসূর্য নিজেই এ গল্প শুনে হেসে ফেলবেন। তবু শ্রদ্ধেয় হেরম্ব মৈত্র মশাই-এর সম্বন্ধে যেমন বহু মুখরোচক গল্পের সৃষ্টি হয়েছে, নটসূর্য সম্বন্ধেও রঙ্গজগতে তেমনি নানা কাহিনী রসিক জনের জিহ্বাগ্রে বিস্তার লাভ করেছে। যে গল্পটির উল্লেখ করলাম তার ডাল পালা কেটে বাদ দিয়ে—কাণ্ডটির দিকে যাঁরা লক্ষ্য স্থির রাখবেন—থিয়েটার করতে এসে তাঁরা কখনো ঠকবেন না একথা নিশ্চয়। যেটুকু করণীয় সেইটুকু কর, তার বেশীও নয়, কমও নয়।

নটসূর্যের সঙ্গে নির্মলেন্দু লাহিড়ীর এবিষয়ে অনেক পার্থক্য ছিল। থিয়েটারের গাড়িতে আসবার সময় নির্মলেন্দু ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন:

—কি হে, তোমার মুখখানা যেন শুকনো দেখাচ্ছে! কি হয়েছে?

ড্রাইভার জবাব দিল:

—আজ্ঞে স্যার, তিন মাসের মাইনে বাকী পড়েছে। কবে যে পাব, কে জানে!

গাড়ি থেকে নেমেই নির্মলেন্দু সাজবার ঘরে যাবার আগে থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে দেখা করলেন। মালিককে বললেন:

—সামনে অতগুলো শাদা আলো জ্বলছে কেন? ওগুলো পাল্‌টে ফেলে কতগুলি লাল রঙের 'ভাল্‌ভ' লাগিয়ে দিন না?

মালিক কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন:

—কেন বলুন তো?

—বুঝলেন না! যে থিয়েটারে গরীব ড্রাইভারের তিন মাসের মাইনে বাকী পড়ে—সে থিয়েটারকে একদিন লাল বাতি তো জ্বালতেই হবে! তাই আগেই জ্বালিয়ে রাখতে বলছি।

মালিকের মুখ লাল হয়ে উঠল। ড্রাইভারের মাইনে চুকিয়ে দিলেন আর সেই সঙ্গে মনে মনে স্থির করে রাখলেন—এই অপ্রিয় সত্যভাষী লোকটিকে সুযোগ পেলেই থিয়েটার থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

মিনার্ভা থিয়েটারে আমার লেখা 'দেবীদুর্গা' নাটক অভিনীত হবে। প্রাচীরপত্র ছাপা হয়ে এসেছে। আমি আর নির্মলেন্দু এক গাড়িতে বাড়ি ফিরতুম! আমি গাড়িতে উঠেছি, নির্মলেন্দু গাড়ির পাদানীতে পা দিয়েছেন—ঠিক এই সময় পেছন থেকে ডাক এল ঃ

—নির্মলবাবু, দাঁড়ান মশাই, একটু দাঁড়ান। রওনা হবার সময় পেছু ডাক শুনে নির্মলেন্দু অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। মুখ ফিরিয়ে দেখলেন মিনার্ভার অন্যতন মালিক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি প্রাচীর পত্র হাতে নিয়ে ছুটে আসছেন।

—দেখুন তো, কেমন পোস্টার হয়েছে? পোস্টারখানি নির্মলেন্দুর চোখের সামনে তুলে ধরে চণ্ডীচরণবাবু পোস্টারের লেখা নিজেই পড়ে শোনালেন ঃ

—'এবার মহাপূজার সময় মিনার্ভায় দেবীদুর্গা দর্শন করিবেন।'···কেমন, খুব চমৎকার হয়নি?

—তা হয়েছে! তবে, ওর নিচে আর একটি লাইন জুড়ে দেবেন।

চণ্ডীচরণ পরম আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—কি জুড়ে দেব বলুন তো?

—দেবীদুর্গা দর্শন করিবেন, এরপর জুড়ে দেবেন—'এবং চণ্ডীচরণ চণ্ডীপাঠ করিবেন।'

গম্ভীর ভাবে কথাটি শেষ করেই নির্মলেন্দু গাড়িতে উঠে পড়লেন।

হতবাক চণ্ডীচরণের চোখের সামনে দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে গেল তীব্র বিদ্রূপের মত একটুখানি ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে।

নটসূর্যের পরিমিতি-জ্ঞান তাঁকে দিয়েছে অপরিমিত সৌভাগ্য, আর নির্মলেন্দুর স্পষ্টবাদীতা ও অপ্রিয় সত্যভাষণ তাঁর সৌভাগ্যের পথকে করেছিল অস্পষ্ট ও বন্ধুর দুর্গম।

॥ তের ॥

সেদিন জন্মাষ্টমী। সারারাত্রি অভিনয়। অনেক দিন বাদে শর্মিষ্ঠা এসেছে অভিনয় দেখতে। অবিশ্যি টেলিফোনে মাঝে মাঝে খবর পাই। দাম্পত্য কলহ চলছিল নাকি কিছুদিন ধরে। ওর স্বামী বদলী হয়েছেন নাগপুরে। শর্মিষ্ঠাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বেঁকে বসেছে শর্মিষ্ঠা; ও এখন কিছুতেই কলকাতা ছেড়ে যাবে না! নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে গোল পার্কে; এত করে নিজের হাতে সাজানো গোছান বাড়ি ফেলে সেই ভিন্ মুলুকে গিয়ে পড়ে থাকতে পারবে না। অলক চৌধুরী তো মাঝে মাঝে অফিসের কাজে কলকাতায় আসবে! নাগপুরে এয়ার সার্ভিস রয়েছে যখন, চাই কি ইচ্ছে করলে ফি সপ্তাহে একবার আসতে পারে! শর্মিষ্ঠার নাগপুরে যাওয়া অসম্ভব!

আমি সবে মেক্ আপ্ করতে বসেছি। একগাল হাসি হেসে ঘরে ঢুকল শর্মিষ্ঠা। আমার সামনের বড় আয়নাটায় ওর ছায়া পড়ল। সেই দিক পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম:

—কী খবর? জিদের মামলায় কোন্ তরফের জয় হ'ল, শুনি?

—অনাদি কাল থেকে বরাবর যে তরফের হয়ে থাকে। এত নাটক লেখেন, এই সহজ কথাটা বোঝা উচিত ছিল কিন্তু।

স্বীকার করলুম আমার ত্রুটি। শর্মিষ্ঠা একখানি চেয়ার টেনে আমার পেছন দিকে বসল। আয়নায় মুখের পানে তাকিয়ে কথাও বলা চলবে, আর সেই সঙ্গে মেক্ আপ করতেও পারব।

—আর দুদিন বাদেই চলে যাচ্ছে। যাবার আগে আজ আমায় সারারাত থিয়েটার দেখাতে নিয়ে এসেছে। কিছুতেই স্টারে আসতে চায় না। কি বলে জানেন? সামনে আয়নার দিকে তাকিয়ে আঙ্গুলের ডগায় ম্যাক্স-ফ্যাক্টর টিউবে ছাব্বিশ নম্বর একটু একটু মাখিয়ে, তার ওপর জল স্প্রে করে জিজ্ঞাসা করলুম ঃ

—কি বলেন তিনি?

—বলে, অন্য থিয়েটারে চল। স্টারের বই ভাল না।

শর্মিষ্ঠার কথার আমি জবাব দিলুম না। একটুখানি হাসলুম শুধু।

—আপনি হাসছেন? জানেন কত তর্ক করেছি আপনাকে নিয়ে! আমি বলেছি, আপনার প্রত্যেকটি নাটক অদ্ভুত। ও কিছুতেই তা মানে না।

—না মানলে ওঁকে দোষ দেওয়া যায় কি?

—তার মানে?—আপনি কি বলতে চান আপনার নাটকগুলো ভাল নয়?

—নিজের লেখাকে কেউ কি কখনো খারাপ বলে?

—না, না, ওভাবে জবাব দেবেন না। সত্যি করে বলুন?

—সত্যি কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহলে বলতে হয়—আমার লেখা ত্রিশ, পঁয়ত্রিশখানা নাটকের মধ্যে হয়তো ভালও আছে, মন্দও আছে অনেক। ভাল মন্দ লাগাটা অবিশ্যি দর্শক এবং পাঠকের রুচির ওপর নির্ভর করে। তবে আমার ব্যক্তিগত মত জানতে চাওতো বলব—এতগুলি বই-এর মধ্যে যদি দু'খানা বা তিনখানা বই কালের কষ্টিপাথরে দাগ কেটে উৎরে যায়—তাহলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।

বিস্মিত হ'ল শর্মিষ্ঠা। খানিকটা আশাহত হ'ল যেন। জিজ্ঞাসা করল ঃ

—তার মানে, আপনি বলতে চান্ আপনার অনেকগুলি লেখাই বাঁচবে না!

—হুঁ, তাই।

—তবে সে সব লিখেছেন কেন ?

—আমি তো শুধু লেখক নই। বলতে লজ্জা নেই, সাহিত্য সেবাটা এখন গৌণ। থিয়েটারের ব্যবসা যাতে ভাল ভাবে চলে, অনেক দর্শককে খুশি করে যাতে থিয়েটারে পয়সার আমদানী হয়, থিয়েটারের লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়—সেই দিকটাতেই আমার প্রধান লক্ষ্য।

কথাটা শর্মিষ্ঠার মনঃপূত হ'ল না। খানিকটা বিরূপ কণ্ঠেই বলল ঃ

—থিয়েটারের দর্শক বুঝি ভালো সাহিত্যের অভিনয় দেখতে পয়সা দেয় না ?

—নিশ্চয়ই দেন। তবে থিয়েটারে পর্যায়ক্রমে যে ধারা চলে আসছে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। এই থিয়েটারে আগে অভিনীত হ'ত অপেরা শ্রেণীর নাটক। নাচ, গান, কিছু স্থূল হাস্য কৌতুক, কিছুটা দৃশ্যের জাঁকজমক। সেই ধারা রাতারাতি পাল্টে ফেললে এখানকার পুরানো দর্শক শ্রেণীও সঙ্গে সঙ্গে এ থিয়েটারকে ত্যাগ করবেন। তাই পরিবর্তন আনতে হচ্ছে আমাকে অত্যন্ত ধীরে ধীরে। যাতে পুরোনো দর্শকরাও তৃপ্ত হন, আবার কিছু কিছু নতুন দর্শকও এখানে আকৃষ্ট হয়ে আসেন।

আয়নায় মুখ বাড়িয়ে দেখলুম টিউবের রঙ মুখে বেশ মিলিয়ে গেছে। এইবার পাউডার লাগাতে হবে। পাউডার পাফ আস্তে আস্তে মুখে বুলিয়ে নিলুম। শর্মিষ্ঠা চুপ করে বসে রইল। হাতের কাজ শেষ করে বললুম ঃ

—এই জন্যই বেশির ভাগ ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে মাঝে মাঝে এক আধখানা সামাজিক নাটক অভিনয় শুরু করেছি।

—ও বলে, স্টারের ঐতিহাসিক নাটকই ভাল, সামাজিক বই তেমন ভালো নয়।

—উনি দেখেছেন এখানকার কোনো সামাজিক বই ?

—দেখলে আর দুঃখ ছিল নাকি ? এতদিন তো থিয়েটার দেখত না। লোকের মুখে ঝাল খেতে ওস্তাদ। আমি বলি, সামাজিক বইগুলোও চমৎকার। মোটেই বিশ্বাস করে না, কী করে ওকে বোঝাই বলুন তো ?

রুজ ধরিয়েছি মুখে। রুজ-এর তুলিটা আমি সারা মুখেই বুলিয়ে নিই, তার ওপর পড়ে খুব হাল্কা পাউডারের আর একটা প্রলেপ। রঙের উগ্রতা কমে যায়, রক্ত চলাচলের সজীব আভাস ফুটে ওঠে সারা মুখে। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে শর্মিষ্ঠা আবার বলল ঃ

—বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা কেউ কি এখানে অভিনয় দেখতে আসেন না ? সামাজিক বই দেখে কেমন লাগল তাঁরা কেউ কি আপনাকে জানান নি কখনো ?

এবার পেন্‌সিল্ ধরেছিলুম, চোখ আঁকতে। পেন্‌সিল্ রেখে উঠে দাঁড়ালুম, আলমারি থেকে একটি চিঠির ফাইল শর্মিষ্ঠার সামনে খুলে দিয়ে বললুম ঃ

—এই চিঠিগুলি পড়। তোমার প্রশ্নের জবাব পাবে। অসম্পূর্ণ মেক্ আপ্ শেষ করতে আবার বসলুম মেক্ আপ্ টেবিলে। শর্মিষ্ঠা পড়তে লাগল আমার পরিচালনায় অভিনীত বিভিন্ন সামাজিক নাটক সম্বন্ধে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের অভিমত।

প্রথমেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক মনীষী ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'কালিন্দীর' সমালোচনা।

"নিপুণ মণিকার যেমন খনির মণিকে পরিষ্কৃত করে তার উজ্জ্বলতাকে পরিস্ফুট করেন ও এ থেকে নূতন রকমের অলঙ্কার গড়ে তোলেন, লেখকও অনুরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে উপন্যাসকে সুষ্ঠুভাবে নাটকে রূপান্তরিত করেছেন।

উপন্যাসের ঘটনাবলীর মন্থর পাদচারণা ও বিসর্পিত অগ্রগতি নাটকে দ্রুততর ও প্রাণবেগ চঞ্চল হয়ে উঠেছে—অবাস্তরের বর্জনে ও স্থির লক্ষ্যের আকর্ষণে নাটক গতিবেগ ও কেন্দ্রমুখীনতা আহরণ করেছে।···

বাংলা সাহিত্যের একখানি সুপরিচিত উপন্যাসকে এমন অনবদ্য নাট্যরূপ দেওয়ার জন্য নাট্যকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি কেবল ঔপন্যাসিকের হস্তলিপিতে দাগা বুলান নাই, গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত উপন্যাসের মর্মগত নাটকীয় সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করেছেন ও প্রশংসনীয় সাহসিকতার সঙ্গে সমস্ত ঘটনা পরম্পরাকে নূতন ভাবে সাজিয়ে এই সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলেছেন।"

কালিন্দীর সমালোচনার পর ঐ ফাইলে ছিল 'সমুদ্র গুপ্ত', 'রাজসিংহ' প্রভৃতি অন্যান্য নাটকের বহু সমালোচনা। তার কতকগুলি প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচকদের অভিমত, কতকগুলি আমার অনুরাগী দর্শকদের অভিমত। চিঠিগুলির উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে শর্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করল:—নৌকাডুবির কোনো সমালোচনা নেই ?

—আছে। তবে ও ফাইলে নয়।

আর একখানি ফাইল খুলে শর্মিষ্ঠার সামনে ধরলুম। প্রথমেই তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি।

"বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চে নাট্য আন্দোলনের প্রবাহ বর্তমানে স্তিমিত শক্তি হয়ে এসেছে। কল্পনা ও সাহসের অভাবে নতুন উদ্যম কোথাও যখন দেখা যাচ্ছে না—তখন বর্তমান স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ তাঁদের বহু সমালোচিত ইতিহাসের ধারার পরিবর্তন করে—নূতন বিস্ময়কর উদ্যমের পরিচয় দিয়ে নাট্যামোদীদের আশান্বিত করেছেন। ইতিপূর্বেই তাঁরা নাট্যকার এবং পরিচালক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্তের সুযোগ্য এবং সুচিন্তিত পরিচালনায় পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকের বর্ণাঢ্য স্বপ্নলোকে যবনিকা ফেলে সামাজিক নাটকের প্রবর্তন করেছেন—কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবির মত একখানি বৃহৎ উপন্যাসকে রঙ্গমঞ্চে রূপ দেওয়ার প্রয়াস বিস্ময়কর এবং অভিনন্দনযোগ্য প্রয়াস। এ প্রয়াসকে সার্থক করে তুলতে পরিচালক এবং নাট্যরূপদাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু অপূর্ব নিষ্ঠা এবং সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বৃহৎ উপন্যাসখানিকে একমুখী গতিতে পরিচালিত করে—স্বল্প পরিসরের মধ্যে পরিণতিতে উপনীত হয়েছেন—কোথাও উপন্যাসের ঘটনা বৈচিত্র্য ক্ষুন্ন হয় নাই—নাটকীয় গতিও কোথাও ব্যাহত হয় নাই। চরিত্রগুলি কবির কল্পনার বৈশিষ্ট্য নিয়েই ফুটে উঠেছে।"

প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক প্রবোধ সান্যাল মশাই-এর লেখার চিহ্নিত অংশ দেখিয়ে দিলুম। শর্মিষ্ঠা পড়তে লাগল:

"সম্প্রতি 'নৌকাডুবি' উপন্যাসখানি নাটকে পরিণত করা হয়েছে এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত—যিনি এর নাট্যরূপ দান করেছেন,—তাঁর নাট্যবোধ এবং তার চেয়েও বেশী, তাঁর মাত্রাবোধ দেখে আমি খুশী হয়েছি। অনাবশ্যক বাক্ সন্ধান উপন্যাসে অনেক সময়ে রসসৃষ্টির জন্যই জায়গা পায়। কিন্তু নাটকে তার সুযোগ কম। নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্য প্রায় সকল সময়েই গণিতাঙ্কের নির্ভুল হিসাব রেখে চলে, অনেক ব্যর্থ নাট্যকার একথা ভুলে যান। সেই কারণে আমোদ বিতরণের লোভে তাঁরা অহেতুক বাক্য সম্ভার চাপিয়ে প্রকৃত নাট্যের নৌকা ডুবিয়ে দেন। মহেন্দ্র গুপ্ত এ ভুল করেন নি। তাঁর নাট্যবোধ ও মাত্রাবোধ একত্র মিলেছে 'নৌকাডুবি' নাটকে। মঞ্চের উপরে যেটি অভিনীত হচ্ছে সেটি উপন্যাস নয়,—নাটক, এই চেতনা প্রায় সর্বক্ষণই সজাগ থাকে এবং সেই সজাগ মনের বিহ্বলতা ও আত্মবিস্মৃতি ঘটে এমন কয়েকটি দৃশ্যের সুদক্ষ সংযোজনা করেছেন নাট্যকার। উপন্যাসে যে আড়ম্বর অনেক স্থলে স্থাণু হয়ে থেকেছে, নাটকে তাদের লঘুচালের গতি দেখে আনন্দ পেয়েছি,—এ কৃতিত্ব অসামান্য।"

শৈলজানন্দ আমায় ব্যক্তিগত ভাবে পত্রে লিখেছেন:

"সেদিন আপনার নিমন্ত্রণ পেয়ে রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' দেখে এসেছি। কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি, বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাসকে নাট্য রূপান্তরিত করে স্টার রঙ্গমঞ্চে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে আপনি মঞ্চস্থ করেছেন। ··আজকাল বাংলা রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকালেই দেখতে পাই সব অন্ধকার। জীবনের কোনও স্পন্দন নেই, অগ্রগতির কোনও লক্ষণ নেই। শুধু পিছু হটবার চেষ্টা, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি! একমাত্র আপনাকেই দেখছি প্রাণপণ চেষ্টায় একটি রঙ্গমঞ্চকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—আপনাব এই ঐকান্তিক সাধনা যেন সিদ্ধি লাভ করে!"

শর্মিষ্ঠা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওয়ার্ণিং বেল বেজে উঠতে আমি বললুম:—আর নয়। জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব দুখানি নাটকের অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। এইবার আরম্ভ হবে 'নরনারায়ণ'। আমাকে এবার যেতে হবে। সংকেত ধ্বনি আমায় ইসারা কচ্ছে নিচে নামতে।

শর্মিষ্ঠা অপ্রতিভ হয়ে উঠে দাঁড়াল। ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার সময় কৌতুক করে বললুম ঃ

—ছাখো, যদি এ কাহিনী কোনদিন লিখি, লোকে হয়ত বিশ্বাস করবে না।

শর্মিষ্ঠা ফিরে দাঁড়াল। ওর চাউনি দেখে মনে হল, আমার কথার মানে ও বুঝতে পারেনি।

—আমি বলছিলুম, এইভাবে সাক্ষাতের কথা। স্বামী দেবতাটি সঙ্গে এসেছেন। তাঁকে নিচে অডিটরিয়ামে বসিয়ে রেখে; দোতালায় মেয়েদের সীটে-এ বসবার অছিলায় গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করা —এ নিয়ে উপন্যাস লিখলেও লোকে বলবে—ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

শর্মিষ্ঠার চোখ দুটি সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক ঝলক হাসি খেলে গেল চোখের ওপর দিয়ে। আমার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল। দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি!

ঠোঁট দুটি প্রায় আমার কানের কাছে এগিয়ে নিয়ে খুব চাপা গলায় বলল ঃ

—যার যা খুশী বলুক গে। উপন্যাসে অস্বাভাবিক মনে হয়— তাতে আমাদের কী! ট্রুথ ইজ স্ট্রেন্‌জার ছান ফিক্‌শন্! তাই না?

মাথা নেড়ে জানালুম—সত্যিই, তাই। ও চলে গেল। ড্রেসার ওস্কার মিশ্র এসেছেন আমায় পোষাক পরাবার জন্যে। সাজছি আর থেকে থেকে কানে বাজছে শর্মিষ্ঠার ওই কথাটি ঃ ট্রুথ ইজ স্ট্রেন্‌জার ছান ফিক্‌শন্!

সারারাত্রিব্যাপী অভিনয়। নরনারায়ণ বই-এর পর দেবলাদেবী। দেবলাদেবীর পর নৃত্যনাট্য উর্বশী। ওতে আমার কোনো ভূমিকা নেই। দেবলাদেবীতে খিজির খাঁ সেজে রাত তিনটে নাগাত আমার অভিনয় শেষ। নরনারায়ণ শেষ হবার পর প্রায় এক ঘণ্টা বিরতি। ওই সময়টাতে দর্শকেরা এবং শিল্পিরাও খাওয়া দাওয়া শেষ করে

নেন। তাই বিরতি একটু দীর্ঘ হয়। আমি দুটো কাট্‌লেট খেয়ে নৈশ ভোজ পর্ব শেষ করেছি। জল খেয়ে তোয়ালেতে সবে মুখ মুছেছি, ঠিক সেই সময় বাইরে ছাদে পায়ের আওয়াজ পেলুম ঃ

—কে ওখানে ?

—আমি !

—কী আশ্চর্য ! বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ? ভেতরে এসো।

পা টিপে ঘরে ঢুকল শর্মিষ্ঠা। টেবিলের ওপাশে আমার চেয়ারে আলগোছে বসে পড়ল।

—কেমন লাগল নরনারায়ণ ?

—ভাল করে দেখিনি।

—কেন ?

—সারাক্ষণ বড় অন্যমনস্ক ছিলুম। একটা কথা ভাবছিলুম। একটু থেমে বলল ঃ

—আচ্ছা, স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিলে কেমন হয় ?

এ কী অদ্ভুত প্রশ্ন ! অবাক হয়ে তাকালুম ওর মুখের পানে। খানিকটা চুপ করে থাকল হয়তো আমার জবাবের প্রতীক্ষায়। তারপর নিজেই বলতে সুরু করল ঃ

—এই প্রতিষ্ঠানের পেছনে এতটা না খেটে, নতুন একটা থিয়েটার খুলুন না, যেখানে ধীরে ধীরে সংস্কার করতে হবে না ! একেবারে নতুন ধরনের নাটক নিয়ে। নতুন যুগের নতুন দর্শকের রুচি অনুযায়ী নাট্য-রস পরিবেশন করতে পারবেন।

জবাব দিলুম না। সিগারেট ধরিয়ে নিঃশব্দে টান্‌তে লাগলুম। শর্মিষ্ঠা যেন খানিকটা অধৈর্য হয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল ঃ

—কী, আইডিয়াটা আপনার ভালো লাগল না ?

সোজা তাকালুম ওর চোখের পানে।

—ভাল না লাগবার কথা নয় ! আমি ভাবছি, অন্য আর একজনের কথা ! সেও ঠিক এই অনুরোধই করেছিল।

—কে ?

—নীরেন্দু দাশগুপ্ত! আমার পরমাত্মীয়! স্ত্রীর সহোদর!

—কী বলেছিলেন তিনি?

—যুদ্ধের বাজারে বহু টাকা রোজগার করেছিল! চীটাগাং থেকে সুরু করে আরাকান বর্ডার পর্যন্ত মিলিটারীর অর্ডার সাপ্লাই করত। রাতারাতি হয়ে উঠেছিল টাকার কুমীর। মোটা অঙ্কের চেক আমার এই টেবিলটার ওপর রেখে বলেছিল স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিন। কী হবে পরের চাকরী করে? এই টাকা নিয়ে নিজে একটা নতুন থিয়েটার খুলুন।

—তারপর? কী করলেন আপনি?

—চেক্ পকেটে পুরে সলিলবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁকে সব বললুম। সলিলবাবু জবাব দিলেনঃ 'নিজে যদি থিয়েটার খুলতে চান, অন্য জায়গায় যাবেন কেন? আমি স্টার থিয়েটার আপনার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। এই থিয়েটারের মালিক হয়ে আপনি এই থিয়েটার চালান।'···ওঁর কথা শুনে অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম,—আমায় এ থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে আপনি নিজে কি করবেন? প্রসন্ন হাস্যে জবাব দিলেন সলিলবাবু,—'এই ক'বছরে আমার ভবিষ্যতের ব্যবস্থা আমি করে নিয়েছি। যোগ্য লোকের হাতে থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছি —এই বিশ্বাস নিয়েই আমি বরং বিদায় নেব!'···কর্ম্মজীবনের দীর্ঘকালের সঙ্গীর মুখের পানে তাকিয়ে আমার চোখ দু'টো ছল্‌ছল্ করে এল। তীব্র প্রতিবাদ করে বললুমঃ—সে হয় না, হতে পারে না। আপনার স্বর্গত জ্যাঠামশাই মহেন্দ্র মিত্র, আপনার বাবা স্বর্গত উপেন্দ্র মিত্র, আপনার ছোট কাকা স্বর্গত জ্ঞান মিত্র—এঁরা প্রত্যেকে ছিলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক একজন দিক্‌পাল। রঙ্গালয়ের ইতিহাস লেখা হলে মিত্র বংশের নাম সে ইতিহাসের অনেকগুলি পাতা জুড়ে থাক্‌বে। আমি স্টার থিয়েটারের মালিক হলে রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের এই বংশগত ধারাটি লুপ্ত হয়ে যাবে! সে আমি কিছুতেই পারব না। আমার কথা শুনে সলিলবাবু হাসলেন। বললেন,—তা যদি না পারেন, তবে আমাকে ছেড়ে আপনি অন্য কোথাও যেতে

পারবেন না। এই স্টার থিয়েটারেই আমার পাশে থাকতে হবে আপনাকে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে নীরেন্দুকে তার চেক্ ফিরিয়ে দিলুম।

শর্মিষ্ঠা যেন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিল আমার কথা। আমি থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল ঃ

—নীরেন্দুবাবু চেক্ ফেরত নিলেন ? আর আপনাকে কোনদিন বলেন নি থিয়েটার খুলতে ?

—এত বেশী জিদ্ চেপে গেল তার যে অস্বস্তি বোধ করলুম। শেষে বাড়িতে এসে আমার স্ত্রীকে বললুম,—তোমার ভাইএর বিশ্বাস যে স্টার থিয়েটার আমার নিজের থিয়েটার নয়। তাকে দোষ দিই না, কারণ পনের ষোল বছর রাতদিন পরিশ্রম করে সে কখনো হাতে করে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেনি এবং সলিলবাবুর মত বন্ধুভাগ্যও তার কখনো হয়নি। সে যাই হোক, তাকে শুধু এই কথাটি বলে দিও, আমার স্টার থিয়েটার ছেড়ে দেওয়া উচিত এই সদুপদেশ দেবার জন্যে আমার কাছে সে না এলেই আমি খুশী হব।

চমকে উঠল শর্মিষ্ঠা! খানিকটা ভয় পেয়ে গেল আমার কথা শুনে। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে কণ্ঠস্বরে তরল কৌতুক হাস্য মিশিয়ে বলল ঃ

—তবে তো আমিও এ প্রসঙ্গ তুলে ভীষণ অন্যায় করে ফেলেছি! আমাকেও এবার বলবেন নাকি, খবরদার আর কখনো এসো না আমার কাছে!

আমায় নিঃশব্দে হাসতে দেখে ও মাথা নাড়তে লাগল ঃ

—উঁহু, ও হাসিতো ভালো নয়! এমন ভয় লাগছে, মনে হচ্ছে, এই রাতই যেন আমাদের শেষ রাত!

কথাটা নিছক পরিহাস করে বলেছিল শর্মিষ্ঠা। কিন্তু সে পরিহাস যে আমার জীবনের কত বড় নিষ্ঠুর সত্য হয়ে উঠবে—তখন কল্পনাও করতে পারিনি। শুধু আমি কেন ? শর্মিষ্ঠাই কি এতটুকু আভাসে

বুঝতে পেরেছিল যে হাল্কা ভাবে ভেসে আসা ঐটুকু কথার বাষ্প প্রলয়ঙ্কর মেঘের মত দিক দিগন্ত ছেয়ে ফেলবে? জীবনের সোনালী স্বপ্ন একটুকরো ছেঁড়া পাতার মত নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে যাবে সেই ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে?...

কৃষ্ণাষ্টমীর রাত। জীবনে আরও কতবার এল, নিরন্ধ্র অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল। খুঁজি একটুখানি আলোর রেখা! ঝিক্‌মিক করে, হাত বাড়িয়ে মুঠোয় ধরতে যাই—সরে যায় আলেয়ার মত। স্বপ্ন ভাঙ্গে—টুকরো টুকরো হয়ে যায়।...

...অভিনয় শেষ করে ওপরের ঘরে এসেছি।

শেষরাত্রে অত জোর আলো ভাল লাগে না। চোখ জ্বালা করে। আলো নিভিয়ে সুইচ টিপে জ্বেলেছি মৃদু নীল আলো। নরম পাতলা নীল, নিশুতি রাতে জানালা দিয়ে লুটিয়ে পড়া একঝলক জ্যোৎস্নার মত ঠাণ্ডা নীল আলো। বাগানের দিক থেকে হাওয়া আসছে, চাঁপা আর বেলফুলের গন্ধ মেশানো হাওয়া। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে। সারারাত পরিশ্রমের পর এবার ক্লান্তি নেমেছে সারা দেহে। টেবিলের ওপর মাথা রেখে চোখ বুজি। হাত এলিয়ে দিই সামনের দিকে। মুঠো ভরতি ফুল, না—একখানি নরম হাত! ফুলের চেয়ে নরম! কখন নিঃশব্দে এসেছে টেরও পাইনি। বাগানের ফুলের গন্ধ মনে করেছিলুম, সে ওরই আঁচলের গন্ধ—ঘাড়ের কাছে শিথিল হয়ে লুটিয়ে পড়া খোঁপার গন্ধ! নীল আলোয় এমন বিচিত্র লাগছে ওকে, যেন বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না—সত্যিই ও এসেছে বলে। মুঠোর মধ্যে ওর হাতখানি ভাল করে টেনে নিই, আপত্তি করেনা। একটুখানি আকর্ষণ করি আমার কাছে!...একবার থর্‌থর্ করে কেঁপে ওঠে হাতখানি। সন্তর্পণে আমার হাতের মুঠো থেকে সরিয়ে নেয় হাত। কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকি। কী হ'ল ওর? রাগ করে চলে গেল কি? বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকাই। ওইতো ছাদের কোণে পাঁচিলের ওপর মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে

যাই। একটা আঙুল দিয়ে কাঁধটা ছুঁই। বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়ায় শর্মিষ্ঠা, চোখে তার বিদ্যুৎ আর অশ্রান্ত জলধারা। জল ঝরে পড়ছে বড় বড় ফোঁটায় দু'গাল বেয়ে বুকের ওপর।
[illegible]—এভাবে চাইনি কোনোদিন, এভাবে চাইনি আপনাকে। ভুল বুঝেছেন আপনি। ভীষণ ভুল বুঝেছেন আমাকে। জবাব দিতে পারলুম না। জবাবের অপেক্ষাও সে করল না। আঁচলে মুখ ঢেকে ছুটে বেরিয়ে গেল আমার সামন থেকে।

তারপর আজ পর্যন্ত আর সে আসেনি, আর তাকে দেখিনি। কোন খোঁজও পাইনি। শুধু একখানি চিঠি পেয়েছিলুম তিন চার দিন বাদে। শর্মিষ্ঠার নয়, মনীষা রায়ের চিঠি। শর্মিষ্ঠা তার স্বামীর সঙ্গে নাগপুরে চলে গেছে। প্রথমে যেতে চায়নি। ও যাবে না ঠিক হয়েছিল। কিন্তু যাবার দিন হঠাৎ জিদ ধরল অলক চৌধুরীর সঙ্গে ও যাবে বলে। এমন কি কলকাতায় গোলপার্কের নতুন বাড়ীটাও নাকি রাখবার দরকার নেই। ওটা বিক্রী করে দিয়ে নাগপুরে বা ঐ অঞ্চলে আর কোথাও আস্তানা গড়ে তোলবার বায়না ধরেছে। চিঠির শেষ দিকে শর্মিষ্ঠার এই আকস্মিক চলে যাওয়া সম্বন্ধে মনীষা রায় তাঁর নিজস্ব অভিমত জানিয়ে লিখেছেন ঃ 'সেদিন আপনাকে বলেছিলুম ওর মনের দুর্বলতার কথা। সে দুর্বলতা যে এত সহজে কাটিয়ে উঠতে পারবে, ভাবিনি। ও ভুল করেছিল; এত শিগগির সেটা বুঝতে পেরেছে, এটাই আনন্দের কথা। যারা ওর শুভার্থী—তারা প্রত্যেকেই এতে খুশী হবে। আমি, অলক এবং আপনিও—তাই নয় কি?'...চিঠিখানি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। মনীষা রায়ের ধারণা—শর্মিষ্ঠা ভুল করেছিল, সেই ভুল এতদিনে সে শুধরে নিয়েছে। হ্যাঁ, আনন্দের কথা বই কি? অলক চৌধুরী ও শর্মিষ্ঠা চৌধুরীর নতুন জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক্—। শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখলুম মনীষা রায়কে। তাড়াতাড়ি চিঠির প্যাড টেনে বেশ মুনশীয়ানা করে মনীষা রায়ের

চিঠির জবাব লিখে ফেললুম। কিন্তু নিজের মনকে কী জবাব দেব? কত মাস, বর্ষ গেল। ঋতু চক্র বারবার আবর্তিত হয়ে গেল। পথ পরিক্রমায় অনেক কিছু কুড়িয়েছি, অনেক হারিয়েছি—অনেক হারানো বস্তু ভুলেও গেছি। শুধু না পারলুম নিজের মনকে কোনো জবাবদিহি করতে।

॥ চৌদ্দ ॥

শর্মিষ্ঠার সঙ্গে শেষ দেখা হবার রাত্রে সে বলেছিল—স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিতে। স্টার থিয়েটার আমি ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু সে শর্মিষ্ঠার ইচ্ছায় নয়, নিজের ইচ্ছাতে নয়, এমন কি হয়তো স্টারের মঞ্চ-মালিক সলিলবাবুর ইচ্ছাতেও নয়। স্টার থিয়েটার ছেড়ে যে রাত্রে বাইরে এসে দাঁড়ালুম সেদিন বিকেলবেলা থিয়েটারে ঢোকবার সময় কল্পনাও করিনি যে, এই আসা এখানে আমার শেষ আসা। বেরিয়ে আসবার পূর্বমুহূর্তেও সলিলবাবু একটিবার মুখ ফুটে বলেননি —আপনাকে দিয়ে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে! তবে? কেন চলে এসেছি?

স্টার থিয়েটারের ডানদিকের ফটকের সামনে যে গ্যাসপোস্টটা আছে —ওর নিচে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একটি ছেলে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। দারুণ গ্রীষ্মে গলদ ঘর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে—অপেক্ষা করেছে দুরন্ত শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে। দোতলায় আমার বসবার ঘরে পায়চারি করতে করতে অনেক সময় তাকে লক্ষ্য করেছি। কে ছেলেটি? কার জন্যে অপেক্ষা করে? কী চায় ও? ডেকে কিছু জিজ্ঞাসা করব ভাবছি; ইতিমধ্যে কালিপদ চক্রবর্তী নামে আমার পূর্ব পরিচিত একটি ছেলে ওকে সঙ্গে করে হাজির হ'ল আমার ঘরে। শ্যামবর্ণ চেহারা, অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির—নাম শ্যামসুন্দর সাহা।

কালিপদ পরিচয় করিয়ে দিল, ওর দেশ ফরিদপুরে, পাটের ব্যবসা করে—ওদের বেশ স্বচ্ছল অবস্থা। ছেলেটি খুব অমায়িক। একান্ত ইচ্ছা ওর থিয়েটারে অভিনয় করবে। আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল:

—বহুদিন আপনার শরণ নেব ভাবছি! বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু কাছে আসতে সাহস হয়নি। এবার যখন এসে পড়েছি, আপনি তাড়িয়ে দিলেও, আমি আপনাকে ছাড়ব না।

অনেক বোঝালুম তাকে। এই অল্প বয়সে পারিবারিক ব্যবসা ফেলে, থিয়েটারের সংস্পর্শে আসা আদৌ সমীচীন নয়। বেশী পয়সা আছে বলেই ভয় আরও বেশী। জোয়ারের জলে কুটোর মত কোথায় যে ভেসে চলে যাবে, কেউ খুঁজেও পাবে না। অনেক দেখেছি, অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে, অনেক জীবন নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতি দেখেছি বলেই শ্যামসুন্দরকে ফিরতে বললাম। সে কথা বলে না, ছলছল চোখে চুপ করে বসে থাকে। অগত্যা বলতে হ'ল:

—আচ্ছা, আজ এসো। আমি একটু ভেবে দেখি। পাঁচসাত দিন পরে দেখা কোরো।

পায়ের ধুলো নিয়ে শ্যামসুন্দর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। পাঁচ-সাত দিন পরে আবার এল, অনেক যুক্তি তর্ক দিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম—ফিরিয়ে দিলুম! কিন্তু কিছুদিন পরে আবার এসে হাজির হ'ল। তিন চার মাস যাতায়াত করে যখন সে বুঝতে পারল আমার দ্বারা তার থিয়েটারে ঢোকবার ইচ্ছা পূর্ণ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন সে অন্য পথ ধরল। কালিপদ চক্রবর্তীকে দিয়ে জানাল সিনেমার বই তুলতে সে টাকা দিতে চায়। কিন্তু সেজন্যে আমার কাছে কেন? আমি কখনো কোনো ছবিও তুলিনি, এক স্টার থিয়েটারের গুরুদায়িত্ব বহন করে আমার এমন প্রচুর সময়ও নেই যে সিনেমার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করি। আমি শ্যাম-সুন্দরকে কোনো যোগ্য চিত্র-পরিচালকের সাহায্য নিতে বললুম। জবাব দিল, ওর জানা কোনো পরিচালক নেই। আমি নিজে যদি

একান্তই রাজি না হই, তবে পরিচালকও আমাকে ঠিক করে দিতে হবে। অগত্যা শ্যামসুন্দরকে নিয়ে গেলুম, একজন স্বনামধন্য প্রবীণ চিত্র-পরিচালকের কাছে। তিনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু। শ্যাম-সুন্দরের সমস্ত কথা তাঁকে জানিয়ে, তাঁর হাতেই ওকে তুলে দিয়ে ভাবলুম, এবার আমার অব্যাহতি। কিন্তু দৈবের বিধান! অব্যাহতি পেলুম না। শ্যামসুন্দর তাঁকে ছবির স্যুটিং আরম্ভ করতে যে প্রাথমিক টাকা দিয়েছিল, তা খরচ হয়ে গেল, তবু একটি দিনও স্যুটিং হ'ল না। শ্যামসুন্দর অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলুম আমি নিজে। কারণ আমিই শ্যামসুন্দরের এই টাকার জন্যে প্রকারান্তরে দায়ী। সে আমায় বললে ঃ

—যে টাকা গেছে যাক্। মনে করব ওটা আমি আপনাকে গুরুপ্রণামী দিয়েছি। এবার আপনাকেই আমার হয়ে ছবি করতে হবে।

এক্ষেত্রে শ্যামসুন্দরকে আর আপত্তি জানিয়ে ফেরাতে পারলুম না। আমার পরিচালনায় 'অমর প্রেম' ছবির স্যুটিং আরম্ভ হ'ল। নূতন জগৎ, নূতন মানুষ নিয়ে কারবার, অজস্র টাকার লেন-দেনের ব্যাপার অথচ পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। একেবারে হিম্‌সিম্ খেয়ে গেলুম। যে যেদিক থেকে সুবিধে পাচ্ছে, আমাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে টাকা পয়সা শোষণ করে নিচ্ছে। কে যে যোগ্য মূল্য নিচ্ছে, কে ঠকিয়ে যাচ্ছে—কিছুই ঠাহর করতে পাচ্ছি না। এই ভাবে দিন দশেক স্যুটিং হবার পর, একদিন শ্যামসুন্দর আমায় স্পষ্ট বলে দিল, সে আর টাকা দিতে পারবে না, কারণ তার বাড়ি থেকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে! সর্বনাশ! এখন উপায়? ছবির দশ আনা কাজই বাকী রয়েছে যে! অনেক টাকার দরকার এখনো! কী করি? নিজে টাকা ধার করতে ছুটলুম। ধার করে এনে একটু একটু করে স্যুটিং করি। আবার টাকার অভাবে দু'চার মাস স্যুটিং বন্ধ করে বসে থাকি। আমার শ্যালক নীরেন্দুর কথা মনে পড়ল। আজ যদি তার হাতে টাকা থাকত! যুদ্ধের বাজারে যে টাকা

জলের মত এসেছিল, জলের মতই সে টাকা বেরিয়ে গেছে রবার ফ্যাক্টরীতে, মফঃস্বলে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাইতে, শেয়ার মার্কেটে। তবু আমার অবস্থা দেখে নীরেন্দু এসে পাশে দাঁড়াল। তার শেষ সঞ্চয়, শেষ সম্বলটুকু নিঃশেষ করে দিল—অভিশপ্ত 'অমর প্রেম' ছবিতে।

হ্যাঁ, অভিশপ্ত 'অমর প্রেম'! ওই ছবির জন্যে নিজেকে রিক্ত করেছি, দুর্দিনে যার কাছে সাহায্য পেতুম সেই নীরেন্দুকেও নিঃস্ব করেছি। আর শ্যামসুন্দর? খবর পেয়েছি নিজের হাত-খরচের টাকা থেকে সে হাজার পনের টাকা জমিয়েছিল। বাড়ির সবাইকে লুকিয়ে ওই টাকাটাই সে ছবি করতে খরচ করে গেছে! পারিবারিক পাটের ব্যবসা থেকে একটি টাকাও যাতে নিতে না হয়—তাই সে ঠিক সময়ে হাতের মুঠো বন্ধ করে দিয়েছিল। সতর্ক ব্যবসায়ী কখনো বণিক-লক্ষ্মীর কৃপা লাভে বঞ্চিত হয় না। পাটের বাজারে পরিপূর্ণ সৌভাগ্য নিয়েই শ্যামসুন্দর এখনো বিরাজমান! এবং লক্ষ্মী-ছাড়ার দলে পড়েও তার লক্ষ্মীশ্রী যে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি, পরম দুর্দিনের মধ্যে এইটিই আমার পরম সান্ত্বনা।

শ্যামসুন্দর টাকা দেওয়া বন্ধ করলেও 'অমর প্রেম' বই-এর শেষ স্যুটিং-এর দিন পর্যন্ত নিজে উপস্থিত থেকে সমস্ত হিসেব পত্র রাখত। যেদিন স্যুটিং থাকত না, সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত থিয়েটারে আমার ঘরে এসে বসত। পাওনাদারদের সঙ্গে বিল নিয়ে তুমুল কলহ করত। মাঝে মাঝে এমন অবস্থার সৃষ্টি হ'ত যে, অত্যন্ত চটে গিয়ে বলতুম:—ষ্টুডিওতে অফিস ঘর রয়েছে। সেখানে গিয়ে তোমাদের কাজ করগে। থিয়েটারে এসে এ ঝামেলা আমি পছন্দ করি না।

শ্যামসুন্দর চুপ করত। আবার পরবর্তী দিন এসে ঠিক সেই উপদ্রব। অস্বস্তি বোধ করতুম। ভাবতুম, সলিলবাবুই বা কী ভাবছেন?...অবিশ্যি তিনি আমায় এ ব্যাপার নিয়ে কোনো দিন

ঘুণাক্ষরে কিছু বলেন নি। না বলুন তিনি, কিন্তু কতখানি যে কাজের ক্ষতি হচ্ছে আমি তো মর্মে মর্মে বুঝছি! তবু কী করব? এত বলি, তবু রেহাই পাই না।

এই এক বছর অমর প্রেমের স্যুটিং, অমর প্রেমের টাকার যোগাড় করা ইত্যাদি ব্যাপারে এমন ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছি যে, থিয়েটারের দিকে কোনো নজর দিতে পারিনি। এক-খানা নতুন নাটক লেখবারও অবসর পাইনি। সলিলবাবু একদিন ডেকে বললেন:

—থিয়েটারে ক'মাস ধরে লোকশান আরম্ভ হয়েছে যে?

লজ্জিত হয়ে বললুম:

—বুঝতে পাচ্ছি। কী করব? একটু দম ফেলতে পাচ্ছি না। এই ছবির কাজটা শেষ হয়ে যাক্। আপনার যত লোকশান হয়েছে এই ক'মাসে, একখানা নতুন নাটক লিখে আমি সব পুষিয়ে দেব।

—বেশ! যা ভাল বোঝেন, তাই করবেন।

চলে এলুম নিজের ঘরে। যত তাড়াতাড়ি হয় ছবিটা শেষ করতেই হবে। উঠে পড়ে লাগলুম ছবির পেছনে।

পরের মাসে থিয়েটারে আবার লোকশান! তার পরের মাসেও ঐ খবর!

—এদিককার ব্যবস্থা যা হয় একটা কিছু করুন? সলিলবাবু আমার পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। একটু ভেবে নিয়ে বললুম:

—এক কাজ করুন, থিয়েটার বরং কিছুদিন বন্ধ দিয়ে বাড়িটাকে ভালো করে সারিয়ে নিন। স্টাফকেও এক মাসের নোটীশ দিন। অমর প্রেমের স্যুটিং শীগগীরই শেষ হবে। আমিও নতুন বই লিখতে সুরু করে দেব। বাড়িও নতুন করে সারান হবে, নতুন বই লেখাও শেষ হবে। আর সেই সময় পুরোনোর ভেতর যাদের রাখা দরকার তাদের সঙ্গে কিছু নতুন শিল্পী নিয়ে—আবার নতুন ভাবে

কাজ আরম্ভ করা যাবে। দেখবেন, তা হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে।

সলিলবাবু আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে বললেন ঃ

—একথা আমিও অনেক সময় ভেবেছি। থিয়েটার কিছুদিন বন্ধ রেখে বাড়িটাকে সারান দরকার। স্টাফকে তাহলে এক মাসের নোটীশ দিয়ে দিই! কি বলেন ?

—হাঁ, তাই করুন।

যথাসময়ে নোটীশ দেওয়া হ'ল। সবাই জানল থিয়েটার কিছুদিন বন্ধ রেখে বাড়িটার সংস্কার করা হবে। তারপর নতুন নাটক নিয়ে আবার দ্বারোদ্ঘাটন করা হবে।

১৯৩৭-এর জুন মাসে সলিলবাবুর থিয়েটারের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ। আমার লেখা 'গয়াতীর্থ' বই-এর শুভ উদ্বোধন হয়েছিল ঐ বছর জুন মাসে। এটা ১৯৫২-র জুন মাস, বিন্দুমাত্র বুঝতে পারিনি, কখনো মনে এতটুকু সংশয় বা সন্দেহ জাগেনি যে জুনের শেষ তারিখটাই সলিলবাবুর থিয়েটারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক মিটিয়ে আসবার শেষ দিন বলে নির্ধারিত হয়েছে।

বিকেল বেলা থিয়েটারে যেতে সলিলবাবু ডেকে পাঠালেন। কি দরকার আছে নাকি! ওঁর ঘরে যেতে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলেন। সিগারেট ধরিয়ে খানিকটা আড্ডা দিয়ে উঠি উঠি কচ্ছি, এই সময় উনি টানা থেকে একখানা টাইপ করা দলিল বার করলেন। তিন চার পৃষ্ঠার দলিল। জিজ্ঞাসা করলুম ঃ

—কী ব্যাপার ? ওটা কী ?

—পড়েই দেখুন না।

—জানেন তো, দলিল দস্তাবেজ নিয়ে নাড়াচাড়া করা আমার ধৈর্যে কুলোয় না। জিনিসটা কী সংক্ষেপে বলুন।

—আপনার নাটকগুলির মঞ্চ-অভিনয় স্বত্ব।

কৌতূহল বোধ করলুম! আমার নাটকের মঞ্চ-অভিনয় স্বত্ব সম্বন্ধে আবার দলিল তৈরি হয়েছে কেন? এবার দলিলের পৃষ্ঠার ওপর চোখ বোলাতে লাগলুম! পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ওল্টাতে গিয়ে দেখি—টাইপ করা অক্ষরগুলি হঠাৎ যেন জীবন্ত পোকামাকড়ের মত কিল্‌বিল্‌ করে উঠেছে, কাগজের পৃষ্ঠায় এ ওর গায়ের ওপর ছিট্‌কে পড়েছে, সবগুলো মিলিয়ে বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে ঘুরতে একটি বিষাক্ত বৃশ্চিকাকার ধরেছে। হাতের আঙুলে কামড়ে দিল যেন। পা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত বিষ ছড়িয়ে পড়ল। এক মুহূর্তে সারা দেহ ঝিম্‌ ঝিম্‌ করতে লাগল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো! সামনের টেবিলটা আঁকড়ে ধরে একটু কাল চুপ করে বসে রইলুম। সলিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—কী হ'ল? কিছু বলবার আছে?

দলিলে সই করে দিয়ে বললুম ঃ

—নাঃ! শুধু একটি কথা ভাবছি!

—কী? বলুন!

—আপনার এই থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের, তারাশংকরের নাটক অভিনয় করেছি, অনেক নতুন নাট্যকারের নাটকও অভিনীত হয়েছে। আজ পর্যন্ত যত নাটক অভিনয় হয়েছে তার প্রত্যেকটিরই মঞ্চ-অভিনয় স্বত্ব প্রথম রাত্রি থেকে দু'বছর কি বড় জোর তিন বছর পর্যন্ত আপনার। ওই সময় পার হয়ে গেলে অভিনয় স্বত্ব নাট্যকারের। হাঁ ঐ সর্তেই আপনার সঙ্গে আমি সমস্ত লেখকের দলিল তৈরী করিয়ে দিয়েছি। পনের বছর আপনার সঙ্গে থাকবার পর শুধু আমার বেলাতেই হ'ল এই প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম। আমার নাটকগুলির মঞ্চ-অভিনয় স্বত্ব জীবিত কাল পর্যন্ত আপনার! এবং তারপর আপনারই বংশধরদের!

সলিলবাবুর মুখের পানে তাকালুম। মুখের সীগারেটটা উনি ঠোঁটের মধ্যে একটু জোর করে চেপে ধরলেন। চশমার আড়ালে দৃষ্টি যেন একটু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে মনে হ'ল। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—এতে আপত্তি আছে আপনার ?

হেসে ফেললুম। আপত্তি! দলিলটা ওঁর সামনে ঠেলে দিয়ে বললুম—আপত্তি থাকলে কেউ সই করে না। এই নিন্। সই করে দিয়েছি।

এবার আর একখানি রেভেনিউ স্ট্যাম্প আঁটা শাদা কাগজ দিলেন আমাকে।

—কী হবে এতে ?

—একখানি হ্যাণ্ডনোট !

—হ্যাণ্ডনোট !

—হাঁ, আপনি এতদিনে এই টাকা ওভারড্র করেছেন !

সলিলবাবু আমাকে টাকার অঙ্কটা বলে দিলেন। আর বললেন, উনি নিজে খাতাপত্র দেখেছেন, ইচ্ছে হলে টাকার অঙ্কটা ঠিক কিনা আমিও খাতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি। এবারও হাসি পেল। আজ কি ওঁর এই সন্দেহ হ'ল যে দীর্ঘ পনের বছর যে বিশ্বাসের ওপর আমরা দু'জন পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছিলুম আজ তার ভেতর হঠাৎ এমন চির খেয়ে গেছে যে—ওঁর নিজের চোখে দেখা হিসাবও আমার মনঃপূত হবে না ? পুরোনো সম্পর্কের কথা না হয় ছেড়ে দিলুম, সলিল মিত্র অসৎ এ দুর্নাম তাঁর পরম শত্রুতেও করতে পারবে না। তাই আমাকে হিসেব দেখতে বলায় হাসি পেয়ে গেল। বললুম ঃ

—হিসেব দেখতে হবে না। কি লিখব হ্যাণ্ডনোটে তাই বলুন !

সলিলবাবু বলে গেলেন। সেই অনুযায়ী হ্যাণ্ডনোট লিখে সই করে দিলুম। উনি এবার শ'পাঁচেক টাকা দিলেন আমায়। ওটা নাকি রয়ালটি বাবদ পাওনা ছিল আমার। টাকাটা নিতে একবার ইতঃস্তত করলুম। আমিও তো অনেক টাকার জন্য ঋণী ওঁর কাছে ! ও টাকাটা না হয় থাক্ ! কিন্তু না, কিছু বলতে পারলুম না। এখান থেকে বেরিয়ে যাবার আগে সীগারেটওয়ালার দেনা মেটাতে হবে, চাকর বাকরও কিছু পাবে বোধ হয়। আর তাছাড়া কাল সকালে

বাড়িতে হয়তো বাজার আটুকে যাবে। হাত পেতে নিলুম পাঁচশ টাকা! যাবার আগে একটি অনুরোধ জানালুম ওঁকে :

—আমি ঐতিহাসিক নাটকে যে সব পোষাক ব্যবহার করেছি, অনেক পরিশ্রম করে, অনেক বই ঘেঁটে তার ডিজাইন তৈরী করিয়েছি। তার অনেকগুলি জীর্ণ হয়ে গেলেও, আমার কাছে তার দাম অনেক! দু'চারটে নিয়ে যেতে পারি আমার সঙ্গে?…অবিশ্যি সেজন্যে আপনি যে টাকা চান?

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন সলিলবাবু :

—আপনার নিজের পোষাক, যেটা ইচ্ছে আপনি সঙ্গে নিয়ে যান্। আমায় কিছু দিতে হবে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম এবার। সলিলবাবুও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। একখানি হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে, আমার হাতের শেষ-স্পর্শের প্রত্যাশায়। আমিও হাত এগিয়ে দিলুম। চম্‌কে উঠলাম সেই হাতের স্পর্শে। শক্ত মুঠোর ভেতর হাতখানি থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল যেন! বিস্ময় বোধ হল : চোখের পানে তাকালাম। চশমার আড়ালে চোখদুটো অস্বাভাবিক লাগছে! জ্বলছে না সজল হয়ে উঠেছে! মনে হ'ল, একটু আগে দীর্ঘ থিয়েটার জীবনের হিসেব নিকেশ মিটিয়েছি যাঁর সঙ্গে—এ সে লোক নয়। এ আমার সেই বিগত দিনের বন্ধু,—ফুড-পয়জন্-এ অসুস্থ হয়েছি—খবর শুনে গেঞ্জি গায়ে গভীর রাত্রে যে আমার বাড়িতে ছুটে এসেছিল, আমায় সঙ্গে নিয়ে কারমাইকল্ হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল, শেষরাত্রে ক্লান্ত চোখ মেলে যাকে দেখেছিলাম আমার শিয়রে বসে আছে। এ সেই বন্ধু,—আমার একটি ছোট বোন্ হারিয়ে গেছে শুনে যে আমার সঙ্গে কলকাতার অলিতে-গলিতে, গঙ্গার ধারে ধারে পাগলের মত ছুটে বেরিয়েছিল, শেষে রামকৃষ্ণ মিশনে তার খোঁজ পেয়ে আনন্দে চীৎকার করে উঠেছিল, হারানো বোনকে আমার সঙ্গে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। এ সেই বন্ধু, আমি জমি কিনব বলে কলকাতা শহর, দক্ষিণেশ্বর,

বালি, খড়দহ প্রভৃতি কলকাতার উপকণ্ঠে দিনের পর দিন মাসের পর মাস যে আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে, মুষলধারা বৃষ্টির মধ্যে এক হাঁটু জল ভেঙ্গে যে বন্ধু ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের টালার জমির প্লট পছন্দ করে দিয়েছিল। ওর পানে তাকিয়ে পুরোনো দিনগুলি হঠাৎ যেন ছায়াছবির মত একে একে ভেসে আসতে লাগল। তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিলুম। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললুম ঃ

—চলি এবার।

—যাবার আগে, আর একটিবার দেখা করে যাবেন? চলতে চলতেই গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে জবাব দিলুম ঃ

—চেষ্টা করে দেখব!

ফিরে তাকাতে ভরসা হ'ল না। যদি আমার চোখের পানে তাকায়! চোখ জলে ভরে এসেছে যে! তাড়াতাড়ি ছুটে চলে এলুম নিজের ঘরে।

প্রতিদিনের অভ্যাস মত একটা চেয়ার টেনে এনে ছাদে বসলুম। খানিকটা চুপচাপ থাকলুম। না, এ-ও ভাল লাগছে না। পায়চারী করতে লাগলুম। প্রকাণ্ড ছাদের এধার থেকে ওধার। হঠাৎ খেয়াল হ'ল, থিয়েটারে অনেক বই, খাতাপত্তর রয়েছে। সেগুলি নিয়ে আজই আমায় জন্মের মত এ থিয়েটার থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে যে! মিছামিছি সময় নষ্ট করে লাভ কী? চাকর বাবুলালকে ডেকে বললুম, একখানি ট্যাক্সি এনে আমার মালপত্তর সব তাতে চাপিয়ে দিতে। বাবুলাল খানিকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর মাথা নিচু করেই নেমে চলে গেল। যাবার সময় চেষ্টা করলেও ওর চোখের জল লুকোতে পারেনি। শুধু বাবুলাল নয়, স্টার থিয়েটারের প্রতিটি প্রাণীকে ব্যথায় বিবর্ণ করে তুলেছে। প্রত্যেকের চোখে নেমেছে জলের ধারা। আমি নিজেও যে এ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যাচ্ছি, এটা অবিশ্যি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তবে এসব খবর হাওয়ার আগে ছোটে। ঐ বাহাদুর

দারোয়ান, থিয়েটারের গ্রীণরুমে ঢোকবার দরজায় বসে থাকত। বাইরের কেউ এলে শ্লিপ না দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দিত না। এমন কি একবার নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশাইকে আটকে দিয়েছিল দরজায়। আমি ওকে খুব বকেছিলাম। নির্মলেন্দুবাবু বললেন ঃ

—শ্লিপ ছাড়া আমায় যে ঢুকতে দেয়নি, এতে আমি খুশীই হয়েছি। ও হুকুম তামিল করেছে। ওর দোষ কী ?

প্রভুভক্ত এই দারোয়ানটি কত সময় কত বকুনি খেয়েছে আমার কাছে। বিনা প্রতিবাদে সব হজম করে গেছে। এই পার্বতীয় মানুষটিকে মনে হ'ত, আগাগোড়া পাথর দিয়ে তৈরি। কোনো সেন্টিমেণ্টের বা ইমোশনের বালাই-এর মধ্যে নেই বলেই জানতুম। হুকুম শুনে সেলাম করা, আর প্রাণ দিয়ে সেই হুকুম তামিল করা— এই ছিল এতকাল এর একমাত্র পরিচয়। আজ পনের বছর ধরে হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যাবার আগে—বাহাদুরের এক বিচিত্র রূপ দেখে চমকে উঠলাম। নিরেট পাহাড়ের অন্তরালে এতকাল কোথায় লুকিয়েছিল এই দুর্দমনীয় জলধারা ? আমি স্টার ছেড়ে চলে যাচ্ছি শুনে, আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে অবোলা জীবের মত কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। যতবার পিঠে হাত বোলাই, কিছুতেই সে নিরুদ্ধ জলধারা বাধ মানে না। সহস্র ধারায় উছলে পড়ে যেন ! পাথরের ভেতর এমন নরম মাটি ছিল, মরুভূমির মধ্যে এমন স্নেহ-সজল প্রস্রবিনী লুকিয়ে ছিল—কোনো দিন কল্পনাও করতে পারিনি !

বাবুলাল সমস্ত মালপত্তর ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছে। এইবার আমায় যেতে হবে। একবার ঘরে ঢুক্‌লুম। প্রথম যৌবনের উদয়-সূর্য্য মধ্যাহ্ন পার হয়ে পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়েছে—এই ঘর তারই সাক্ষ্য বহন কচ্ছে। এই সুদীর্ঘকাল যতটা সময় বাড়িতে কাটিয়েছি—তার চেয়ে অনেক বেশী সময় কাটিয়েছি এই স্বল্প পরিসর ঘরখানিতে। একবার চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লুম। উষাহরণ,

রাণীভবানী, রাণী দুর্গাবতী, কঙ্কাবতীর ঘাট, মাইকেল, স্বর্গ হতে বড়, টিপু সুলতান, নন্দকুমার, শতবর্ষ আগে, সমুদ্র গুপ্ত, শকুন্তলা—কত নাটক লিখেছি এই টেবিলের সামনে বসে'। নীল কাপড় দিয়ে মোড়া ভিক্টোরিয়ান্ যুগের একখানি ভাঙ্গা টেবিল। এক কোণে খানিকটা কালির দাগ। মনে পড়ল, শতবর্ষ আগে নাটক লেখবার সময় কালির দোয়াতটা উল্টে পড়েছিল টেবিলের ওপর। স্মারক হাবুলদা ওধারে বসে আমার লেখা 'কপি' কচ্ছিলেন। বলেছিলেন, কালি পড়ে যাওয়া শুভচিহ্ন, এ নাটক জম্‌বেই। হাবুলদার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল। বড়দিনের সময় অভিনীত হয় শতবর্ষ আগে। সলিলবাবু তখন কার্বাঙ্কল রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী। দোসরা জানুয়ারী আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি বিছানার ওপর উঠে বসে আমায় জড়িয়ে ধরেছিলেন—অপ্রত্যাশিত বিক্রির জন্য। সেই শতবর্ষ আগে নাটক লেখবার সময় —ঐ কালিটুকু দোয়াত উল্টে পড়ে গিয়েছিল টেবিলে। কালিমাখা চিহ্নিত স্থানের ওপর মাথা নোয়ালাম। নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ল কালির দাগের ওপর। নিস্তরঙ্গ দিঘির জল দম্‌কা হাওয়ায় যেমন উচ্ছল হয়ে ওঠে, মনে হ'ল, আমার নিঃশ্বাস লেগে সেই কালি যেন আন্দোলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা টেবিলের ওপর। দম্‌কা হাওয়ার সঙ্গে এল বর্ষার অজস্র ধারা, টপ টপ করে বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগল টেবিলের নীল আস্তরণের ওপর। নীলকান্ত মণির বুকে অগুন্তি স্ফটিক বিন্দু। রুমাল বার করে চোখ মুছে ফেললাম। আর নয়, পালাই এবার। সোজা চলে এলাম ডানদিকে, ছাদ পার হয়ে নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির মুখে কে যেন হঠাৎ আমার পথ আগলে দিল। স্পষ্ট মনে হ'ল জামার কোণ ধরে কে যেন টানছে। পেছন ফিরে তাকালাম: কই কেউ তো নেই! তবে কেন যেতে যেতে আচম্‌কা থেমে গেলুম? ঠিক বুঝতে পারলাম না। মনে ভাবলাম, বাধা পড়ল যখন, একটু দাঁড়িয়ে যাই। থিয়েটারের ভেতরটা একবার দেখে যাই। আবার নিজের মনেই

হাসলাম, কী দেখব? স্টার থিয়েটারের কোথায় কি আছে, কেউ যদি আমার চোখ বেঁধে ছেড়ে দেয়—একা একা সমস্ত থিয়েটারটা ঘুরে নির্ভুল সমস্ত কিছু বলে দিতে পারি। কেন পারব না? পনের বছর ধরে রাত দিনের সাধনা আমার, স্বপ্ন আমার এই স্টার থিয়েটার। বাইরের মানুষের, বাইরের পৃথিবীর কোনো সংবাদ রাখতুম না। নিজেকে নিমজ্জিত করে রেখেছিলাম শুধু এই একটি প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলবার নিরন্ধ্র সাধনায়। এখানে আমার নতুন করে দেখবার কী আছে?—তবু যেতে হ'ল। কে যেন কানে কানে বলল: জীবনে আর তো আসবে না। এই শেষবারের মত একটিবার দেখে যাও।

মেঘনাদ বধের রাবণ, বীরবাহু, অতিকায়, মহাবলী কুম্ভকর্ণকে হারিয়ে একদিন সজল দৃষ্টিতে ফিরে তাকিয়েছিল—স্বর্ণলঙ্কার দিকে! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ঊনশত সহোদর হারা দুর্যোধন,—দ্বৈপায়ণ হ্রদে আত্মগোপন করবার আগে সতৃষ্ণ নয়নের ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে দিয়েছিল হস্তিনা প্রাসাদের শূন্য প্রকোষ্ঠের পানে। পলাশী যুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে যাবার আগে অভিশপ্ত সিরাজ লুৎফুন্নিসার হাত ধরে বলেছিল, "একটু দাঁড়াও লুৎফা, যাবার আগে সব একবার ভালো করে দেখে নেই।" রাবণ, দুর্যোধন, সিরাজ—এদের মদ-মাৎসর্য ছিল, হয়তো ছিল বহু অপরাধ। তেমনি সীমাহীন অপরাধে হয়তো অপরাধী আমি,—তবু, এ আমারি প্রতিষ্ঠান, যৌবনের সমস্ত উদ্যম দিয়ে, সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষে নিয়োগ করে তিল তিল করে গড়ে তোলা এই তো আমার তুলনাহীন তিলোত্তমা। জন্মের মত চলে যাবার আগে একটিবার না দেখে যেতে পারি না।

আবার ছাদ পার হয়ে বাঁ দিকের সিঁড়ি দিয়ে ভেতরে স্টেজের দিকে নামতে গেলুম। একি! সিঁড়ির ধারটাতে পাঁচু দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচু সিফ্টার, উড়িষ্যায় জন্ম, মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের আমল

থেকে কাজ করছে থিয়েটারে। প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে পাথরের স্তম্ভের মত বাঙলা রঙ্গমঞ্চের কত স্মরণীয় রাত্রির, কত দুর্যোগ ঘন অন্ধকারের সাক্ষী হয়ে বেঁচেছিল এই পাঁচু সিফ্টার। মহাকাল ওর দেহটাকে ধনুকের মত বাঁকা করে দিয়েছিল। ঐ শীর্ণ কুব্জদেহ মানুষটি শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার পূর্বদিন পর্যন্ত স্টার থিয়েটারের সেট্ সাজিয়েছে। কাজের অবসরে বটুয়া থেকে সুপুরী বার করে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। অনেক সময় ঠাট্টা করে বলেছি, "পাঁচু, মরবার পর যেন সুপুরী দিতে অমনি করে হাত বাড়িও না। ভয় পেয়ে যাবো।" শিশুর মত দুর্বোধ্য হাসিতে বারবার ফুলে উঠেছে তার বিশীর্ণ গাল দুটি। আজ মনে হ'ল—পাঁচু যেন বটুয়া থেকে সুপুরী বার করে নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে! মুখে আজ হাসি নেই, কোটরগত চোখ দুটো যেন শুকনো কূয়োর মত মনে হচ্ছে, অনেক গভীরে যেন জলের চিহ্ন চিক্ চিক্ কচ্ছে! এই সিঁড়ির ধারেই ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে ঘুমোতো পাঁচু। শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল এই সিঁড়ির পাশটিতেই।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলুম। বাঁ দিকেই মেল্ আর্টিস্টদের সাজবার ঘর। দেওয়ালের চূণবালি খসে গিয়েছে। বিচিত্র জীবজন্তু ও নর-নারীর মুখের মত মনে হচ্ছে—সেই চূণবালি ঝরে পড়া দেওয়ালটার স্থানে স্থানে। পেন্সিল দিয়ে ওর মধ্যে একটি মুখকে কোন্ খেয়ালী শিল্পী চিহ্নিত করে দিয়েছে। নিচে লিখে রেখেছে, টুয়েনটি ইয়ারস্ সারভিস্! টুয়েনটি রুপিস্ সেলারি! মনে পড়ল এ অন্নদা ড্রেসারের প্রতিকৃতি। অন্নদা অনেক সময় ঐরকম অদ্ভুত ইংরেজীতে আমার কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলত, টুয়েনটি ইয়ারস্ সারভিস্! টুয়েনটি রুপিস্ সেলারি! মুখখানি দেওয়ালের ইটসুরকীর ভেতর থেকে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে! জ্যান্ত মানুষের মত তাকাচ্ছে আমার দিকে! দৃষ্টিতে আজও তার অভিযোগ। কিন্তু এ অভিযোগ কিসের?—পৃথিবীর গণ্ডি পেরিয়ে সে আজ মানুষের

অত্যাচারের বাইরে চলে গেছে। তবু চোখ দুটোতে অমন আর্ত-কাকুতি কেন? কার জন্যে? সরে এলুম ভিতরে ঢোকবার প্যাসেজ পার হয়ে লবীর কাছে। এই লবী সংলগ্ন আর একটি ঘর। নন্দবাবু ড্রেসার এ ঘরের অধিস্বামী। ইনিও গিরিশচন্দ্রকে সাজিয়েছেন। দানীবাবুর সঙ্গে বহুদিন আড্ডা দিয়েছেন। থিয়েটারের পুরোনো পোষাকগুলি ছিল ওঁর বুকের পাঁজরার মত। নতুন বই খোলার সময়, পুরোনো পোষাক দেখতে চাইলে স্পষ্ট বলে দিতেন—পুরোনো কিছু নেই, ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা জানতুম, ধোলাই করে, ইস্তিরী করে অতি যত্নের সঙ্গে সে সব পোষাক নন্দবাবু থিয়েটারেরই কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছেন। পোকায় কাটছে, আরশুলায় নষ্ট কচ্ছে, তবু বার করবেন না। থাক, জমা থাক, ও পোষাকে নন্দবাবু প্রাণান্তেও কাউকে হাত দিতে দেবেন না। আমাকেও নয়। সলিলবাবুকেও নয়। কবে, কোন অনাগত শিল্পী সে সব পোষাক ব্যবহার করবেন, কার জন্য নন্দবাবু সেগুলি সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখতেন কে জানে! কিছু বললে, নন্দবাবু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠতেন। ভীষণ মুখ খারাপ ছিল। যার তার সামনে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতে নন্দবাবুর একটুও মুখে আটকাত না। একবার মিনার্ভা থিয়েটারে শিল্পী শরৎ চাটুজ্জে মশাই নন্দবাবুর এই দোষের জন্য বড়বাবু উপেন মিত্র মশাই-এর কাছে নালিশ করেছিলেন। বড়বাবু নন্দবাবুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন:

—নন্দ, তুমি নাকি অত্যন্ত মুখ খারাপ করে কথা বল?

নন্দবাবু চটে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন:

—কখখনো না! কোন "অমুকে" আপনার কাছে নালিশ করেছে?

"অমুকে" কথাটির পরিবর্তে নন্দবাবু যে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, তা শুনে লজ্জায় বড়বাবুর কান শুদ্ধ লাল হয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি নন্দবাবুকে বললেন:

—থাক্, থাক্, বুঝেছি। তুমি এবার ভেতরে যাও। নন্দবাবু অভিযোগকারীর উদ্দেশ্যে আরও সব মিষ্ট সম্ভাষণ গুঞ্জরণ করতে করতে ভেতরে চলে গেলেন। বড়বাবু নন্দকে শাসন করবার ব্যর্থ আক্রোশ মেটাতে লাগলেন গড়গড়ার নলে মুখ পুরে মুহুর্মুহু সশব্দে ধূম উদ্গীরণ করে। নন্দবুড়ো চলে গেছে। আমরা ভাবতুম নন্দ যক হয়ে থাকবে স্টারের পুরোনো পোষাক আগলাবার জন্যে। ভবীর কাছে এসে ওর ঘরের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল নন্দবাবু স্বশরীরে দাঁড়িয়ে আছে সেই রকম ডোরাকাটা লুঙ্গী পরা, গায়ে শাদা ফতুয়া, চুপসে যাওয়া পাকা আমটির মত চেহারা! মাথার মাঝখানে সিঁথি, দু'পাশে তৈলমসৃণ বিরল কেশ! নন্দবাবু যেন হাত বাড়িয়ে ইসারা করছেন! ডাকছেন আমায়! কোথায় কি পোষাক লুকিয়ে রেখেছিলেন—আমার জিম্মা করে দিতে চান্ বুঝি! সজোরে ঘাড় নাড়লুম। না নন্দবাবু, দরকার নেই। আমাকে আর কিছু বুঝিয়ে দিতে হবে না। আমি আর এ থিয়েটারের কেউ নই। নন্দবাবুর শুকনো ঠোঁট দুটো যেন কেঁপে উঠল! অস্ফুট আওয়াজ পেলুম, উনি যেন বলছেন—"রামা পাগলা!" পরমহংসদেবকে নন্দবাবু ছেলে বেলায় দেখেছেন বাগবাজারে। ওঁর মুখে ঠাকুরের গল্প শুনেছি। লালপাড় ছোট ধুতি পরা ন্যালা খ্যাপা ওই লোকটিকে ওঁরা মনে করতেন পাগলা! পরে ওই পাগলাই যে সারা জগতের সুস্থ মানুষকে তাঁর পাগলামীতে মাতিয়ে তুলবেন—তা কেউ ভাবতেই পারেনি! নন্দবাবু "রামা পাগলা" বলে মাথা তুলে আমায় কী যেন দেখালেন! কাঠের পার্টিশান্! ওধারে মেয়েদের সাজবার ঘর। সেই কাঠের পার্টিশানের ওপর পরমহংসদেবের বিরাট তৈল চিত্র। এই জীবন্ত প্রতিচ্ছবির কাছে কত শিল্পী প্রণাম জানিয়েছেন। অভিনয় করতে মঞ্চে প্রবেশ করবার আগে ঐ প্রতিচ্ছবির কাছে মাথা নত করে—আশীর্বাদ ভিক্ষা করতুম প্রতিদিন। উজ্জ্বল দুটি দেবচক্ষু, করুণার মন্দাকিনী ধারা ঝরে পড়ে সেই দেব চক্ষু হতে। মূর্তির পানে তাকিয়ে সারা বুকখানা তোলপাড় করে উঠল। মনে

হ'ল, সমুদ্রে ঝড় উঠেছে, পাহাড় প্রমাণ ঢেউ আছড়ে পড়ছে পাঁজরার তলায়। এখুনি হয়তো সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। টল্‌তে টল্‌তে এসে লুটিয়ে পড়লুম ডান দিকে পিয়ানোর ওপর। পিয়ানোর ডালাটা কে খুলে রেখেছিল কে জানে! আমার দেহের চাপে একটা আর্তনাদ উঠলো পিয়ানোর রীডগুলি কাঁপিয়ে! যেন বজ্রপাতের ধ্বনি! হাঁ, ঠিক ওই রকম শব্দ শুনেছিলুম রাণী দুর্গাবতী বইএর শেষ রিহার্সেল রাত্রে! সারা দুপুর রিহার্সেল হয়েছে, গভীর রাত পর্যন্ত অবিশ্রান্ত গতিতে চলেছে অভিনয়ের নব নব সংস্কার কার্য। হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল! স্টেজের ওপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালুম। সঙ্গে সঙ্গে দিক-দিগন্ত কাঁপিয়ে বজ্রপাতের ধ্বনি হ'ল—চোখ ঝল্‌সে গেল আলোর ঝল্‌কানিতে! কী হ'ল! কোথায় কী হ'ল! পাশেই হাতিবাগান বাজারে বোমা পড়েছে! তার টুকরো ছিট্‌কে পড়ে থিয়েটারের সামনে কাঁচের জানালাগুলো ভেঙ্গে গেছে! সেদিন ঠাকুরের ছবিকে প্রণাম করে বলেছিলুম—

—খুব বাঁচিয়ে দিয়েছ ঠাকুর! তোমার অশেষ করুণা!

আজ আবার ছবির নিচে মাথা ঠুকে বারবার মিনতি করে বললুম:

—সেই দুর্যোগঘন রাত্রে, যে মঞ্চ আমার জীবনের তীর্থ মঞ্চ—সেখানেই যদি লীন করে দিতে ঠাকুর, তাহলে আজ এমন করে আমায় চলে যেতে হ'ত না।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে চম্‌কে উঠলুম! কে ওখানে?

—আমি বাবুলাল। ট্যাক্সি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে!

—ওঃ। তুই যা! আমি যাচ্ছি!

বাবুলাল চলে গেল। আমিও বাইরে আসব বলে ঠাকুরের ছবির সামনে থেকে সরে এলুম। দুধারে সাজবার ঘর! মাঝখানে সঙ্কীর্ণ পথ। সেই পথ ধরে যাচ্ছি। মনে হ'ল পথের দুধারে কাদের সব অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি—পটলবাবু, নন্দবাবু, অন্নদা, পাঁচু সিফ্‌টার,

হারমোনিয়াম মাস্টার বিদ্যাভূষণ পাল, মেয়েদের ঘরের বিজয় ড্রেসার —সবাই যেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

কি চায় ওরা! কি বলতে চায় আমাকে! আমিও ওদের সঙ্গে শেষবারের মত কথা বলতে চাই, কিন্তু কিছুতেই বলতে পারি না। ঘুমের ভেতর বোবায় পেয়েছে যেন। যত চেষ্টা করি একটা অস্ফুট গোঙানীর আওয়াজ হয় শুধু। দরজার কাছে এলুম। পিঠের ওপর স্পষ্ট অনুভব করলুম বহুজনের মিলিত নিঃশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ! দরজা পার হয়ে এসে দেখি বাগানের চাঁপা গাছের তলায় কে যেন শুয়ে আছে! আমায় দেখে সসঙ্কোচে উঠে পথ ছেড়ে দিল। কে ওখানে? না, কেউ নেই! হাওয়ায় চাঁপা গাছের ডাল দুলছে। তারই ছায়া কাঁপছে। মনে পড়ল, এখানেই দড়ির খাটিয়ায় অনেকদিন শুয়ে থাকতেন ভূমেন রায়। অমনি করেই আমায় দেখে খাটিয়া সরিয়ে নিতেন। আমার যাবার পথ ছেড়ে দিতেন! গেটের কাছে চলে এসেছি। দোতলায় বারান্দার দিকে তীর্যক ভাবে একটি আলোর রশ্মি এসে পড়েছে। সলিলবাবুর ঘর থেকে আসছে ঐ আলো। চলে যাবার সময় উনি একবার দেখা করে যেতে বলেছিলেন। যাবো কি দেখা করতে? কী হবে দেখা করে? আমি আজ অতীত! আমি আজ ওঁর কাছে মৃত! মৃত বন্ধুরা, মৃত সহকর্মীরা সবাই আমায় আজ অন্ধকারে বিদায় অভিনন্দন জানিয়েছে। অন্ধকারেই লুকিয়ে চলে যাই। গেট পার হয়ে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে উঠলুম। দেহ এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলুম। ছুটে চল ড্রাইভার, আমি ছুটি পেয়েছি! আর কোন কাজ নেই, কোনো দায়িত্ব নেই। কোনো ভাবনা নেই, ছুটি! একটানা ছুটি! ছুটে চল ঘন অন্ধকারে।

মহাকালের রথচক্রতলে পুরাতন জীর্ণ যা কিছু ধুলোর মত উড়ে যায়। আসে নতুন দিন, নতুন বছর, আসে নতুন মানুষের দল। প্রাচীন

জরাজীর্ণ ধ্বংসস্তূপের ওপর মানুষ গড়ে তোলে তার নব-উদ্যম আর নববল দৃপ্ত শক্তির বিপুল সৌধ। পুরাতনকে কেউ আঁকড়ে ধরে থাকে না, ওটা নেহাৎ পাগলামি আর নির্বুদ্ধিতা। তবু বিচিত্র! আজও কেন ভুলতে পারি না সেই পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠান! সন্ধ্যার পর স্টার থিয়েটারের উল্টো ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিওন-সাইনের তীব্র আলো চোখে পড়তে বাড়িটার দিকে চোখ ফেরাই। নতুন রঙ ধরানো বাড়িটার সর্বাঙ্গে যেন নতুন রূপ উছলে পড়ছে। ছেলেবেলায় কাশীরাম দাসের একখানি অতি জীর্ণ মহাভারত আমার নিত্য সঙ্গী ছিল। অনেক সময় ঐ ছেঁড়া বইখানাকে বুকে রেখে ঘুমিয়ে পড়তুম। পাতাগুলি শেষে এমন ভাবে ছিঁড়ে গিয়েছিল, যে নতুন করে না বাঁধালে সবগুলি পাতাই হয়তো হারিয়ে যেত। দাদামশাই কাছারির দপ্তরিকে দিয়ে বইখানাকে নতুন ঝল্‌মল করা মলাট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। স্টারের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনে হয় এও যেন নতুন মলাট দেওয়া আমার সেই পুরোনো মহাভারত। ছেড়ে আসবার পর কোনো দিন ওখানে যাইনি। মনে মনে কল্পনা করি ভেতরটা আজও তেমনি আছে যেন! লোকে বলে নেই। না থাক! তবু ঐ বিশ্বাসটুকুই আমায় স্বস্তি দেয়। নিওন-সাইন-এর আলো থর থর করে কেঁপে ওঠে, দৃষ্টি ঝল্‌সে দেয়। চোখ বুজে মনে মনে ভাবি, একটি অনির্বাণ দীপশিখা ঐ নাট্য দেউলে জ্বলছে। বাঙলার কত রঙ্গমঞ্চে আলো নিভে গেছে, কত নির্বাণ দীপ মঞ্চে আবার নতুন করে আলো জ্বলে উঠেছে। এই দীপ জ্বালা, আর দীপ নেভা রাতগুলিতে দীর্ঘ পনের বছর ধরে এখানে আমি একটি আলোর শিখাকে কোনো দিন ম্লান হতে দিই নি। প্রাণপণে জ্বালিয়ে রেখেছিলুম। আমারই সাধনার সেই অকম্প শিখাটি আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কালো আকাশের পানে নিওন-সাইনের তীব্র দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে আলো। জ্বলুক অনির্বাণ দীপের আলো!